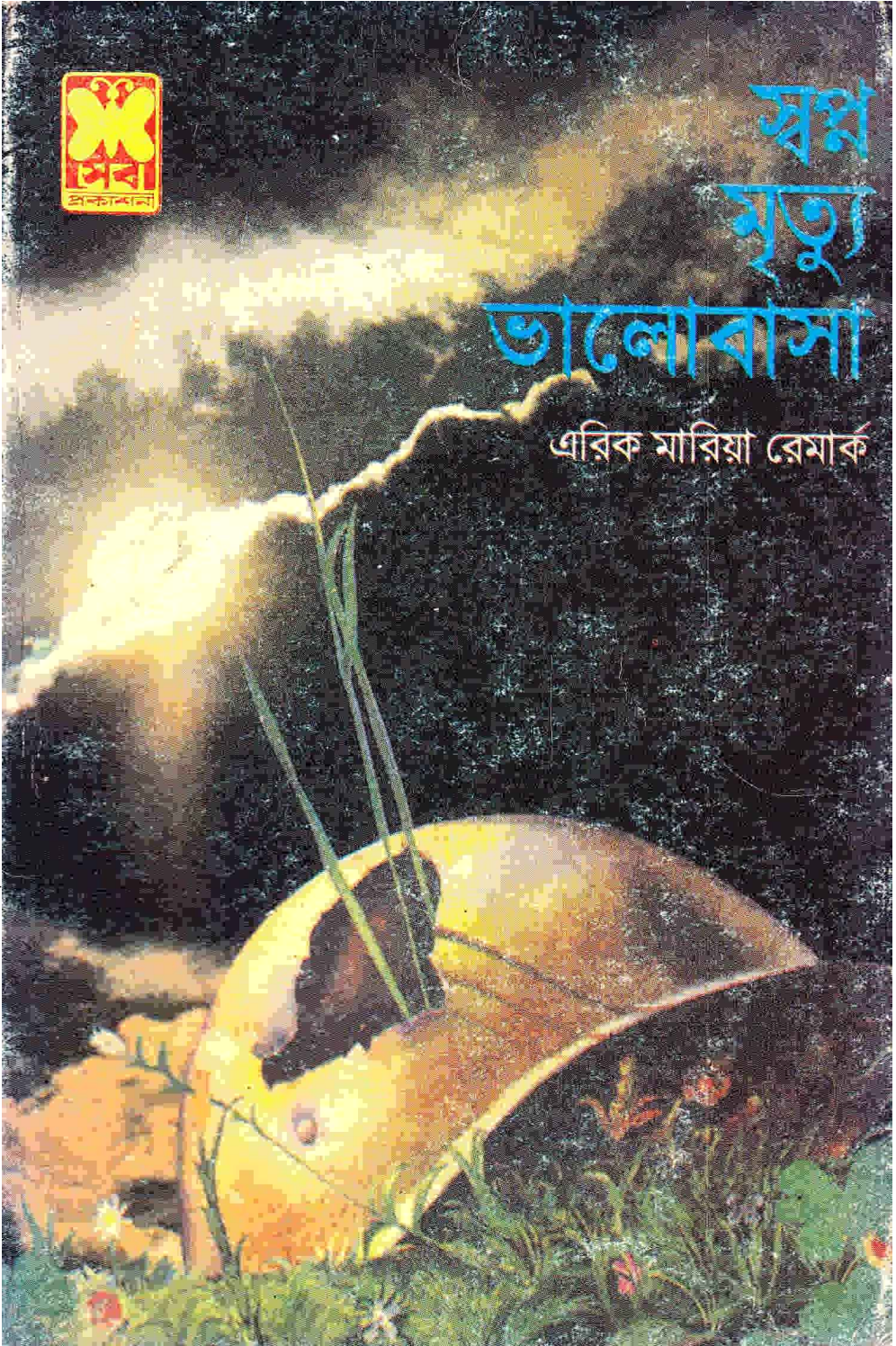

এক

মৃত্যু; ছোট্ট একটি শব্দ, অথচ কী অবিশ্বাস্য ক্ষমতা! এক নিমেষে থমকে দাঁড়ায় জীবন, হোক সে তুচ্ছ কিংবা অমিত সম্ভাবনাময়। এক মুহূর্ত আগেও যে ছিল উষ্ণ, প্রাণবন্ত, পরমুহূর্তেই সে নেই। কী অবিশ্বাস্য এই না থাকা!

একেক দেশে মৃত্যু আসে একেক চেহারায়, একেক গন্ধে। আফ্রিকায়—প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের পরেও, অনেক দিন পর্যন্ত পড়ে থাকে মৃতদেহগুলো; ফুলে ঢোল হয়ে ওঠে লাশ, বাতাসে ভাসে মৃত্যুর বোঁটকা গন্ধ; অন্ধকার মহাদেশের বুকে গাঢ় হয়ে নামে ঘন অন্ধকার রাত, আকাশে মিটমিট করে তারা, নিচে আজন্ম তৃষ্ণার্ত মাটি আঁকড়ে শুয়ে থাকে অসংখ্য লাশ—সীমাহীন ক্লান্তির পরে অনন্ত বিশ্রামে। অথচ কয়েক সপ্তাহ পরেই শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে লাশগুলো, সারা শরীর জড়িয়ে থাকবে ঢলঢলে সামরিক পোশাক। রুক্ষ, ভয়ঙ্কর এই আফ্রিকায় উত্তপ্ত লালচে বালি, সূর্যের অকৃপণ হাতে ঢেলে দেয়া উত্তাপ, চোখ ঝলসানো রোদ আর হাহাকার করা বাতাসে মৃত্যুর চেহারাটাই শুকনো, খটখটে। কিন্তু তুষার ঢাকা রাশিয়ায় ঠিক উল্টো চেহারা নিয়ে আসবে সে—ভেজা, পিচ্ছিল, দুর্গন্ধ ভরা।

অবিরাম বৃষ্টি ঝরছে। সন্ধ্যার বিষণ্ণ আকাশকে কালো করে দিয়ে নেমে আসছে মুক্তোবিন্দু। কয়েকদিন থেকেই এই অবস্থা। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে বরফ-গলা জল। মাসখানেক আগেও সবকিছু লুকিয়ে ছিল বরফের পুরু চাদরের নিচে। এখন আস্তে আস্তে উঁকি দিচ্ছে বাড়িঘরগুলো—জানালা, দরজার চৌকাঠ, তারপর সিঁড়ি, সবশেষে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মৃতদেহগুলো।

ওরা মরেছে মাস চার-পাঁচ আগে। কতবার যে যুদ্ধের তাণ্ডবলীলা সহ্য করল গ্রামটা! সেই নভেম্বর থেকে জানুয়ারি। পেঁজা তুলোর মত শ্বেতশুভ্র তুষার পরম মমতায় ঢেকে দিয়েছে মৃতদেহগুলো—প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ।

এখন, এই এপ্রিলে, বরফ গলা শুরু হতেই বেরিয়ে আসছে লাশগুলো। প্রথমে—জানুয়ারিতে মারা গিয়েছিল যারা, তারা: লোহার মত শক্ত শরীর, ধূসর, আর মোমের মত বিবর্ণ মুখ নিয়ে।

গ্রামের পেছনে বরফ মোড়া পাহাড়, সারাক্ষণ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে। বরফ এখানে অগভীর, ঠাণ্ডায় পাথরের মত শক্ত নিরেট মাটি। গর্ত খোঁড়া অসম্ভব কষ্টকর। তবুও কবর দেয়া হয়েছিল অনেককে। সবই অবশ্য জার্মান সৈনিকের লাশ। রাশিয়ান সৈন্যদের লাশগুলো পড়ে ছিল খোলা আকাশের নিচে। প্রথম প্রথম, যখন তুষার ঝড়ের মাতামাতি ছিল তখন অসুবিধা হয়নি, কিন্তু ঝড় থামতেই শুরু হলো বিপদ, পচা দুর্গন্ধে নাড়ীভুঁড়ি উল্টে যাবার দশা। কোনরকমে বরফ চাপা দেয়া হলো লাশের ওপর। কবর দেবার সময় নেই, কারণ জার্মান বাহিনী তখন বীরবিক্রমে পিছু হটছে। তাছাড়া রাশিয়ানরা কবরে গেল কি না গেল, তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই

কারও। দরকার হলে রাশিয়ানরাই কবর দিয়ে দেবে ওদের লোকদের।

আরও গলল বরফ। ধীরে ধীরে যেন কুঁড়ি মেলল রাইফেল, হ্যাণ্ডগ্রেনেড আর হেলমেট। ওজনের জন্যে বরফের গভীরে নেমে গিয়েছিল ওগুলো। এসব অস্ত্রশস্ত্র ডিসেম্বরে মারা যাওয়া সৈনিকদের।

সামরিক পোশাক দেখে চিনে নেয়া হয়, কোন দলের সৈনিক ছিল লোকটা। কাজটা তেমন কিছু কঠিন নয়। তবে সমস্যা হয়, গলে যাওয়া মৃতদেহ নিয়ে। জলে ভিজে নষ্ট হয়ে যাওয়া লাশ, হাঁ করে থাকা মুখ, খসে পড়া হাত কিংবা পা—বীভৎস, ভয়ঙ্কর। ওগুলো যেন মানুষের নয়, মানবতার মৃতদেহ।

মাঝে মাঝে ঝাঁ ঝাঁ রোদে চিত হয়ে পড়ে থাকে লাশগুলো—খোলা চোখ, স্থির দৃষ্টি অনন্ত আকাশের নীলে। আস্তে আস্তে গলে যায় চোখের মণি, থকথকে জেলীর মত জমে থাকে কিছুক্ষণ, তারপর আস্তে করে গড়িয়ে নামে চোখের কোল বেয়ে—যেন কাঁদে ওরা, মানুষের নিষ্ঠুরতা দেখে, মানুষের হিংস্রতা, নীচতা, পাশবিকতা দেখে।

দীর্ঘদিন পরে মানুষের দেখা পেল প্রকৃতি। নরম তুষারের বুকে পায়ের ছাপ ফেলে এগিয়ে আসছে দু'জন লোক। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল একজন। চিৎকার করে উঠল, 'ওই যে, ওখানে আরেকটা।'

'কোথায়?' এগিয়ে এল ইমেরমান।

'ওই যে, গির্জার সামনে।' আঙুল তুলে দেখাল জাউয়ের। 'খুঁড়ে বের করবে নাকি ওটাকে?'

'কি দরকার! নিজের থেকেই বেরোক না ব্যাটা। শুধু শুধু তিন-চার ফুট বরফ সরানোর খাটুনি খেটে লাভ কি?' থুঃ করে থুথু ছিটাল ইমেরমান। বিরক্তিমাখা গলায় বলল, 'রাশিয়ার এই গ্রামটাই দেখছি সবচেয়ে নিচু। যত্তোসব! বুটের ভেতরে পানি ঢোকার আগেই কেটে পড়ি চলো।'

'ঠিক বলেছ,' সাথে সাথে সায় দিল জাউয়ের। 'সাংঘাতিক খিদে পেয়েছে! আজকের খাবার কি দেবে, জানো নাকি?'

'কি আবার, সেই বাঁধাকপির ঝোল! ভাগ্য ভাল থাকলে সাথে আলু আর দু'এক টুকরো মাংস।'

'মাংসের কথা ভুলে যাও, চাঁদ, ওটি ভাগ্যে নেই। তবে বাঁধাকপির ঝোল বাঁধাই।'

হঠাৎ থামল জাউয়ের। পেছন ফিরে প্যান্টের বোতাম খুলল। একটু পরেই শব্দ হলো জল পড়ার। 'আহ্, বহুদিন পরে এ রকম তৃপ্তির সাথে পানি ছাড়তে পারছি, দোস্ত! বছরখানেক আগেও ইচ্ছেমত এদিক-ওদিক পানি ছিটিয়েছি, তখন শালার মেজাজটাই ছিল আলাদা। সবকিছু ভেঙেচুরে শুধু এগিয়ে যাচ্ছি, আর এখন দেখছি পিছুতে পিছুতে বাড়ির দরজায় পৌঁছে গেছি। এবার বোধ হয় ভদ্রলোকের মত পানি ছাড়া শিখতে হবে। না হলে লোকে অসভ্য বলবে।'

'আগে ভদ্রলোকদের কাছ পর্যন্ত পৌঁছও তো, তারপর ভেব ওসব নিয়ে।'

'কথাটা অবশ্য মন্দ বলোনি,' হাতের জিনিসটা একটু ঝেড়ে নিয়ে প্যান্টের বোতাম লাগাচ্ছে জাউয়ের। 'ভারগতিক দেখে মনে হচ্ছে, বাকি জীবনটাও সৈনিক হিসেবেই কাটাতে হবে।'

'এতদিনে একটা কথার মত কথা বললে,' মুখ টিপে হাসল ইমেরমান, 'আমরা যুদ্ধ করে মরব, আর এস. এস. সৈন্যরা এসে তোমার আমার কবরে তোমার মত ঘুরে ঘুরে পানি ছাড়বে!'

'শালা বেজন্মার দল,' খেপে উঠল জাউয়ের, 'সারা সপ্তাহ জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করব আমরা, আর শেষ দিন দেখব, বুক টান করে মার্চ করতে করতে নবাবজাদারা যাচ্ছে সবার আগে। শালাদের জন্যে মোটা পশমের কম্বল, দামী বুট আর মাংসের বড় বড় টুকরো সব সময় বরাদ্দ। পোড়া কপাল আর কাকে বলে!'

দাঁতে দাঁত পিষল ইমেরমান, 'যুদ্ধের মজাটা ওরাও টের পেতে শুরু করেছে, আমাদের মতই ল্যাজ গুটিয়ে পালাচ্ছে এখন।'

'আমাদের মত বললে সম্মান দেখানো হবে ওদের। আমরা সাথে নিতে না পারলে ফেলে রেখে যাচ্ছি, ওদের মত জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়ে যাচ্ছি না সবকিছু।'

'ব্যাপার কি, বলো তো?' একটু আড়চোখে তাকাল ইমেরমান। 'বুদ্ধিমানের মত কথাবার্তা বলতে শুরু করেছ! তবে সাবধান, স্টেইনব্রেনারের কানে যেন না যায়। সে শুনতে পেলে···আরে!' থমকে গেল ইমেরমান, 'ওটা মানুষের হাত না?'

'কই, কোথায়?' চট করে ঘুরে দাঁড়াল জাউয়ের।

'ওই যে!'

'তাই তো! তবে,' হাসল জাউয়ের, 'যে হারে বরফ গলছে, তাতে কালকেই দেখবে, ক্রুশের মত ঝুলছে হাতটা। বেচারার ভাগ্য ভাল, একেবারে জায়গামত মরেছে।'

'মানে?'

'মানে গোরস্তানে।'

'এটা গোরস্তান নাকি?'

'কেন, জানো না তুমি?' অবাক হলো জাউয়ের। 'অক্টোবরে, আমরা যখন পাল্টা আক্রমণ চালালাম এখানে, তখন আমাদের সাথে ছিলে না তুমি?'

আস্তে করে মুখ ঘুরিয়ে নিল ইমেরমান।

'কি, কোথায় ছিলে তখন?'

শান্ত শোনাল ইমেরমানের গলা, 'সামরিক শাস্তি শিবিরে।'

'বলো কি?' চমকে উঠল জাউয়ের। ছোট্ট করে শিস দিল। 'কি করেছিলে?'

ইতস্তত করল ইমেরমান। চোখ নামিয়ে থেমে থেমে বলল, 'পুরানো কমিউনিস্ট আমি, সেই অপরাধে।'

'তাই নাকি? তা এমনিই ওরা ছেড়ে দিল তোমাকে?'

'হেঃ হেঃ,' উত্তর দিল ইমেরমান, দুটো টোকা দিল বুকে। 'আমার মত ওস্তাদ মেশিনগানারের কোথায় থাকা দরকার সেটা ওরা ভাল করেই বুঝেছে।'

www.BanglaBook.org

'বুঝলাম,' একটু আড়ষ্ট হয়ে উঠল জাউয়ের, 'জেনেশুনে তোমাকে রাশিয়ায় পাঠাল ওরা? কমিউনিস্টদের তো শুনেছি অন্য কোথাও পাঠানো হয়।'

'তাতে কি হয়েছে?' কঠোর হয়ে উঠল ইমেরমানের চেহারা, 'আমি তো আর রাশিয়ার গুপ্তচর নই! তাছাড়া এস. এস. সৈন্যদের নামে যা বলেছ, সেগুলোও কারও কানে লাগাতে যাচ্ছি না, নাকি যাচ্ছি?'

'বাদ দাও ওসব।' দ্রুত পা চালাল জাউয়ের। 'দেরি করলে থালাবাসন ধোয়া পানিও জুটবে না কপালে।'

বরফ গলছে। আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসছে একটা হাত। কত প্রিয়জনের সান্নিধ্য পাওয়া হাত—উষ্ণ এবং বন্ধুত্বপূর্ণ, রূপ নিয়েছিল ঘাতকের হাতে। এখন, এই রাশিয়ায়, বরফের ভেতর থেকে বেরিয়ে আছে। অসহায়, আর্ত ভঙ্গিতে—হয়তো সাহায্য চাইছে কারও, হয়তো নীরব আর্তনাদে প্রতিবাদ করছে অনর্থক রক্তপাত আর মানবিকতার এই অপমৃত্যুর বিরুদ্ধে।

হনহন করে হেঁটে যাচ্ছিল কমাণ্ডার রায়ে, হঠাৎ থমকে দাঁড়াল, 'এটা আবার কি?'

'একটা হাত, স্যার,' নির্লিপ্ত কণ্ঠে জবাব দিল সার্জেন্ট মুয়েকে। কমাণ্ডারের পাশেই টান টান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। রায়েকে দু'চোখে দেখতে পারে না। মনে মনে গালি দিল একটা, 'ব্যাটা, ধাড়ি গর্দভ।'

ভাল করে দেখার জন্যে লাশের ওপর ঝুঁকে পড়ল রায়ে। বরফের ফাঁক দিয়ে ইউনিফর্মের বিবর্ণ একটু অংশ বেরিয়ে আছে বাইরে, তীক্ষ্ণ চোখে সেটাই পরীক্ষা করল। 'দেখে তো ঠিক রাশিয়ান মনে হচ্ছে না।' সোজা হলো সে। 'এটাকে তোলার ব্যবস্থা করো।'

'জি, স্যার।'

'দেখলেই শরীরের মধ্যে কেমন যেন শিরশির করে ওঠে। এখনি দু'জন লোককে লাগিয়ে দাও লাশটা তুলতে।'

'ন্যাকা,' মনে মনে ঝেড়ে গালি দিল মুয়েকে, 'গায়ের মধ্যে শিরশির করে! শালা যেন জীবনে কোনদিন মরা মানুষ দেখেনি।' মুখের নির্লিপ্ত ভাব একটুও বদলাল না তার। 'দিচ্ছি, স্যার।'

'সম্ভবত জার্মান সৈন্য,' চশমার ওপর দিয়ে কায়দা করে তাকাল কমাণ্ডার।

'কিন্তু গত চারদিনে পাওয়া সব মৃতদেহই রাশিয়ানদের, স্যার।'

'ঠিক আছে, তোলা হোক আগে, তখন বোঝা যাবে। তুমি লোক লাগাও তাড়াতাড়ি।'

'জি, স্যার।'

ফিরে গেল রায়ে। যতক্ষণ দেখা যায়, একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকল মুয়েকে। যত গালি জানা ছিল ওর, মনে মনে সব ক'টা ঝাড়ল কমাণ্ডারের উদ্দেশে; আর কপাল চাপড়াল নিজের। 'জাউয়ের, ইমেরমান,' চেঁচিয়ে উঠল সে, 'বেলচা আর শাবল নিয়ে এসো। গ্রেবার, হির্শলাণ্ড, বেরনিং, স্টেইনব্রেনার, খেয়াল রাখো; লোকটা জার্মান হলে কবর দেবে। মনে হয় না কাজটা করতে হবে তোমাদের।'

www.BanglaBook.org

'বাজি ধরতে চাও?' হেলেদুলে ওর দিকে এগিয়ে এল স্টেইনব্রেনার—মুখে শিশুর সরলতা, ভাসাভাসা দুটো চোখ। 'কত?'

একটু ইতস্তত করল মুয়েকে। তারপর জোরের সাথে জানাল, 'তিন।'

'পাঁচের কমে বাজি ধরি না আমি।'

'ঠিক আছে, তাই হবে। এবার পয়সাটা ফেলো দেখি!'

ফিক করে হাসল স্টেইনব্রেনার। সূর্যের ম্লান, ঘোলাটে আলোয় ঝিকমিক করে উঠল ওর মুক্তোর মত দাঁতের সারি। সবে উনিশ বছরে পড়েছে সে—চিকচিকে সোনালি চুল, সুন্দর ভরাট মুখ, দুষ্টুমি মাখা হাসি লেগেই আছে ঠোঁটে—ঠিক যেন স্বর্গ থেকে নেমে আসা কোন দেবদূত। 'কেন, বিশ্বাস হলো না আমার কথা?'

পকেট থেকে চেরী কাঠের ওপরে চমৎকার কারুকাজ করা একটা সিগারেট কেস বের করল মুয়েকে। ঠোঁটে একটা সিগারেট ঝুলিয়ে কেসটা বাড়িয়ে দিল স্টেইনব্রেনারের দিকে।

স্টেইনব্রেনারকেও পছন্দ করে না মুয়েকে। শুধু মুয়েকে নয়, অন্যরাও। সবাই জানে, একজন এস. এস. সে, হিটলারের যুববাহিনী থেকে এখানে এসেছে। তার আসল কাজ গেস্টাপোর হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করা। সে কারণে ইচ্ছে না থাকলেও ওকে তোয়াজ করে চলে সবাই।

স্টেইনব্রেনার সিগারেট নিতেই পাশ থেকে ফোড়ন কাটল ইমেরমান, 'ফুয়েরার কিন্তু ধূমপান করেন না, স্টেইনব্রেনার।'

ভাসাভাসা চোখ দুটো আস্তে করে ঘুরল ওর দিকে, কুটিল হলো চাহনি। 'মনে হচ্ছে, পাখা গজিয়েছে তোমার?'

হাসল ইমেরমান। কিছু বলার আগেই ধমকে উঠল মুয়েকে, 'ওসব ঝগড়া-টগড়া পরে হবে, এখন কাজ করো। হির্শলাণ্ড, তুমিও হাত লাগাও।'

খিকখিক করে হেসে উঠল স্টেইনব্রেনার। 'তোমার মনের মত কাজ দেয়া হয়েছে হে! এবারে তোমার ইহুদি রক্ত চাঙ্গা না হয়ে যাবে কোথায়!'

'আমার শরীরের চারভাগের তিনভাগ আর্য রক্ত,' গম্ভীর মুখে জানাল হির্শলাণ্ড, 'একভাগ শুধু ইহুদি রক্ত।'

'আমি তো জানি, এর উল্টোটাই সত্যি।' সিগারেটে লম্বা টান দিল স্টেইনব্রেনার। গোটাকয়েক ধোঁয়ার কুণ্ডলী ওড়াল বাতাসে। 'ফুয়েরার অত্যন্ত সদয়, না হলে তোমার মত ইহুদিকে আমাদের মত খাঁটি জার্মানের সাথে যুদ্ধে পাঠাত না। এবার কথা বাদ দিয়ে ওই রাশিয়ান শুয়োরের বাচ্চাটাকে বের করো!'

'রাশিয়ান নয় ও,' প্রতিবাদ করল গ্রেবার। মৃতদেহের হাত আর বগলের পাশে বরফ খুঁড়ছে ও। অনেকখানি দেখা যাচ্ছে ভিজে ইউনিফর্ম।

'কি বললে, রাশিয়ান নয়?' ছুটে এল স্টেইনব্রেনার। প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল গায়ের ওপর। 'আরে, এ তো জার্মান ইউনিফর্ম!' পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল সে, 'মুয়েকে, মালপানি ঝাড়ো দেখি এবার।'

লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে এল মুয়েকে। তীক্ষ্ণ চোখে কিছুক্ষণ লাশটা দেখে হাতের সিগারেটটা ফেলে দিল মাটিতে। চোখেমুখে চরম বিরক্তির ছাপ। 'মনে হয়

ডিসেম্বরের লাশ।'

'মনে হয় না,' এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল গ্রেবার, 'সম্ভবত অক্টোবরের। সে সময় তো শ'খানেক কিলোমিটার এগিয়ে গিয়েছিলাম আমরা।'

'সে তো বটেই,' খোঁচা দিল স্টেইনব্রেনার, 'না হলে ফিরতি পথে গ্রামটা পেতে না।'

'সোনার আঙটি হাতে,' হঠাৎ হির্শলাণ্ডের চিৎকারে চমকে উঠল ওরা। ঠেলাঠেলি করে এগিয়ে গেল মৃতদেহের দিকে। লাশের অন্য হাতটা বাইরে বের করা।

'বিয়ের আঙটি মনে হচ্ছে,' মন্তব্য করল মুয়েকে।

'এবারে ঝটপট পাঁচ রুবল ফেলো দেখি!' মিটিমিটি হাসছে স্টেইনব্রেনার। 'ইশ্, কেন যে দশ রুবল ধরলাম না!'

'এখন পয়সা নেই আমার কাছে,' গম্ভীর বিরস মুখে জানাল মুয়েকে।

'সব টাকাপয়সা রাইখস্ ব্যাংকে রেখে এসেছ নাকি?' বিদ্রূপের হাসি স্টেইনব্রেনারের ঠোঁটে। 'ওসব ধানাই পানাই ছেড়ে ফেলো পাঁচ রুবল।'

কটমট করে ওর দিকে তাকিয়ে পকেট থেকে ম্যানিব্যাগ বের করল মুয়েকে। পাঁচ রুবল আলাদা করে ব্যাগটা রেখে দিল। গজগজ করছে অনবরত। সকাল থেকেই শালার কপালটা খারাপ যাচ্ছে।'

'মনে হয় লেফটেন্যান্ট রাইকের লাশ এটা।'

গ্রেবারের কথায় আঁতকে উঠল সবাই। 'বলো কি, চিনলে কি করে?'

'এই তো ইউনিফর্মে লেফটেন্যান্টের ব্যাজ। তাছাড়া ডান হাতের তর্জনীটা নেই।'

'অসম্ভব, রাইকে হতেই পারে না। সে তো শুনেছি আহত হয়ে বাড়ি ফিরে গেছে।'

'আমি বলছি, এটা রাইকে।'

'ঠিক আছে, মুখের ওপর থেকে বরফ সরাও।'

গ্রেবার আর হির্শলাণ্ড হাত লাগাতেই চেঁচিয়ে উঠল মুয়েকে, 'সাবধান, মাথায় যেন না লাগে।'

'লাগলেও উনি কিছু মনে করবেন না,' ফোড়ন কাটল ইমেরমান।

'মুখ সামলে কথা বলো কমিউনিস্টের চ্যালা,' খেপে উঠল মুয়েকে, 'ও একজন জার্মান।'

'ছিল,' শুধরে দিল ইমেরমান।

কটমট করে ওর দিকে তাকাল মুয়েকে। দৃষ্টি দিয়েই যেন ভস্ম করে দিতে চাইছে ওকে। পাত্তাই দিল না ইমেরমান।

আস্তে আস্তে বরফকুচির ধুসর অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল একটা মুখ, আলো দেখল পৃথিবীর, কোন অনুভূতি জাগল না। চোখের কোটরে তার জমে আছে বরফ, ভেজা, স্যাঁতসেঁতে মুখে রহস্যের অভিব্যক্তি—দেখলেই কাঁটা দিয়ে ওঠে গায়ে, মনে হয়, যেন কোন ভাস্কর কাজ শেষ না করেই চলে গেছে কোথাও। নীলচে, ভেজা,

www.BanglaBook.org

শক্ত ঠোঁট লাশের, ভেতর থেকে হাসছে একটা সোনার দাঁত।

লাশের ওপর ঝুঁকে পড়ল মুয়েকে। 'এখনও ঠিকমত চেনা যাচ্ছে না। চোখদুটো ভালমত পরিষ্কার করে ফেলো।'

আলতো করে লাশের চোখ থেকে বরফ সরাল গ্রেবার। উত্তেজিত হয়ে উঠল মুয়েকে, এবার চিনতে পেরেছে সে। 'ওকে তোলো শিগগির।' ব্যস্ত গলায় নির্দেশ দিল, 'হির্শলাণ্ড আর জাউয়ের, পা-দুটো ধরো তোমরা। বেরনিং, স্টেইনব্রেনার, তোমরা হাত দুটো ধরো। গ্রেবার, তুমি মাথাটা দেখো। একসাথে টান দেবে সবাই। রেডি, ওয়ান, টু।'

একসাথে টান লাগাল ওরা। একটু কেঁপে উঠল লাশটা, আস্তে করে বেরিয়ে এল গর্ত ছেড়ে। নিচে দীর্ঘশ্বাস ফেলল হিমেল বাতাস, তুষারের অশ্রুবিন্দু ঝরল কাদার গর্তে।

'পা-টা খুলে গেছে, সার্জেন্ট,' অপরাধীর ভঙ্গিতে মুয়েকের দিকে তাকাল হির্শলাণ্ড—হাতে বুটসুদ্ধ একটা পা।

'খুলুক,' অত্যন্ত তৎপর মুয়েকে; এতবড় একজন জার্মান অফিসারের সম্মান রাখার দায়িত্ব এখন ওর ওপর। 'এখানে শুইয়ে রাখো।' একটা জায়গা দেখাল সে।

প্রায় খুলে এসেছে বুটটা। পা-টা প্রায় পচে গেছে বরফগলা জলে। শরীরের মাংস খুলে পড়ার যোগাড়।

'পা-টা ভেতরে আছে তো?' জিজ্ঞেস করল ইমেরমান।

'হ্যাঁ,' জবাব দেয়ার আগে নিশ্চিত হয়ে নিল হির্শলাণ্ড।

'কে জানত এত তাড়াতাড়ি পচে যাবে লাশটা,' গজগজ করল মুয়েকে।

মিনিট খানেক লাগল মৃতদেহ থেকে বরফ সরাতে। ইউনিফর্মের বুক পকেটে পাওয়া গেল একটা চামড়ার ব্যাগ—ভিজে একেবারে জবজব করছে—ভেতরটা কাগজ-পত্রে ঠাসা, লেখাটেখা সবই প্রায় মুছে গেলেও নিশ্চিত হওয়া গেল, লাশটা রাইকের। মারা যাবার সময় পদাতিক সৈন্যদের অধিনায়ক ছিল সে।

'সবাই থাকো এখানে,' নির্দেশ দিল মুয়েকে। 'আমি কমাণ্ডারকে খবরটা দিয়ে আসছি।'

জারের আমলের পুরানো গির্জা, পেছনে গায়ে লাগানো সারা গ্রামের একমাত্র অক্ষত বাড়ি। যুদ্ধের আগে কোন ধর্মযাজক থাকত, এখন কমাণ্ডার রায়ের দখলে সেটা।

ঘরটা মস্ত বড়। এক কোণে গনগনে ফায়ারপ্লেস। কাগজপত্রের মধ্যে ডুবে আছে কমাণ্ডার রায়ে। ঘরে ঢুকল মুয়েকে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে চোখ কুঁচকে ফেলল—ক্ষোভে আর বিতৃষ্ণায়।

খবরটা শুনেই ছুটে এল রায়ে। দাঁড়িয়ে থেকে চুপচাপ কিছুক্ষণ লাশটা দেখল। নিষ্প্রাণ চোখে অনন্ত ব্যথা আর অসংখ্য প্রশ্ন নিয়ে তাকিয়ে আছে রাইকে।

বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল রায়ের। 'চোখদুটো বন্ধ করে দাও ওর।'

'বন্ধ করা যাবে না, স্যার,' মৃদু গলায় জানাল গ্রেবার, 'পাতাদুটো একেবারে

নরম হয়ে গেছে, বন্ধ করতে গেলেই গলে যাবে।'

'থাক তাহলে।' বিধ্বস্ত গির্জা ছাড়িয়ে চলে গেল কমাণ্ডারের উদাস দৃষ্টি। 'আপাতত গির্জায় নিয়ে রাখো। আচ্ছা, বাড়তি কফিন আছে আমাদের?'

'না, স্যার,' অস্বস্তি বোধ করছে মুয়েকে।

'বানানো যায় না?'

'অনেক সময় লাগবে, স্যার,' উত্তর দিল গ্রেবার, 'তাছাড়া মজবুত তক্তা পাওয়া যাবে না এখন।'

ঠোঁট কামড়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করল রায়ে। 'এক কাজ করো, শক্ত ক্যাম্বিশে আপাতত মুড়ে রাখো লাশটা। ওভাবেই কবর দেব ওঁকে। সময় নষ্ট না করে কবর খুঁড়তে শুরু করে দাও।'

চারজন একসাথে উঠিয়ে নিল লাশটা, রওনা হলো গির্জার দিকে। পেছনে পেছনে আসছে হির্শলাণ্ড—হাতে পা সুদ্ধ বুটটা।

ওরা চোখের আড়াল হতেই মুয়েকের দিকে ফিরল কমাণ্ডার, 'চারজন রাশিয়ার গেরিলাকে পাঠানো হয়েছে আজকে। কাল ভোরে গুলি করে মারতে হবে ওদের। তোমার ওপর দায়িত্ব থাকল কাজটার। কাকে কাকে ফায়ারিং স্কোয়াডে রাখবে, তুমি ঠিক করবে।'

'ঠিক আছে, স্যার।'

'বুঝলাম না,' বিড়বিড় করল কমাণ্ডার, 'আমাদের ওপর কেন এ দায়িত্ব দেয়া হলো!'

এতক্ষণ পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল স্টেইনব্রেনার। সুযোগ পেয়েই মুখ খুলল সে, 'ফায়ারিং স্কোয়াডে আমি থাকতে চাই, স্যার।'

'বেশ, থাকবে।' শূন্য দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল কমাণ্ডার। ঘুরে গির্জার দিকে হাঁটতে শুরু করল।

'ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করা আর কি,' গজগজ করল মুয়েকে, 'আমাদের হাজার হাজার সৈন্য মারা যাচ্ছে ওদের হাতে, আর আমরা কত কায়দা করে ওদের চারজন গেরিলাকে খতম করতে যাচ্ছি!'

হঠাৎ চকচকে হয়ে উঠল স্টেইনব্রেনারের চেহারা। 'আচ্ছা, বিকেলে ওই ব্যাটা রাশিয়ানদের দিয়ে লেফটেন্যান্ট রাইকের কবর খোঁড়ালে কেমন হয়?'

'ভালই বলেছ' সচকিত কণ্ঠে উত্তর দিল মুয়েকে। অন্যমনস্কভাবে কমাণ্ডারের কথা ভাবছিল এতক্ষণ। যুদ্ধের আগের স্কুলমাস্টার রায়ে সেই প্রথম থেকে লেফটেন্যান্টই আছে কেন, সেটাই খতিয়ে দেখছিল সে।

'এতে হবে?' ভাঙা ভাঙা জার্মানে জিজ্ঞেস করল বৃদ্ধ রাশিয়ান বন্দী—সত্তরের কাছাকাছি বয়স, শ্বেতশুভ্র দাড়িতে ময়লার ছোপ, ঘন নীল একজোড়া চোখ—সরল, নিষ্পাপ।

'চুপ, হারামজাদা বলশেভিকের বাচ্চা,' খেঁকিয়ে উঠল স্টেইনব্রেনার, 'হুকুম ছাড়া একটা কথাও বলবি না।' বেশ খোশমেজাজে আছে সে। বার বার তাকাচ্ছে

www.BanglaBook.org

রাশিয়ান মেয়েটার দিকে—বন্দী চারজনের মধ্যে একমাত্র মেয়ে—ভরাট, সুন্দর।

'চলবে,' জাউয়েরের দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করল গ্রেবার।

'আমাদের জন্যে নাকি?' জিজ্ঞেস করল বৃদ্ধ।

কেউ কিছু বোঝার আগেই ছুটে গেল স্টেইনব্রেনার। চটাশ করে শব্দ হলো হাতের সাথে বৃদ্ধের গালের সংঘর্ষে। 'তোকে না চুপ করে থাকতে বললাম, হারামজাদা!' ক্রোধে শাদা শাদা দাঁতগুলো বেরিয়ে গেছে ওর। হিংস্র কুকুরের মত লাগছে দেখতে।

হাসল বৃদ্ধ—পবিত্র, স্বর্গীয় হাসি, কোন খেদ নেই, কোন অভিযোগ নেই; সারা মুখে শিশুর মত সরল প্রশান্তি। চড় খেয়েও নড়ল না সে, অপলক দৃষ্টিতে শুধু তাকিয়ে রইল স্টেইনব্রেনারের দিকে।

সহ্য করতে না পেরে চোখ নামিয়ে নিল স্টেইনব্রেনার। দু'পা পিছিয়ে এল সে, ঝট করে রাইফেল তুলল বৃদ্ধের দিকে। ধরেই নিয়েছে, আক্রমণ করবে বৃদ্ধ। উত্তেজিত ও এখন—পৈশাচিক হাসি চোখেমুখে, শিকারকে খেপিয়ে তুলে গুলিতে ছিন্নভিন্ন করার হিংস্র আনন্দের অপেক্ষায় অধীর।

নাক থেকে রক্তের ক্ষীণ একটা ধারা বেরিয়ে এল বৃদ্ধের—টুপ করে গড়িয়ে পড়ল তুষারশুভ্র দাড়িতে, একমুহূর্ত স্থির থাকল, তারপর ঝরে পড়ল কাপুরুষতা আর নৃশংসতার চিহ্ন।

থমকে দাঁড়িয়ে আছে গ্রেবার। স্টেইনব্রেনারকে বহুদিন থেকে চেনে ও; জানে, এই মুহূর্তে গুলি করার ছুতো খুঁজছে সে। বৃদ্ধের জায়গায় নিজে হলে কি করত, ভাবছে গ্রেবার। চড় খাবার সঙ্গে সঙ্গে কি ঝাঁপিয়ে পড়ত স্টেইনব্রেনারের ওপর? জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে কি লড়ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে, বরণ করত বীরের মত মহৎ মৃত্যু? নাকি পৃথিবীর সমস্ত রূপ-রস-গন্ধ আরও কিছুক্ষণ উপভোগ করতে চাইত যে কোন মূল্যে! ভেবে পেল না।

ধীরে ধীরে নিচু হলো বৃদ্ধ; শাবল তুলে নিয়ে কবর খুঁড়তে শুরু করল আবার। ওর মাথায় রাইফেল তাক করল স্টেইনব্রেনার। ফিরেও তাকাল না বৃদ্ধ।

দাঁতে দাঁত পিষল স্টেইনব্রেনার। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'অনেক খুঁড়েছিস, এবার শুয়ে পড় কবরে।'

শাবলটা রেখে নিঃশব্দে হুকুম পালন করল বুড়ো মানুষটা।

এগিয়ে গেল স্টেইনব্রেনার। ওর পায়ে লেগে ঝুরঝুর করে বরফ লাগা মাটি ঝরে পড়ল বুড়োর গায়ে।

কবর পরীক্ষা করে গ্রেবারের দিকে ফিরল স্টেইনব্রেনার, 'এই লম্বাতেই তো হয়ে যাবে, তাই না?'

'হ্যাঁ,' উত্তর দিল গ্রেবার, 'রাইকের চেয়ে লম্বা নয় লোকটা।'

সোজা ওপরে, অনন্তের দিকে তাকিয়ে আছে বৃদ্ধ, সমুদ্র নীল চোখের মণিতে নেমে এসেছে একটুকরো আকাশ, মুখের চারপাশে পালকের মত নরম শাদা দাড়ি, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে মৃদু ওঠানামা করছে বুক—সারা মুখে যেন স্বর্গীয় জ্যোতি।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ বুড়োকে দেখল স্টেইনব্রেনার। হুকুম দিল, 'বেরো!'

উঠে বসল বুড়ো। দু'হাতে ভর দিয়ে বেরিয়ে এল কবর থেকে। পোশাকের এখানে ওখানে কাদাপানির ছোপ।

মেয়েটার দিকে চোখ ফেরাল স্টেইনব্রেনার। 'এবারে তোমার পালা, সুন্দরী! গর্তটা অবশ্য বেশি বড় না হলেও চলবে।'

ভোর। দিগন্তে অস্পষ্ট আলোর আভায় ছিন্ন তরল অন্ধকার। রাত থেকে আবার শুরু হয়েছে তুষারপাত। গর্তগুলোর ভেতরে চাপ চাপ অন্ধকার—আরও অতল, যেন ওদের সমস্ত দুঃখ জমে আছে ওখানে।

'বুঝলাম না,' গলা শোনা গেল জাউয়েরের, 'আমাদের দিয়ে এ কাজ করাচ্ছে কেন! এস. ডি কিংবা এস. এসরা ঘোড়ার ঘাস কাটছে নাকি? মানুষ মারা তো ওদের কাছে মাছি মারার সমান!'

হাত থেকে রাইফেলটা কাঁধে ঝোলাল গ্রেবার। অসম্ভব ঠাণ্ডা হয়ে আছে নলটা। ছোঁয়া লাগতেই জ্বালা করে উঠছে চামড়া। পকেট হাতড়ে দস্তানা বের করল ও। পরে নিয়ে তৃপ্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলল। 'এস. ডি, এস. এসরা অত্যন্ত ব্যস্ত এখন।'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই,' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল জাউয়ের, 'ওদের নাকি নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই, সীমান্তে আসা তো দূরের কথা। তবে স্টেইনব্রেনার যখন আছে, তখন আর চিন্তা কি! আচ্ছা,' গলাটা খাদে নামিয়ে আনল জাউয়ের, 'ও তো এস. ডিতে ছিল আগে, তাই না?'

'আমি শুনেছি, বন্দীশিবিরের গার্ড ছিল ও।'

পেছনে পায়ের শব্দ শুনতেই ঘুরে দাঁড়াল ওরা। বড় বড় পা ফেলে স্টেইনব্রেনার আসছে—খুশিতে চকচক করছে চোখমুখ। দেখেই বোঝা যায়, পরিতৃপ্তির সাথে ঘুমিয়েছে রাতে। কাছে এসে মুচকি হাসল সে। 'আগেই বলে রাখছি, মেয়েটা কিন্তু আমার।'

খানিকটা তামাকপাতা চিবিয়ে থুঃ থুঃ করে থুথু ফেলল জাউয়ের। 'আমার আপত্তি নেই।'

'আমারও না,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল গ্রেবার।

অনেক পাতলা হয়ে এসেছে অন্ধকার; ভোরের গোলাপী রঙে এখন সোনালি আভা। চারদিকে কেমন পবিত্র একটা ভাব।

ঘড়ি দেখল হির্শলাণ্ড।

'খুব তাড়াতাড়ি ঘটছে সবকিছু, তাই না?' বিদ্রূপ করল স্টেইনব্রেনার, 'তোমার অবশ্য এজন্য কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, তোমার মত ইহুদিকেও এ কাজের সুযোগ দেয়া হয়েছে বলে। তবে আমার মতে, শুধুমাত্র গুলি নষ্ট করার চেয়ে ব্যাটাদের স্রেফ পিটিয়ে মারা উচিত।'

'সে তো বটেই,' মনে মনে বলল গ্রেবার, 'না হলে তোমার মত জানোয়ারের তৃপ্তি হবে কেন?'

'ওরা আসছে,' শান্ত গলায় জানাল হির্শলাণ্ড।

www.BanglaBook.org

প্রথমে সেই বুড়ো, তার পেছনে মেয়েটা। ওর পরে অন্য দু'জন অল্প বয়েসী ছেলে। দু'জন জার্মান সৈনিক পাহারা দিয়ে নিয়ে আসছে ওদের। সবার পেছনে সার্জেন্ট মুয়েকে।

নিঃশব্দে কবরগুলোর সামনে দাঁড়াল বন্দীরা। মেয়েটার চোখ মাটির দিকে নামানো।

কমাণ্ডারের ঘর থেকে লেফটেন্যান্ট মুয়েলারকে আসতে দেখল ওরা। কমাণ্ডার রায়ের বদলে সে-ই আজকে প্রাণদণ্ডের আদেশ দেবে।

বছর একুশ বয়স হবে মুয়েলারের—সুদর্শন, অল্পদিন হলো যোগ দিয়েছে সেনাবাহিনীতে। বন্দীদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলো একে একে পরীক্ষা করল সে। তারপর মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করল সব ক'জনের।

'মেয়েটা কিন্তু আমার,' গ্রেবারের কানের কাছে ফিসফিস করল স্টেইনব্রেনার।

মেয়েটার দিকে তাকাল গ্রেবার। নতুন দিনের প্রথম আলো পরম মমতায় জড়িয়ে রেখেছে ওর মুখ, হরিণের মত দুটো আনত চোখ, শরীর। অসহ্য সুন্দর মনে হলো ওকে গ্রেবারের—যেন প্রাচীন কোন ভাস্করের অবিশ্বাস্য সুন্দর এক শিল্পকলা। মুয়েলার কি পড়ছে, কিছুই কানে ঢোকেনি ওর, শুধু বুঝেছে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করছে মুয়েলার; এও জানে—রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে সত্যিকার কোন অভিযোগই নেই, শুধু মাত্র সন্দেহ ছাড়া।

সবকিছু কেমন যেন অবাস্তব লাগছে গ্রেবারের। ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা—অটুট অহঙ্কারে, শিরায় শিরায় বয়ে যাচ্ছে যার তপ্ত অমিত যৌবন। শুধু একটি কথা উচ্চারিত হবে, গর্জে উঠবে একটি রাইফেল, অমনি চিরদিনের জন্যে থেমে যাবে সব। এত সহজে ঘটে যাবে এত বড় ব্যাপার? বিশ্বাসই হতে চায় না গ্রেবারের।

হাওয়া বইছে। হিমেল ঠাণ্ডা হাওয়ায় কেঁপে উঠল গ্রেবার। নিশ্চল, অকম্পিত, শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল শুধু সামনে—কিছুই দেখছে না ও।

মুয়েলারের কানে ফিসফিস করে কি যেন বলল মুয়েকে। শুনে মাথা নাড়ল মুয়েলার, 'ওটা পরেও করা যাবে।'

'না, স্যার। এখন করলেই সহজ হবে।'

'ঠিক আছে, করো তাহলে।'

বন্দীদের দিকে এগিয়ে গেল মুয়েকে। কণ্ঠস্বর যতটা সম্ভব কঠোর করে হুকুম দিল বুড়োকে, 'ওকে জুতো খুলে ফেলতে বলো।' অল্পবয়েসী একজনের দিকে আঙুল তুলল।

রাশিয়ান ভাষায় ছেলেটাকে নির্দেশটা শোনাল বৃদ্ধ। গলাটা কেঁপে গেল ওর—ভয়ে না ঠাণ্ডায়, জানা হলো না গ্রেবারের।

কথাটা ঠিক ঠাহর করতে পারেনি ছেলেটা। কি করবে বুঝতে না পেরে বোকার মত তাকিয়ে রইল বৃদ্ধের দিকে। খেঁকিয়ে উঠল মুয়েকে, 'জুতো খোল, হারামজাদা!'

বুড়ো আবার তরজমা করে শোনাল কথাটা। চমকে উঠল ছেলেটা, তাড়াহুড়ো করে জুতো খুলতে শুরু করল। ভেবে পেল না গ্রেবার, এত তাড়াহুড়ো করছে কেন ছেলেটা! ও কি জীবনের আরেকটি মিনিট নিজের, একান্ত নিজের করে ভাবতে চায়, উপভোগ করতে চায়?

জুতোজোড়া খুলে মুয়েকের দিকে বাড়িয়ে দিল ছেলেটা। ইশারায়, পাশে মাটিতে ওগুলো রাখতে বলল মুয়েকে। নির্দেশ পালন করে আগের জায়গায় ফিরে গেল ছেলেটা। বারবার নড়াচড়া করছে ও। বোঝাই যায়, ঠাণ্ডা তুষার পায়ের তলা পুড়িয়ে দিচ্ছে ওর।

মেয়েটার দিকে ফিরল মুয়েকে। চকচক করে উঠল ওর চোখ দুটো। মেয়েটার হাতে চমৎকার একজোড়া দস্তানা। ইশারায় ও দুটো খুলে জুতোজোড়ার পাশে রাখতে বলল মুয়েকে।

লেফটেন্যান্ট মেয়েটার পোশাকের দিকে তাকিয়ে আছে, বুঝতে পেরেই আড়চোখে তার দিকে চাইল স্টেইনব্রেনার। দু'পা পিছিয়ে এল মুয়েকে।

এই প্রথম মুখ খুলল মেয়েটা। রাশিয়ান ভাষায় দ্রুত কি যেন বলল ও।

জীবনে এই প্রথম কারও প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়েছে মুয়েলার। বুকের ভেতর ঢিবঢিব করছে তার, ঝাঁ ঝাঁ করছে মাথা, গলাটা শুকিয়ে কাঠ। কোনরকমে জিজ্ঞেস করল, 'কি বলছে ও? কিছু চায় নাকি?'

'তোমাদের অভিশাপ দিচ্ছে,' স্থির, নিষ্কম্প গলায় জানাল বৃদ্ধ—পবিত্র, সন্তের মত লাগছে তাকে।

'কি বললে?' কথাটা বুঝতে পারেনি লেফটেন্যান্ট।

'তোমাদের অভিশাপ দিচ্ছে,' গলা চড়াল বৃদ্ধ, 'তোমাদেরকে, প্রতিটি জার্মান সৈনিককে—যারা দাঁড়িয়ে আছ আমাদের পবিত্র ভূমিতে। ও বলছে, তোমরা যেভাবে আমাদের গুলি করে মারছ, আমাদের শিশুরাও বড় হয়ে ঠিক তেমনি করেই তোমাদের সন্তানদের মারবে।'

মুখচোখ লাল হয়ে উঠল মুয়েলারের। এক পা পিছিয়ে এসে হাঁক ছাড়ল, 'অ্যাটেনশান!'

খটাস করে টানটান হয়ে দাঁড়াল ওরা। নির্দেশ পেতেই দস্তানা খুলে কাঁধ থেকে রাইফেল নামাল। ঠাণ্ডা ইস্পাত গ্রেবারের আঙুলগুলো যেন জমিয়ে দিল সাথে সাথে। দাঁতে দাঁত চেপে তবু রাইফেল আঁকড়ে থাকল ও।

হঠাৎ অসম্ভব, অবাস্তব সব কল্পনা এসে ভিড় করল ওর মনে। একবার মনে হলো, শূন্যে গুলি করবে, পরক্ষণেই বুঝল, কোন লাভ নেই; মরতে লোকগুলোকে হবেই। আচ্ছা, ভাবল গ্রেবার, অন্যরাও কি ইচ্ছে করে অন্যদিকে গুলি করার কথা চিন্তা করছে? হঠাৎ দেখল, মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল মেয়েটা, জলভরা দীঘল চোখে ওর দিকে তাকিয়ে হাসল—ম্লান ব্যথাভরা হাসি।

মুয়েলারের বাজখাঁই চিৎকারে চমকে উঠল গ্রেবার।

'টেক এ—ম।'

কালো চকচকে ইস্পাতের নল—চিরক্ষুধার্ত চিরনৃশংস, চির অকল্যাণের—

www.BanglaBook.org

অপলক তাকিয়ে আছে বৃদ্ধের দিকে; দু'পাশে উড়ছে বৃদ্ধের শাদা দাড়ি, ঘন নীল চোখে যেন কোন অভিযোগ নেই, শুধু মানুষের নীচতায়, হীনতায় ব্যথাতুর।

রাইফেলের নল কিছুটা নিচে নামাল গ্রেবার। মুখের চেয়ে বুকে গুলি করাই সুবিধা। পাশে হির্শলাণ্ড দাঁড়িয়ে—তার রাইফেলের নল অনেকটা উপরের দিকে তোলা। ওর কানের কাছে ফিসফিস করল গ্রেবার, 'মুয়েকে খেয়াল করছে কিন্তু! নলটা একটু নামাও, সরাসরি বুকে গুলি করবে।'

'ফায়ার!'

ভোরের পবিত্র নিস্তব্ধতাকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে একসাথে গর্জে উঠল চারটে রাইফেল।

কেঁপে উঠল বুড়ো মানুষটা। আস্তে করে ঝুঁকে পড়ল সামনে, অলস ভঙ্গিতে ঘুরে গেল উল্টোদিকে, তারপর পড়তে শুরু করল। পড়ছে, পড়ছে, যেন অনন্তকাল পরে মাটিতে ধাক্কা খেল লাশটা, অদৃশ্য হয়ে গেল গর্তের ভেতরে, শুধু একজোড়া শীর্ণ পা বেরিয়ে থাকল বাইরে।

অন্য বয়েসী দু'জন হুমড়ি খেয়ে পড়েছে সামনে। রক্তের বন্যায় ভেসে যাচ্ছে তুষারসিক্ত মাটি, চুইয়ে চুইয়ে প্রবেশ করছে ধরণীর বুকে।

একজন শেষ মুহূর্তে হাত তুলেছিল মুখ ঢাকতে, ফলে কনুই থেকে প্রায় আলাদা হয়ে গেছে তার হাত; অদ্ভুত ভঙ্গিতে সেটা পড়ে আছে শরীরের পাশে। এতক্ষণে খেয়াল হলো সবার, নিয়ম অনুযায়ী গুলি করার আগে হাত আর কালো কাপড়ে চোখ বাঁধা হয়নি বন্দীদের।

এক-পা এগিয়ে এসেছিল মেয়েটা। এখন উপুড় হয়ে শুয়ে আছে মাতৃভূমিতে। আস্তে আস্তে একাত্ম হয়ে উঠছে যেন মাটির সাথে। এখনও বেঁচে আছে ও।

ক্ষীণ, অত্যন্ত ক্ষীণ, অস্পষ্ট স্বরে কি যেন বলল মেয়েটা; কেউ বুঝল না, কি বলল ও। দু'হাতে ভর দিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে—নীলচে হয়ে ফুলে উঠেছে ওর কপালের শিরাগুলো; প্রাণপণে চেষ্টা করছে উঠে বসতে, পারছে না কিছুতেই; কিন্তু এর মধ্যে মাথা নোয়ায়নি ও একবারও। দু'চোখে তীব্র ঘৃণা নিয়ে তাকিয়ে আছে সামনে। অস্ফুট স্বরে আবার কি যেন বলল ও, শতসহস্র জন্মের অভিশাপ ঝরে পড়ল সে কণ্ঠস্বরে।

পিস্তল হাতে এগিয়ে গেল মুয়েকে। মেয়েটার কানের কাছে হাত নিতেই এক ঝটকায় মাথা ঘুরিয়ে ওর হাত কামড়ে ধরল মেয়েটা।

অশ্লীল একটা গালি বেরোল মুয়েকের মুখ থেকে। বাঁ হাতে ঘুসি মারল মেয়েটার চোয়ালে। চিত হয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ল মেয়েটা। ওর গলার সাথে পিস্তল ঠেকিয়ে ট্রিগার টানল মুয়েকে।

'আশ্চর্য,' বিরক্তিতে ফেটে পড়ল মুয়েলার, 'একজন সৈনিক হয়ে কোথায় গুলি করতে হয়, সেটাই শেখোনি এখনও?'

'আমি না, স্যার।' নির্জলা মিথ্যা কথাটা বলতে জিভে একটুও আটকাল না স্টেইনব্রেনারের, 'হির্শলাণ্ড গুলি করেছে ওকে।'

সাথে সাথে প্রতিবাদ করল গ্রেবার, 'মিথ্যা কথা, হির্শলাণ্ড গুলি করেনি ওকে।'

ধমকে উঠল মুয়েকে। চুপ করে গেল ওরা। মুয়েলারের দিকে তাকাল গ্রেবার। চোখমুখ শুকিয়ে গেছে তার। পাথরে গড়া মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে ভাবলেশহীন মুখে।

একে একে মৃতদেহগুলোকে পরীক্ষা করল মুয়েকে। হঠাৎ একটা লাশের কানে পিস্তল ঠেকিয়ে গুলি করল। কেঁপে উঠল অল্প বয়েসী ছেলেটা, অথবা তার লাশটা।

পকেট থেকে রুমাল বের করে হাতমুখ মুছল মুয়েকে। পিস্তলটা পরিষ্কার করে হোলস্টারে রেখে দিল।

'দাঁত বসানো জায়গাটা ভাল করে ধুয়ে ওষুধ লাগাও তাড়াতাড়ি,' মুয়েকেকে পরামর্শ দিল মুয়েলার।

'যাচ্ছি, স্যার।'

মৃতদেহগুলোর দিকে চোখ ফেরাল মুয়েলার। খোলা চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটা—জন্মভূমির এই অবারিত অসীম আকাশ জন্ম জন্মান্তর ধরে দেখেও যেন সাধ মিটবে না তার।

হঠাৎ স্টেইনব্রেনারের ওপর খেপে উঠল মুয়েলার, 'ওর চোখ দুটো বন্ধ করে দাও!'

দুই

রাত। গোলার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল গ্রেবারের। প্রচণ্ড গোলাবর্ষণে পুড়ে পুড়ে যাচ্ছে আকাশ। আলোর ঝলকানিতে উদ্ভাসিত দিগন্ত। ভারী গোলা ফাটার শব্দ কাঁপতে কাঁপতে বয়ে যায় বহুদূর।

দশদিন আগেই মূল ফ্রন্ট থেকে সৈন্যবাহিনী সরে এসেছে এখানে। ক্রমশ এগিয়ে আসছে রাশিয়ানরা। আসলে গত কয়েকমাস ধরেই ক্রমাগত পিছু হটছে জার্মানবাহিনী।

কান পেতে কিছুক্ষণ গোলার আওয়াজ শুনল গ্রেবার, পরিস্থিতিটা বোঝার চেষ্টা করছে ও। কিছুক্ষণ পরে বিরক্ত হয়ে পাশ ফিরল, চোখ বুজল ঘুমোনোর আশায়।

বেশ কিছুক্ষণ এপাশ-ওপাশ করে উঠে পড়ল ও। ঘুম আর আসছে না আজ। বুট পরে বাইরে বেরিয়ে এল।

আবছায়া রাত, প্রায় হিম, গাছের ভিড়ে আটকে যায় চোখ, তাকিয়ে থাকতে থাকতে দুধের মত শাদা মনে হয় রাত্রিকে, এত পুঞ্জ পুঞ্জ তুষার; আর ওপরে, সবার ওপরে, লক্ষ চোখে তাকিয়ে আছে বিভাবরী। সহসা সমস্ত সৌন্দর্যকে গুঁড়িয়ে দিল গোলার আলোর ঝলকানি।

ডানে, বনের ওপাশ থেকে ভেসে এল বুকে কাঁপন ধরিয়ে দেয়া বিস্ফোরণের ভোঁতা আওয়াজ, শাঁ করে আকাশে উঠল একটা হাউই, ওপরে উঠে খুলে গেল

www.BanglaBook.org

প্যারাসুট; জ্বলন্ত জেলীফিশের মত আস্তে আস্তে নামতে শুরু করল নিচে। আকাশকে ঝেঁটিয়ে ফিরছে সার্চলাইটের তীব্র শাদা আলো; মনে হচ্ছে, আকাশের ওপারে থাকা ঈশ্বরকে খুঁজছে কেউ—খুন করবে বলে।

রাতের চেহারা দেখেই থমকে গেল গ্রেবার—জমাট, অটুট আকাশ। কোন বিমানের চিহ্ন দেখা না গেলেও, স্পষ্ট অনুভব করছে ও, বিমান আক্রমণের জন্যে এর চেয়ে ভাল রাত আর হয় না।

'ছুটিতে থাকা সৈনিকের কাছে রাতটা সত্যিই চমৎকার।'

চমকে মুখ ফেরাল গ্রেবার। কখন যে নিঃশব্দে ইমেরমান এসে দাঁড়িয়েছে পাশে, টের পায়নি।

'কি ব্যাপার,' জানতে চাইল ইমেরমান, 'এত তাড়াতাড়ি উঠে এলে যে? তোমার পালা আসতে এখনও আধঘণ্টা। শুয়ে ঘুম দাও গে, কাজে লাগবে।'

'নাহ্, ঘুম আর আসবে না আজকে।'

'কেন?' মিটিমিটি হাসল ইমেরমান, 'ছুটি পেয়েছ, অমনি ঘুম ছুটে গেছে? অবশ্য এ সময় ছুটি পেতে কপালের জোর লাগে।'

'কপালের নয়, খুঁটির জোর,' ওকে শুধরে দিল গ্রেবার, 'শেষ মুহূর্তেও ছুটি বাতিল করে দিতে পারে ওরা—এর আগে তিনবার হয়েছে এরকম। কতদিন যে বাড়ি যাই না!' বুক ঠেলে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ওর।

'কতদিনের ছুটি পাওনা আছে তোমার?'

'অনেকদিনের। প্রত্যেকবারই কোন না কোন ছুতোয় বাতিল করে দিয়েছে। শেষবার তো ছুটিতে না গিয়ে মরতে মরতে বেঁচে গেলাম।'

'সেটা বোধ হয় তোমার মনের জোরে,' গলাটা খাদে নামাল ইমেরমান, 'ওই মনের জোরেই টিকে আছি এখনও। না হলে কামানের গোলা আর আমাদের মৃতদেহে আরও উর্বর হয়ে উঠত রাইখের মাটি।'

সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে তাড়াতাড়ি চারপাশে তাকাল গ্রেবার। ওর ভাবভঙ্গি দেখে হেসে ফেলল ইমেরমান। 'ভয় নেই, নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছে সবাই—অন্তত স্টেইনব্রেনার তো বটেই।'

'না, না, ভয় পাইনি,' অম্লানবদনে মিথ্যে কথা বলল গ্রেবার।

হাসল ইমেরমান। 'ভয় তুমি একা পাচ্ছ না গ্রেবার, আমাদের একেবারে মজ্জায় ঢুকে গেছে সেটা। ব্যাঙের ছাতার মত যে হারে গুপ্তচর গজাচ্ছে, তাতে ভয় না পেয়ে কি উপায় আছে?'

নিশ্চুপ থাকল গ্রেবার। ছুটির আগে কোনরকম ঝামেলার মধ্যেই যেতে চায় না ও। ইমেরমানের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। সন্দেহ আর অবিশ্বাস থার্ড রাইখের সবচেয়ে বড় যোগ্যতা। কোথাও কেউ আর নিরাপদ নয় এখন। সুতরাং সবচেয়ে ভাল বুদ্ধি, মুখে তালাচাবি এঁটে থাকা।

'তুমি শেষবার বাড়ি গিয়েছিলে কবে?' নরম, সহানুভূতিমাখা গলায় জিজ্ঞেস করল ইমেরমান। গ্রেবারের মনের অবস্থাটা বুঝেছে সে।

'দু'বছর আগে।'

'ওরেব্বাপ, সে তো অনেকদিন! এবারে গিয়ে দেখবে, অনেক কিছু বদলে গেছে।'

'নতুন করে আর বদলাবে কি?'

'সেটা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।'

কলজের ভেতর খচ্ করে কেউ যেন ছুরি মারল গ্রেবারের—ব্যথায়, আশঙ্কায় মুচড়ে উঠল বুকের ভেতরটা। সত্যিই তো কথাটা, পৃথিবীতে আজকের দিনে সবই সম্ভব! একনিমেষে যে কতকিছু বদলে যেতে পারে, সে তো নিজের চোখেই দেখেছে। আসলে বুঝেও মনে আনতে চায়নি এসব কথা, শুধু শুধু নিজেকে কষ্ট দেয়া হবে জেনে।

'তুমি জানলে কি করে?' জিজ্ঞেস করল ও, 'তুমি তো আর ছুটিতে বাড়ি যাওনি!'

'ভুলে যেও না, প্রিজন ক্যাম্পে ছিলাম আমি। ওখানে থাকলে অনেক কথা জানা যায়।'

হাঁটতে হাঁটতে অনেকখানি এগিয়ে এসেছে ওরা। থামল গ্রেবার। অসম্ভব হতাশা আর কষ্ট বুকে, একটুও ভাল লাগছে না আর। কেন শুধু শুধু বাইরে এল ও? বাইরে এসেছিল নিঃসঙ্গ নির্জনতার আশায়, কেন কথা বলতে গেল? চেয়েছিল নিজেকে নিয়ে একাকী ভাবতে—গোলাবারুদ আর রক্তের গন্ধ থেকে দূরে, মানুষের নীচতা, হিংস্রতা, ক্ষুদ্রতা যেখানে স্পর্শ করবে না ওকে, সেখানে, ওর সেই শান্ত ছোট্ট বাড়িতে। চেয়েছিল মধুর স্বপ্নে ডুবে থাকতে, নিজের কাছ থেকে পালাতে—মানুষের আসল কাজই তাই, অন্তত এখন, এই পরিবেশে, ওর কাছে তো বটেই!

'পোশাকটা পাল্টে আসি।' ফিরতি পথ ধরল গ্রেবার। 'আমার ডিউটির সময় হয়ে গেছে।'

দূর থেকে চেঁচিয়ে উঠল ইমেরমান, 'জাউয়েরকে জাগিয়ে দিও।'

সারারাত গোলার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হলো আকাশ আর পৃথিবী। আগুনে ঝলসানো বাতাস রক্ত আর বারুদের গন্ধে ভারাক্রান্ত। গোলার আওয়াজে কেঁপে কেঁপে ওঠে বুক।

অপলক চোখে দিগন্তের দিকে চেয়ে আছে গ্রেবার, মনের ভেতরে ভিড় করে আসছে স্মৃতি—উনিশশো একচল্লিশ সাল। ফুয়েরার ঘোষণা করলেন,—'দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলছি আমরা।' নিঃসন্দেহে কথাটা বিশ্বাস করল সবাই। বিয়াল্লিশে আবার শোনা গেল তাঁর গলা—'আমরা অপরাজিত।' এবারেও কথাটা অবিশ্বাস করল না কেউ। মস্কো আর স্ট্যালিনগ্রাডের সীমান্তে এসে প্রথম বড়সড় ধাক্কা খেল জার্মানবাহিনী। একসাথে যেন রাশিয়ার সবক'টা কামান অগ্নিবর্ষণ করল শত্রুর ওপরে। কান্নায় ডুবে গিয়েছিল তখন সারা ইউরোপের ক্ষতবিক্ষত আকাশ, গোলার অবিশ্রান্ত গর্জনে ঢেকে গিয়েছিল ফুয়েরারের উদাত্ত কণ্ঠস্বর। সেই থেকে থামেনি কামানের গর্জন আর মানুষের আর্তনাদ। সমস্ত সৃষ্টিকে যেন ভোঁতা ছুরি দিয়ে জবাই

www.BanglaBook.org

করা হচ্ছে, তবু তার মরণ আর্তনাদ শোনার সময় নেই কারও।

রাশিয়ান সীমান্ত থেকে সেই যে পিছু হটতে শুরু করেছিল জার্মানবাহিনী, আজও থামেনি সেটা। গুজব রটল জার্মানবাহিনী বিধ্বস্ত—অধিকাংশই নিহত, কেউ পালিয়েছে, আত্মসমর্পণ করেছে বাকিরা।

গ্রামের আরও ভেতর দিকে এগিয়ে গেল গ্রেবার। কেমন যেন একটা ঘোরের ভেতরে রয়েছে ও।

আকাশে কাঁপা কাঁপা আবছা আলো, জ্যোৎস্নাহীন আকাশ—কেমন অদ্ভুত আর অবাস্তব। ঝিরঝির করে তুষার ঝরছে—বাড়িঘর, উঁচুনিচু টিলা, সব মনে হচ্ছে কত দূরের, অন্য কোন জগতের। দূরের বন যেন এগিয়ে এসেছে আরও, ক্রমাগত যেন এগিয়েই আসছে; ভেতরে লুকিয়ে আছে হিংস্র শ্বাপদ, জ্বলজ্বলে চোখে প্রতীক্ষা করছে ঝাঁপিয়ে পড়ার। মেরুদণ্ড বেয়ে শীতল একটা স্রোত নেমে গেল গ্রেবারের। শক্ত করে আঁকড়ে ধরল রাইফেলটা।

একটু যেন কমেছে গোলাবর্ষণ। আরও খানিকটা এগোল গ্রেবার। আবার ঝাঁপিয়ে এল স্মৃতি—উনিশশো চল্লিশ সালের ফ্রান্স। গ্রীষ্মকাল। বাঁধভাঙা বন্যার মত ভেতরে ঢুকে পড়েছে জার্মানবাহিনী। রাস্তাঘাট আহত, নিহত, ভীতসন্ত্রস্ত মানুষের ঢলে প্লাবিত।

পূর্ণযৌবনা গ্রীষ্ম। দিগন্তবিস্তৃত মাঠ আর অরণ্য। সব পেরিয়ে এগোচ্ছে জার্মানবাহিনী। এক সময় ওদের সামনে ফুটে উঠল স্বপ্নে দেখা সেই প্যারিস। রাইফেলের শব্দ নেই, গোলার গর্জন নেই; কী অসম্ভব শান্ত! ওদের জন্যে সবকিছু খোলা—রাজপথ, দোকান-পাট, সব। তখন কি পুরানো স্মৃতি এমন করে কষ্ট দিয়েছিল ওকে? বুকের ভেতরে কি এমনি না বলা কষ্ট জমে ছিল? হয়তো না। সেদিন যুদ্ধে জিতছিল জার্মানী।

আফ্রিকা। ওপরে তারাভরা অসীম আকাশ; নিচে, সাঁজোয়া গাড়ির তলায় চুপচাপ শুয়ে আছে চিরতৃষ্ণার্ত মরুভূমি। দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে ওরা। তখন, কিংবা সেখান থেকে পিছু হটে আসার সময়ও কি বিষণ্ণতায় আক্রান্ত হয়েছিল ও?

এরপর রাশিয়া। মাঝখানের পুরোটাই স্থলপথ। জার্মানী পর্যন্ত একটানা পিছু হটতে কোন অসুবিধাই হয়নি ওদের; শুধু আফ্রিকার চেয়ে পরাজয়টা এখানে মর্মান্তিক রকমের। সেই থেকে ভাবতে শুরু করেছে ও—একা নয়—আরও অনেকের মতই। হয়তো এটাই নিয়ম; যতদিন বিজয়ের মালা ঝুলেছিল গলায়, সবকিছু মনে হত স্বাভাবিক। লক্ষ অর্জনের জন্যে কোনকিছুকেই পরোয়া করেনি ওরা; কিন্তু কখনও ভাবেনি, কী সেই লক্ষ, কার লক্ষ? কেন দরকার সেই লক্ষে পৌঁছুনো? নিজেকেই প্রশ্ন করল গ্রেবার। এত দিন কি মনের সেই জানালাটা বন্ধ করে রেখেছিল ও?

না, মনের কাছ থেকে উত্তর পেল, তোমার কি মনে পড়ে না, কতবার সন্দেহের দোলায় দুলেছ তুমি, মুছে ফেলতে চেয়েছ তোমার হতাশা, ব্যর্থতা?

কারও কাশির শব্দে ভয়ঙ্করভাবে চমকে উঠল গ্রেবার। পুরোপুরি অন্যমনস্ক ছিল এতক্ষণ। চট্ করে ফিরে তাকাল শব্দের উৎসের দিকে। ধসে পড়া দেয়ালের

পাশ দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে কে যেন আসছে। কাছে আসতেই বোঝা গেল, জাউয়ের।

বিরাট একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল গ্রেবার।

কানফাটানো শব্দের সাথে সাথে থরথর করে কেঁপে উঠল মাটি। আপনা থেকেই বসে পড়ল ও। চোখ ফেরাতেই দেখল, কিছুটা দূরে লকলক করে আকাশ ছুঁতে চাইছে অগ্নিশিখা।

'রাশিয়ানদের গোলা নাকি?' কাছে আসতেই জাউয়েরকে জিজ্ঞেস করল গ্রেবার।

'নাহ্। ডিনামাইটের আওয়াজ। আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের কাজ।'

'তার মানে আবার পিছু হটছি আমরা?'

'তাই তো দাঁড়াচ্ছে ব্যাপারটা।'

চুপচাপ থাকল দু'জন। অনেকক্ষণ পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল জাউয়ের, 'কতদিন যে আস্ত একটা বাড়ি দেখিনি!'

'কেন? গির্জার পাশের বাড়িটা, কমাণ্ডার রায়ে থাকে যেখানে?'

'ওটা আবার অক্ষত আছে নাকি? সারা গায়ের ছাল উঠে গেছে মেশিনগানের গুলিতে—ছাত জ্বলে গেছে, কড়ি-বরগা খোলা। বাড়ি তো দূরের কথা, একটা পরিপূর্ণ গাছ, একটা অক্ষত রাস্তা পর্যন্ত নেই কোথাও। সারা পৃথিবীই বোধ হয় ক্ষতবিক্ষত এখন।'

'আসলেই তাই,' সায় দিল গ্রেবার, 'আমিও দেখিনি বহুদিন।'

'দেখবে,' হাসল জাউয়ের, 'বাড়িতে গিয়ে।'

বনের ওপাশটা লাল হয়ে উঠেছে আগুনে। বিষণ্ন দৃষ্টি মেলে সেদিকে তাকিয়ে রইল জাউয়ের। অনেকটা আত্মগতভাবে বলল, 'রাশিয়াকে যে কীভাবে ধ্বংস করছি আমরা, কথাটা ভাবলেই বুকের ভেতরে কষ্ট হয়। জার্মানীতে ঢুকলে ওরা কি করবে?' বুক খালি করা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। 'ওদের দেশে যা করেছি, ওরা তার বদলা নিলে জার্মানী বলে কোন দেশ থাকবে না এ পৃথিবীতে।'

বিকট গর্জনে কানে প্রায় তালা লেগে গেল ওদের। আকাশ-ছোঁয়া আগুনের শিখা ঝাঁপিয়ে পড়ল বনের ওপরে। অলস ভঙ্গিতে কয়েকটা গাছ উঠল আকাশে, বনবন করে পাক খেতে খেতে সরে যেতে লাগল দূরে। ভূমিকম্পের মত কেঁপে উঠল পায়ের তলার মাটি।

ফিরতি পথ ধরেছে গ্রেবার। খুব সাবধানে এগোচ্ছে; মাঝেমাঝেই থামছে গোলার গর্তের কাছে। গর্তের ওপরে তক্তা পাতা। নিচে তুষার-গলা কালো কুচকুচে জলের আভাস।

দূরে গির্জার অস্পষ্ট অবয়ব—চূড়াটা উড়ে গেছে, বুলেটে ক্ষতবিক্ষত দেয়াল, তবুও আছে।

দরজা দুটো হাট করে খোলা গির্জার। ভেতরে লেফটেন্যান্ট রাইকের মৃতদেহ রাখা। আরও দুটো মৃতদেহ পাওয়া গেছে—শেয়াল আর ইঁদুরে খাওয়া। ওদেরকে

www.BanglaBook.org

কাল সকালে সামরিক মর্যাদায় কবর দেয়া হবে।

পাল্লা দুটো ভেজিয়ে দিল গ্রেবার। চারপাশে জমাট অন্ধকার, আলোর ঝলকানিতে লাফাচ্ছে ছায়ারা—যেন অশরীরী প্রেতাত্মা সব; সুযোগ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। ঘাড়ের কাছে শিরশির করে উঠল গ্রেবারের। দ্রুত পা চালাল সরে আসতে।

লাশ তিনটের জন্য খোঁড়া কবরের কাছে পৌঁছুল ও। গর্তে জল জমেছে, টিপটিপ শব্দে জল পড়ছে নিচে, তন্ময় হয়ে কিছুক্ষণ শব্দটা শুনল। তারপর সরে এল ওখান থেকে। পায়ের ধাক্কায় ছলাৎ করে আলগা মাটি ঝরে পড়ল কবরে।

অন্য কোন শব্দ নেই; নেই আলো কিংবা উত্তাপ; এ যেন পৃথিবী নয়, অন্য কোন গ্রহ—মৃত, চিররুক্ষ—কেমন অপরিচিত আর মৃত্যুর গন্ধে ভরা। হবেই না বা কেন! কত অসংখ্য মৃত্যুর স্মৃতি বুকে নিয়ে শুয়ে আছে মাটি—মৃত্যু মানুষের, মৃত্যু মানবিকতার, মানুষের সুকুমার অনুভূতির, মনুষ্যত্বের।

প্রথম দিকে রাশিয়ানরা যেমন মরেছে, এখন তেমনি মরছে জার্মান সৈনিক। সেনাবাহিনীতে রংরুটের সংখ্যাই বেশি এখন। গেবারের পুরানো দিনের সঙ্গীর মধ্যে এখন পর্যন্ত বেঁচে আছে কেবল চার নম্বর কোম্পানির কমাণ্ডার ফ্রেজেনবুর্গ। বাকিদের কেউ বেঁচে থাকলেও পঙ্গু হয়ে বিদায় নিয়েছে সেনাবাহিনী থেকে।

পায়ের শব্দে চমক ভাঙল গ্রেবারের। অন্ধকারেও চিনতে পারল জাউয়েরকে। হনহন করে এদিকেই আসছে সে। তাড়াতাড়ি এগোল গ্রেবার। 'কি ব্যাপার, কি হয়েছে?'

'না, মানে একটু আগে মনে হলো কারও পায়ের শব্দ শুনলাম,' কিছুটা ভয়, কিছুটা দ্বিধা জড়ানো গলায় জানাল জাউয়ের।

'সে-কি?' উত্তেজিত হয়ে উঠল গ্রেবার, 'কোথায়?'

'গির্জার সামনের মাঠে।'

'তা-ই বলো!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল গ্রেবার, 'মরাখাওয়া ইঁদুরদের কাজ।'

'হয়তো বা!'

পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, ভয় পেয়েছে জাউয়ের। চলাফেরায় কেমন আড়ষ্ট ভাব। সন্ত্রস্তভাবে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে বারবার। গেরিলাদের কবরের কাছে এসে কিছুটা শান্ত হলো সে। কবরগুলোর দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করল, 'যাক, তবুও কবর পেল ওরা।'

'হ্যাঁ। যেহেতু সে-ব্যবস্থাটুকু নিজেরাই করেছিল।'

'ওরাও একদিন আমাদের কবর আমাদেরকে দিয়েই খোঁড়াবে।'

চোরা চাহনিতে জাউয়েরকে লক্ষ করল গ্রেবার। অনেকদিনের পুরানো সৈনিক জাউয়ের, ভাবপ্রবণও নয়; তবু, যে কথাগুলো দিনের বেলায় উচ্চারণ করত না সে, রাতে, এই অন্ধকারে, অবলীলায় বলে গেল সেগুলো। এসব কথা তো নিজেও ভেবেছিল ও, ভয় পেয়ে জোর করে নির্বাসন দিয়েছিল ভাবনাটাকে। কিন্তু এখন জাউয়েরের কথাগুলো ওর অন্তরের অন্তস্তল থেকে টেনে নিয়ে এল সুগভীর দীর্ঘশ্বাস।

'কিন্তু কি করার আছে বলো,' হাহাকারের মত শোনাল ওর কণ্ঠস্বর, 'হুকুম পালন করা ছাড়া!'

'হয়তো কিছুই নেই,' উদাস কণ্ঠে উত্তর দিল জাউয়ের. দিগন্ত ছাড়িয়ে ভেসে গেল তার দৃষ্টি।

তিন

কামানের ধোঁয়া, ধুলো আর মানুষের দুঃখে ঢাকা আকাশ—ধূসর, অন্ধকার। গাছের ডালে বসে আছে দু'একটা পাখি—স্থির, বিষাদ মলিন।

মৃতদেহ তিনটে নামানো হয়েছে কবরে। রাইকের লাশটা শক্ত ক্যাম্বিশে জড়ানো। গির্জা থেকে বয়ে আনার সময় বুটসুদ্ধ পা-টা খুলে পড়ে গিয়েছিল লাশের, সেটা আর ঠিকমত রাখেনি কেউ।

'কবরগুলোর ওপরে কিছু পাথর-টাথর চাপিয়ে দেব নাকি, স্যার?' কবর দেয়া শেষ করে মুয়েলারকে জিজ্ঞেস করল মুয়েকে। 'তাহলে শেয়াল কিংবা নেকড়ে টেনে বের করতে পারবে না।'

'শুধু শুধু কষ্ট করে কি লাভ?' বিরক্তিমাখা গলা মুয়েলারের।

'শালা বুদ্ধু,' মনে মনে ওকে ঝেড়ে গাল দিল মুয়েকে। 'সব মাথামোটাগুলোই বসে আছে অফিসার হয়ে, প্রাণ দিচ্ছে শুধু রাইকের মত সত্যিকারের বীরেরা।' মুখে বলল, 'শুধু শুধু নয়, স্যার, অনেক হয়েছে এ-রকম।'

'ঠিক আছে, ভাল মনে করলে করো। আর ক্রুশগুলো শক্ত করে পুঁতে দিও।'

জাউয়ের, ইমেরমান আর গ্রেবার থাকল কবরের কাছে।

'এত নরম মাটি,' বেলচা চালাতে চালাতে মন্তব্য করল জাউয়ের, 'ক্রুশগুলো সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে হয়!'

'টিকবে না বেশিদিন।'

'বেশিদিনের কথা বাদ দাও। তিনদিনও টেকে কিনা দেখো!'

'কেন, রাইকে এসে তোমার কানে কানে বলে গেল নাকি?' জাউয়েরের কথায় টিপ্পনী কাটল ইমেরমান।

রেগেমেগে কি যেন বলতে গেল জাউয়ের; তার আগেই তাড়া দিল গ্রেবার, 'ঝগড়া বাদ দিয়ে ক্রুশগুলো তোল এবার।'

কথাগুলো যেন কানেই গেল না ওদের। অগত্যা নিজেই একটা ক্রুশ তুলে নিল গ্রেবার। চোখা দিকটা মাটিতে তাক করে দু'হাতে ওপরে তুলল, জোরের সাথে নামিয়ে আনল নিচে। বেলচার দুটো ঘা খেয়েই গভীরভাবে পুঁতে গেল ক্রুশটা।

'দেখলে তো,' সকৌতুকে গ্রেবারের দিকে তাকাল জাউয়ের, 'কেমন নরম মাটি! তিনদিনও টিকবে না ওটা।'

'তিনদিনের এখন অনেক বাকি,' গ্রেবার মুখ খোলার আগেই ঝাঁঝিয়ে উঠল

www.BanglaBook.org

ইমেরমান, 'তার চেয়ে পাথরের ওই ক্রুশটা এনে বসিয়ে দাও জায়গামত।'

দু'চোখ কপালে তুলল জাউয়ের, 'ওটা তো রাশিয়ান ক্রুশ!'

'তাতে কি হয়েছে? ঈশ্বর তো আর রাশিয়ান নন!'

বেলচাটা মাটি থেকে তুলে নিয়ে নিঃশব্দে ফিরে চলল গ্রেবার। পেছন থেকে বিদ্রূপ করল ইমেরমান, 'ছুটি পেতেই বাড়ির জন্য একেবারে প্রাণ আইঢাই করতে শুরু করেছে!'

সেলারে আশ্রয় নিয়েছে ওরা। সেলারের ছাতটা জায়গায় জায়গায় ফাটা। একটা ফোকর দিয়ে আলো এসে পড়েছে নিচে, সেখানেই তাস নিয়ে বসে আছে চারজন। ধুমসে খেলে যাচ্ছে ওরা। কোণের দিকে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে দু'জন। একজায়গায় উপুড় হয়ে চিঠি লিখছে জাউয়ের।

হন্তদন্ত হয়ে সেলারে ঢুকল স্টেইনব্রেনার। 'আজকের শেষ খবরটা শুনেছ কেউ?'

'দুঃখিত, রেডিওটা খারাপ,' চেষ্টাকৃত গম্ভীর গলায় উত্তর দিল একজন।

'ঠিক করে রাখতে পারো না?' ঘেউ করে উঠল স্টেইনব্রেনার। 'হয়েছেটা কি?'

'ব্যাটারি নেই,' জানাল বেরনিং।

'তা আর থাকবে কেন!' দাঁতমুখ খিঁচিয়ে উঠল স্টেইনব্রেনার, 'জায়গামত দু'ঘা পড়লেই...' দরজায় মুয়েকেকে দেখে থেমে গেল সে।

সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামল মুয়েকে। 'কি হয়েছে?'

'শেষ খবর শুনেছ কিনা কেউ, সেটাই জিজ্ঞেস করছিলাম।'

চারপাশে নজর বোলাল মুয়েকে। এখনও সমান উৎসাহে তাস পিটিয়ে যাচ্ছে চারজন, আরও জোরাল হয়ে উঠেছে নাসিকাগর্জন, অখণ্ড মনোযোগে চিঠি লিখছে জাউয়ের। চড়াৎ করে মাথায় রক্ত চড়ে গেল মুয়েকের। ওর চিৎকারে থরথর করে কেঁপে উঠল সেলার। 'পেয়েছটা কি তোমরা? মনে নেই, এখনকার প্রতিটা খবর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, আর তোমাদের ওপর নির্দেশও আছে সেটা শোনার?'

'নিশ্চয়ই,' তাস থেকে চোখ না সরিয়েই বলল ইমেরমান।

'অ্যাটেনশান,' মুয়েকের চিৎকারে ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ল তুষারকণা। তাসগুলো শুধু নামিয়ে রেখে ধীরেসুস্থে উঠে দাঁড়াল খেলোয়াড়রা। কলমটা বন্ধ না করেই সোজা হলো জাউয়ের।

'এত গুরুত্বপূর্ণ খবর,' ভাষণ শুরু করল স্টেইনব্রেনার, 'অথচ কেউ শুনল না! আমেরিকায় শ্রমিক ধর্মঘট, ইস্পাত শিল্পে মন্দা...' আরও কি কি যেন বলে গেল সে, এক কান দিয়ে ঢুকে অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে গেল সবার।

হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলল মুয়েকে, থতমত খেয়ে থেমে গেল স্টেইনব্রেনার। একটু চুপ করে থেকে একঘেয়ে গলায় ফের শুরু করল, 'অবশ্য ভাল খবরও আছে। এবারের বর্ণনাগুলো কানেই পৌঁছুল না কারও। 'হাইল হিটলার' শুনে বোঝা গেল শেষ হয়েছে তার ভাষণ।

'হাইল হিটলার,' না বললেই নয়, তাই কোনরকমে কয়েকজন উচ্চারণ করল কথাটা।

মুয়েকে বেরিয়ে যেতেই তাসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল চারজন।

বিকেলের দিকে আহত সৈনিকের প্রথম দলটা পৌঁছুল। মারাত্মক আহতদের সেই গাড়িতেই সাথে সাথে পাঠানো হলো সদরে, ভাল হাসপাতালে। সীমাহীন প্রান্তরের মাঝখান দিয়ে যাচ্ছে গাড়িটা, অসম্ভব ছোট্ট লাগছে ওটা; আস্তে আস্তে আরও ছোট হলো, মিলিয়ে গেল দিগন্তে, চিরদিনের জন্যেই বুঝি হারিয়ে গেল দিকচিহ্নহীন প্রান্তরে।

আহত সৈনিকের আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে না আর। খিদেয়, তৃষ্ণায় একেবারে কাহিল হয়ে পড়েছে সবাই। কয়েকজনের অবস্থা বেশ খারাপ, কিন্তু অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা যায়নি বলে গির্জার ভেতরেই অপারেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে ওদের।

জারের আমলের গির্জা—গোলার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত, ছাত উড়ে গেছে, তবু আরও আলোর জন্যে দরজা জানালা সব খুলে দেয়া হয়েছে। অপারেশন করছে ক্লান্ত বিধ্বস্ত একজন ডাক্তার। তাকে সাহায্য করছে দু'জন অ্যাসিস্ট্যান্ট।

একে একে আনা হচ্ছে স্ট্রেচারগুলো। বাইরে, আকাশ আর প্রান্তরে, সোনা ঢেলেছে সূর্য, গোধূলির রাঙা আলোয় অদ্ভুত মায়াময় সবকিছু; টেবিলে উজ্জ্বল বাতিটা যেন হলদেটে তাঁবু।

সামনের দেয়ালে যিশু আর মা মেরীর পাথরের মূর্তি। ছেলের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে আছেন মা মেরী—দুটো হাতই ভেঙে গেছে তাঁর, যিশুর পা নেই একটা।

অপারেশন চলছে, ঘরের এককোণে রাখা গামলায় জমা হচ্ছে বিচ্ছিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—প্রায় ভরে উঠেছে গামলাটা। ঘরে ওষুধ, চেতনানাশক, পচা দুর্গন্ধ আর রোগীর গোঙানি সব মিলে একেবারে নারকীয় পরিবেশ।

হঠাৎ একটা কুকুরকে দেখা গেল দরজায়—গায়ে ঝাঁকড়া লোম, মৃদু মৃদু লেজ নাড়ছে। বারকয়েক তাড়া লাগাল কয়েকজন। কিন্তু প্রত্যেকবারই কিছুদূর গিয়েই আবার ফিরে এল কুকুরটা।

'ওটা আবার এল কোত্থেকে?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল গ্রেবার। ফ্রেজেনবুর্গের সাথে বাইরে দাঁড়িয়ে গল্প করছে ও।

'বন থেকে বোধ হয়। বেশ ভাল জাতের কুকুর।'

'কিন্তু বন থেকে আসবে কেন? ওদের খাবারের তো অভাব নেই কোথাও!'

কুকুরটা সতর্ক চোখে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে, বেগতিক দেখলেই ছুট দেবে।

'খাবারের জন্যে নয়,' ব্যাখ্যা করল ফ্রেজেনবুর্গ, 'কাউকে খুঁজতে এসেছে সম্ভবত। পোষা কুকুর।'

একটু পরে দু'জন বাহককে দেখা গেল দরজায়, ধরাধরি করে একটা স্ট্রেচার নিয়ে আসছে। বাইরে অপারেশন টেবিলেই মারা গেছে সৈনিকটা।

দু'পা পিছিয়ে এল কুকুরটা, তারপর গুটিগুটি এগোল স্ট্রেচারের পেছনে

www.BanglaBook.org

পেছনে। যেতে যেতে মাথা উঁচু করে বারকয়েক গন্ধ নিল বাতাসে, হঠাৎ হাউহাউ করে আর্তনাদ করে উঠল সে—একছুটে হারিয়ে গেল গির্জার আড়ালে।

'কুকুরটা কাঁদছিল,' ব্যথাভরা গলায় বলল গ্রেবার।

'হ্যাঁ,' বুক খালি করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ফ্রেজেনবুর্গ, 'আসলেই ভাল জাতের কুকুর।'

'কিন্তু মরা মানুষ খায়।'

'আমরাও প্রায় তাই।'

'মানে?'

'ওরা মরা মানুষ খায়, আমরা খাই মানুষের প্রাণ। মানবিক মূল্যবোধ যেদিন থেকে হারিয়েছি, সেদিন থেকেই ওদের সমান হয়ে গেছি আমরা—কিংবা ওদের চেয়েও নিচে। ভেবে দেখো, দশটা বছর সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন আমরা; দশ দশটা বছর এই নারকীয় পরিবেশে, যেখানে অর্থহীন, ভিত্তিহীন আকাশছোঁয়া গর্ব আর ঔদ্ধত্য।' মুখ বিকৃত করে হাসল ফ্রেজেনবুর্গ। 'অথচ আমরাই ওদেরকে বসিয়েছি ওপরে। ক্রীতদাসের মত সমস্ত ভণ্ডামি সহ্য করেছি ওদের—আমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি দুনিয়ায়, নীল রক্ত প্রবাহিত আমাদের ধমনীতে। কিন্তু এই বিশ্বাসের বদলে পেলামটা কি? সে প্রশ্ন করার সময় হয়েছে এখন।'

অবাক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল গ্রেবার। ওর মনের কথাই প্রকাশ করেছে ফ্রেজেনবুর্গ। জানতে চাইল, 'সবই যদি জানতে, তবে যুদ্ধে এলে কেন?'

'যুদ্ধে যোগ না দেয়ার অপরাধে গুলি খেয়ে কিংবা বন্দীশিবিরে পচে মরতে রাজী ছিলাম না বলে।'

'বয়সের অজুহাতে এড়িয়ে যেতে পারতে!'

'হয়তো পারতাম। যদিও এখন আমার চেয়ে বেশি বয়েসী লোককেও আসতে হচ্ছে যুদ্ধে। আমি না এলেও তো সমস্যার সমাধান হত না। সবচেয়ে বড় কথা, দেশের বিপদের সময় আমি চাইনি জন্মভূমির ডাকে সাড়া না দিয়ে থাকতে, কিংবা কোথাও পালিয়ে যেতে। যদি তাই করতাম, সেটাই হত মিথ্যে অজুহাত।'

চুপ করে থাকল গ্রেবার। কিছু বলার নেই ওর। একেবারে অন্তর দিয়ে অনুভব করছে সে ফ্রেজেনবুর্গের কথাগুলো।

যাব যাব করছে সূর্য, তার সোনার ডালা উপুড় করে দিয়েছে সে।

ম্লান হাসল ফ্রেজেনবুর্গ। 'যুদ্ধে আমরা হেরে গেছি, গ্রেবার। দায়িত্বশীল, সাহসী যে কোন সেনাপতি ইচ্ছে করলে অনেক আগেই বন্ধ করতে পারত প্রাণের এই অনর্থক অপচয়। কোন মানে হয় না এই অর্থহীন যুদ্ধের। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, আর যে ব্যবহার ওরা পেয়েছে আমাদের কাছ থেকে, এখন সন্ধির কথা বললেও রাজী হবে না ওরা। যুক্তি, মানবিক অধিকার, কোনকিছুর পরোয়া করিনি আমরা।'

'আমরা নই,' বুকের ভেতরের আবেগ যেন একসাথে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে গ্রেবারের, 'এ সবকিছুর মূলে এস.এস. সৈন্যরা।'

চকচক করে উঠল ফ্রেজেনবুর্গের চোখজোড়া। 'ঠিকই বলেছ। ওদের মত কতগুলো নরকের কীটের জন্যে এখনও যুদ্ধ করছি, যাতে আরও কিছুদিন

আমাদের মাথার ওপর বসে থাকতে পারে ওরা। অথচ যুদ্ধে বহু আগেই হেরে গেছি আমরা।'

বাদুড়ের ডানার মত দৃষ্টি ঢাকছে অন্ধকার। গির্জার দরজা বন্ধ করে জানালায় কালো পর্দা টাঙিয়ে দিল কেউ।

একটা সিগারেট ধরাল গ্রেবার। কষে টান দিয়ে ফ্রেজেনবুর্গের দিকে এগিয়ে দিল কেসটা। এই পরিবেশে, মনের এই অবস্থায়, একজন সৈনিকের কাছে সিগারেটের চেয়ে বড় বন্ধু আর নেই।

'ছুটিতে যাচ্ছ কবে?' জানতে চাইল ফ্রেজেনবুর্গ।

'ঠিক জানি না। কাগজপত্র এখন পর্যন্ত এসে পৌঁছায়নি। কবে যে পৌঁছবে, তারও কোন ঠিক নেই। আজকাল কোনকিছু জানতেও ইচ্ছে করে না আর। মনে হয়, যেন বহুদিন পর ঘুম ভেঙেছে আমার। মাঝে মাঝে লজ্জা পাই এসব ভেবে।'

'এ লজ্জা তোমার একার নয়,' সস্নেহে গ্রেবারের কাঁধে হাত রাখল ফ্রেজেনবুর্গ, 'আমাদের সবার। লজ্জা আমাদের আদিম বর্বরতার। যুদ্ধের স্বপক্ষে যা কিছু কথা আছে, সব ঠেসে ঢোকানো হয়েছে আমাদের মগজে, যেন অন্য কিছু শুনতে না পাই; শেখানো হয়েছে অন্যকে ঘৃণা করতে, যেন স্বাভাবিকভাবে কিছু ভাবতে না পারি। সে যাকগে,' হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলাল ফ্রেজেনবুর্গ, 'পোলমানকে চেনো তো?'

'হ্যাঁ, আমাদের ইতিহাসের শিক্ষক ছিলেন উনি।'

'বেঁচে থাকলে ওঁকে আমার শুভেচ্ছা জানিও। আজ চলি। আশা করি শিগগিরই দেখা হবে আমাদের।'

ফিরে চলল ফ্রেজেনবুর্গ। ওদের সেনাবাহিনী আশ্রয় নিয়েছে পাশের গ্রামে।

একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল গ্রেবার। আঁধারে ফ্রেজেনবুর্গ হারিয়ে যেতেই ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল ওর। ফিরে চলল ক্যাম্পের দিকে।

গির্জার দরজার ফাঁক দিয়ে চুঁইয়ে এসেছে একফালি আলো। গলে যাওয়া তুষারের ভেতর থেকে আরও তিনটে মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে আজ। আহতদের মধ্যে যারা মারা গেছে, তাদেরকেও রাখা হয়েছে ওদের সাথে।

ডানে মোড় নিল গ্রেবার। রাস্তার পাশে চোখ পড়তেই ধড়াস করে উঠল বুকের ভেতরে। অন্ধকারে ধক্‌ধক্ করে জ্বলছে নীলচে দুটো চোখ। একটা ঢিল তুলতেই অদৃশ্য হয়ে গেল চোখজোড়া।

BanglaBook.org

চার

থরথর করে কেঁপে কেঁপে উঠছে সেলারটা, মাঝে মাঝেই দেয়াল থেকে ঝুরঝুর করে খসে পড়ছে পলেস্তারা।

ঘুমোচ্ছিল ওরা, হঠাৎ প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে ধড়মড় করে উঠে বসেছে।

www.BanglaBook.org

জাগতেই অ্যান্টি-এয়ারক্র্যাফট গানের বিকট আওয়াজে কানে তালা ধরে গেছে ওদের। ভয়ে, আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল একজন রংরুট, 'বাইরে চলো, শিগগির!'

'খবরদার! কেউ বাইরে যাবে না,' ধমকে উঠল একজন।

কানের পর্দা যেন ফাটিয়ে দিল বিস্ফোরণের বিকট আওয়াজ, সাথে সাথে ভয়ানক কেঁপে উঠল সেলারটা। কি যেন ভেঙে পড়ল ওপর থেকে। ফেটে যাওয়া ছাদের ফোকর দিয়ে এক ঝলক দেখা গেল। বাইরে যুদ্ধের তাণ্ডব। ভোর হচ্ছে, জন্ম হচ্ছে নতুন দিনের, তাই যন্ত্রণাকাতর যেন পৃথিবী।

রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে ওরা। টানটান হয়ে আছে সমস্ত স্নায়ু। যে কোন মুহূর্তে ধসে পড়তে পারে ছাতটা। নিজেদেরকে ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিয়েছে সবাই। জানে, কপালের জোর না থাকলে কোন সৈনিক বাঁচতে পারে না।

ক্ষুরের ফলার ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে সময়। নিঃশ্বাস ফেলতেও যেন ভুলে গেছে সবাই। প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করছে আরেকটা ভয়াবহ বিস্ফোরণের। কিন্তু কপাল ভাল ওদের, আস্তে আস্তে দূরে সরে গেল বিস্ফোরণের আওয়াজ।

মুখ খিস্তি করল একজন, 'আমাদের ফাইটারগুলো ঘোড়ার ঘাস কাটছে নাকি?'

কথা শেষ হবার আগেই শব্দ শোনা গেল ফাইটার প্লেনের।

'আমাদের প্লেন,' জানাল স্টেইনব্রেনার।

কান খাড়া করল ওরা। হঠাৎ করে গর্জে উঠল মেশিনগান। ঠিক তখনই তিন-চারটে বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল ঘরবাড়ি। আলোর ঝলকানিতে ছলকে উঠল ভেতরের তরল অন্ধকার; ভেসে এল লাল, নীল, হলুদ রঙের ঢেউ; মাটি, ইঁট, পাথর ছিটকে উঠল শূন্যে, কালো কালিতে ঢেকে গেল আকাশ, মাটি, মানুষ, মানুষের সভ্যতা।

সহসা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল সেলারের ছাত। বীভৎস আওয়াজ কর্মতেই শোনা গেল আহতদের মরণ আর্তনাদ।

কিভাবে যে বাইরে এসেছে, নিজেও জানে না গ্রেবার। বুকে হেঁটে বেশ কিছুটা সরে এসে আস্তে করে মাথা তুলল। অবিশ্বাসের সাথে দেখল, গির্জা ছাড়া সবকিছু মুছে গেছে ওর চোখের সামনে থেকে; যেন সমস্ত পৃথিবীতে ও-ই আছে, আর আছে গির্জাটা। সেলারের দিকে তাকাল ও। আবছা আলোর প্রবেশপথটা দেখা যাচ্ছে। কারা যেন নড়াচড়া করছে ওখানে।

'এতদিনে টের পেলাম,' কানের কাছে জাউয়েরের গলা শুনে ভয়ঙ্কর চমকে উঠল গ্রেবার, 'যুদ্ধ কাকে বলে! বরাত ভাল যে পুরো ছাতটা একসাথে ধসে পড়েনি!'

সেলার থেকে ছুটে বেরিয়ে এল মুয়েকে। কপাল কেটে গেছে তার, দরদর করে রক্ত পড়ছে ক্ষতস্থান থেকে; সেদিকে ভ্রূক্ষেপই নেই। চিৎকার করে নির্দেশ দিচ্ছে অন্যদের, 'সবাই বাইরে বেরিয়ে এসো। ছাত ধসে গেছে। চাপা পড়েছে অনেকে, ওদের উদ্ধার করতে হবে।' গোলমালে মাথা খারাপ হয়ে গেছে তার। বোকার মত জিজ্ঞেস করল, 'কে কে চাপা পড়েছে?'

কোন উত্তর এল না তার কথার।

জোড়া থেকে খুলে এসেছে লোহার বীম। সিমেন্ট, সুরকি আর পাথরের চাঁই নিয়ে নেমে এসেছে নিচে। ধুলোর মেঘ আর অন্ধকারে দৃষ্টি চলে না ভেতরে। মাথার ওপরে ধূসর, কান্নাভেজা আকাশ; দূরে বিস্ফোরণের কাঁপা কাঁপা ভোঁতা আওয়াজ।

ইঁট, বালি, সিমেন্টের চাঁই সরিয়ে কোনরকমে হামাগুড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকল গ্রেবার। কিছুদূর এগোনোর পর শুয়ে পড়তে হলো ওকে মাটিতে। একটা হাত সামনে বাড়িয়ে রেখেছে ও—হাতড়াচ্ছে। হঠাৎ চাপা গোঙানির শব্দ কানে এল, প্রায় একই সাথে কারও হাতের ওপর আঙুল পড়ল ওর। চিৎকার করে উঠল ও, 'একজনকে পাওয়া গেছে!'

হাতড়ে হাতড়ে লোকটার মাথাটা খুঁজল গ্রেবার। না পেয়ে হাত ধরে টানল। আর্তনাদ করে উঠল সৈনিকটা। চিৎকারের উৎস থেকে এবারে তার মাথা খুঁজে পেল গ্রেবার।

ফাঁকফোকর দিয়ে অন্য পাশে দুটো ছায়ামূর্তিকে নড়তে দেখল ও, গলা শুনে স্টেইনব্রেনারকে চিনল সাথে সাথে। 'ওখানেই থাকো তুমি,' চিৎকার করে গ্রেবারকে বলল সে, 'ওর মাথাটা উঁচু করে ধরে রাখো, আসছি আমরা।'

উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল গ্রেবার। ডান হাতটা লোকটার মাথার নিচে রাখল। অন্যপাশ থেকে ইঁট-পাথর সরানোর আওয়াজ পেল।

'কে, চিনতে পেরেছ?' জিজ্ঞেস করল জাউয়ের।

'না।'

হির্শলাণ্ড এসে হাত লাগাল ওদের সাথে। সৈনিকটার পা ধরে টানতেই চিৎকার করে উঠল গ্রেবার, 'আস্তে, হাত মুচড়ে আছে ওর।'

স্ট্রেইনব্রেনার জানতে চাইল, 'বেঁচে আছে তো?'

হাতড়ে হাতড়ে লোকটার নাকের নিচে আঙুল রাখল গ্রেবার। ঠিকমত বুঝতে পারল না। বলল, 'বুঝতে পারছি না। মিনিট দুয়েক আগেও বেঁচে ছিল।'

বিস্ফোরণে কেঁপে কেঁপে উঠছে চারপাশ। মনে হচ্ছে; যে কোন মুহূর্তে এই পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে ওরা; তবু অক্লান্তভাবে কাজ করে যাচ্ছে চারজন।

'এভাবে হবে না।' হাঁপাতে হাঁপাতে হাতের শাবলটা ছুঁড়ে ফেলে দিল জাউয়ের। 'এতবড় লোহার বীম শাবল দিয়ে সরানো যাবে না। তাছাড়া আলোর দরকার।'

'ঠিক বলেছ, একেবারে বিয়ে বাড়ির আলোকসজ্জা দরকার,' বিদ্রূপ করল স্ট্রেইনব্রেনার। 'শত্রু বিমানকে সেধে ঘাড়ের ওপর ডেকে আনার জন্যে।'

'এর মানে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই,' ভাবল গ্রেবার। ঠেস দিয়ে দাঁড়াল ভাঙাচোরা দেয়ালে, আকাশে হারাল ওর বিষাদময় দু'চোখ। অন্ধকার আকাশকে বিদীর্ণ করে যাচ্ছে ভয়ঙ্কর শব্দের অন্তহীন প্রবাহ, পেছনে ধেয়ে আসছে কালো মৃত্যু, বেদনা, ধ্বংসের অবিরল স্রোত।

হামাগুড়ি দিয়ে আবার আহত লোকটার কাছে ফিরে গেল গ্রেবার। খুব

www.BanglaBook.org

সাবধানে তর্জনী রাখল লোকটার ঠোঁটে। একটু হাঁ হয়ে আছে লোকটার মুখ।

তিরতির করে একটু যেন কাঁপল ঠোঁটজোড়া, তারপর খুব আস্তে দাঁতের চাপ পড়ল আঙুলে। আনন্দে, উত্তেজনায় ঝংকৃত হয়ে উঠল গ্রেবারের স্বর, 'শিগগির এসো, বেঁচে আছে ও!'

অমানুষিক পরিশ্রম করে সৈনিকটাকে ধ্বংসস্তূপ থেকে বের করল ওরা। কিছুটা আলোয় নিয়ে আসতেই চেনা গেল তাকে—লেমারস; বেতের মত লিকলিকে শরীর, রক্তে মাখামাখি। ওর চশমাটা পাওয়া গেল কাছাকাছিই, পুরোপুরি অক্ষত, একটু আঁচড়ও পড়েনি। শুধু লেমারসই মারা গেছে।

গ্রেবার আর শ্নাইডারের পালা পাহারার। ক্যাম্প ছেড়ে বেরোল দু'জনে।

এলোমেলো অস্থির বাতাসে বারুদের কটু গন্ধ। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল গ্রেবার। গির্জার একটা পাশ সম্পূর্ণ ধসে গেছে। দেখার সাথে সাথে ছ্যাঁৎ করে উঠল ওর বুকের ভেতরে—রায়ের কিছু হয়নি তো? পরক্ষণেই দেখল, উদ্ধারকাজ তদারক করছে সে। বিরাট একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ও, বুক থেকে যেন দুঃসহভার নেমে গেল।

নিহতদের সারি সারি শুইয়ে রাখা বাইরে, অন্যপাশে আহতদের। আতঙ্কে যেন আর্তনাদ করতেও ভুলে গেছে তারা।

চারপাশে অসংখ্য গর্ত—বিশাল, সব গোলার আঘাতে সৃষ্টি। গর্তের তলায় ঘন অন্ধকার; কুয়াশা আর ধোঁয়া গড়িয়ে গড়িয়ে পাক খেয়ে নামছে নিচে—যেন বিশাল কোন সরীসৃপ, পাকে পাকে জড়িয়ে ধরছে সমস্ত পৃথিবীকে।

একটা গর্ত দেখিয়ে প্রস্তাব করল শ্নাইডার, 'এটাকে কবর হিসেবে ব্যবহার করলে কেমন হয়?'

'সম্ভব নয়,' জানাল গ্রেবার। 'কবর ভরাট করার মত অত মাটি পাবে না। এর চেয়ে নতুন কবর খোঁড়া অনেক সোজা হবে।'

রাইকের কবরের পাশে পৌঁছুল ওরা। ক্রুশটা নেই। থমকে দাঁড়াল শ্নাইডার। কান খাড়া করল। হঠাৎ করে বেড়ে গেছে গুলির শব্দ। দিগন্ত উদ্ভাসিত করে একটা হাউই উঠল, অনেকগুলো আলোর ফুলকি জ্বলল আকাশে। একটু পরেই ভেসে এল বিস্ফোরণের আওয়াজ।

সারা সীমান্ত জুড়ে ভারী কামানের গর্জন। এর অর্থ একটাই—ঝড় এল বলে। কে জানে, হয়তো ঝড়ের মুখে কুটোর মত উড়ে যাবে ওরা, ওদের সমস্ত প্রতিরোধ।

কখন শুরু হবে মূল আক্রমণ? ভাবল গ্রেবার। হয়তো কাল সকাল হবার আগেই।

ঘন হয়ে নেমেছে কুয়াশা, ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে প্রান্তর। রাত বাড়বে, আরও ঘন হবে কুয়াশা; তখন স্মৃতিরা আসবে, আসবে রাশিয়ানরাও, স্মৃতির মতই ঝাঁপিয়ে পড়বে অতর্কিতে। দু'সপ্তা আগে বেয়াল্লিশজন মারা গেছে এ ধরনের আক্রমণে।

অনেকটা ঘোরের ভেতরে যেন হাঁটছে গ্রেবার। ওর বিশ্বাসই হতে চাইছে না, এরকম অবস্থায় ওর ছুটি মঞ্জুর হয়েছে। বাড়িতেও খবর পাঠায়নি ও। সৈন্যদলে নাম লেখাবার পরে দু'বার মাত্র বাড়িতে গিয়েছিল, শেষবার দু'বছর আগে। সেসব এখন স্বপ্নের মত মনে হয় ওর কাছে, যে কথা মনে হলে নাম না জানা কষ্ট এসে বাসা বাঁধে বুকের ভেতরে।

'তুমি কোনদিকে যাবে?' জিজ্ঞেস করল শ্নাইডার।

'একদিকে গেলেই হয়!' উদাস কণ্ঠে উত্তর দিল গ্রেবার। অদ্ভুত একটা শূন্যতায় এখন ডুবে আছে ও।

'ঠিক আছে, আমি বাঁয়ে যাচ্ছি। তুমি ডানদিকে যাও।'

আরও গাঢ় হয়ে উঠেছে কুয়াশা। আস্তে করে কুয়াশার ধূসর সমুদ্রে হারিয়ে গেল শ্নাইডার। আরও যেন স্পষ্ট হয়ে উঠল গোলার গর্জন।

কতক্ষণ হেঁটেছে, খেয়াল নেই গ্রেবারের, হঠাৎ চমকে উঠল গুলির শব্দে। পর পর দু'বার শব্দ হলো গুলির, তারপর আবার। প্রায় একই সাথে আর্তনাদ করে উঠল শ্নাইডার।

বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল গ্রেবারের, নিজের অজান্তেই খামচে ধরল রাইফেলের বাঁট, পা টিপে টিপে এগোল শব্দের উৎসের দিকে।

কে যেন নাম ধরে ডাকল ওর। উত্তর দিয়েই চট্ করে একপাশে সরে গেল ও। আবার ডাকল লোকটা, এবারে স্টেইনব্রেনারকে চিনল গ্রেবার।

'গুলি খেয়েছে শ্নাইডার, মাথায়,' অন্ধকারেও ঝিলিক দিয়ে উঠল স্টেইনব্রেনারের চোখ দুটো।

'এই কুয়াশার ভেতরে হারামজাদাদের খুঁজেও পাওয়া যাবে না। এখন থেকে খুব কাছাকাছি থাকতে হবে দু'জনকে।'

গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়াল ওরা। শ্নাইডারের জন্যে বুকের ভেতরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে গ্রেবারের। ও নিজেও তো বাঁ-দিকে যেতে পারত, আর তাহলে···। মাথা ঝাঁকিয়ে তাড়াতাড়ি চিন্তাটা দূর করে দিল গ্রেবার। সবই ভাগ্য!

চরাচর ডুবে গেছে গোলার গর্জনে; ক্রমাগত চিৎকার করে যাচ্ছে মেশিনগান, বাতাসে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ—মানুষের, অমানুষের।

'ওরা আক্রমণ শুরু করেছে,' ফিসফিস করল স্টেইনব্রেনার, 'অথচ আমরা যে কেন এখানে বসে আছি, ঈশ্বরই জানেন!'

ফুয়েরারও তার চেয়ে কম জানেন না, ভাবল গ্রেবার; কিন্তু নিশ্চুপ থাকল ও।

'এ হারে আক্রমণ চললে প্রচুর নতুন সৈন্য দরকার হবে আমাদের। তখন বড়োসড়ো অফিসার হয়ে যেতে পারো তুমি।'

'কিংবা মাটিকে আরও কিছুটা উর্বর করে দিতে পারি।'

'সবসময় খারাপটাই ভাব তোমরা,' রুক্ষস্বরে বলল স্টেইনব্রেনার, 'জেনে রেখো, যুদ্ধে সবাই মরে না।'

'নিশ্চয়ই, তাহলে তো যুদ্ধই হত না!'

www.BanglaBook.org

এক ফালি চাঁদ উঠেছে আকাশে। ডিউটি শেষ ওদের। কুঠুরিতে ফিরেই কম্বল বিছিয়ে টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল স্টেইনব্রেনার। গ্রেবার শুলো না। দেয়ালে হেলান দিয়ে অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে রইল স্টেইনব্রেনারের দিকে—মাত্র বিশ বছর বয়েস ছেলেটার, অথচ অজস্র মানুষের রক্তে কালো হয়ে আছে ওর হাত। সব রক্ত সে ঝরিয়েছে বন্দী শিবিরের বীভৎস নির্জনতায়; এবং এর জন্যে গর্বও অনুভব করে সে।

ঘুম এল না গ্রেবারের। শুয়ে শুয়ে এপাশ-ওপাশ করতে লাগল শুধু। কানে আসছে কামানের গুমগুম আওয়াজ। ধীরে ধীরে যেন ছন্দোময় হয়ে উঠল শব্দটা। মনে হচ্ছে, ছোটবেলায় ফিরে গেছে ও।

পাশ ফিরল গ্রেবার। নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছে স্টেইনব্রেনার, রূপালি চাঁদের আলোয় ওর মুখটা কী আশ্চর্য নিষ্পাপ যে লাগছে!

মেঘলা আকাশ ছিঁড়ে অসামান্য একটা সকাল এল। আরও অশান্ত হয়ে উঠেছে সীমান্ত, ট্যাঙ্ক নেমেছে এবার। দক্ষিণ রণাঙ্গন থেকে সেনাবাহিনীকে পিছিয়ে আনা হয়েছে। বেশ ক'টা বিমান ধ্বংস হয়েছে রাতে। যোগাযোগব্যবস্থা পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন এখন।

দশটার সময় কমাণ্ডারের রুমে ডাক পড়ল গ্রেবারের। গির্জার সামনের দিকে তার অফিস এখন। পাশাপাশি দুটো ঘর, দুটো ঘরই মাটির নিচে—বেশ ঠাণ্ডা, অন্ধকার, আর স্যাঁতসেঁতে।

'এসো এসো,' গ্রেবার ঢুকতেই সাদরে ওকে অভ্যর্থনা জানাল রায়ে। কফির জল ফুটছে স্টোভে। রঙচটা একটা মগের ভেতরে চামচ নাড়তে নাড়তে জানাল সে, 'তোমার ছুটি তো মঞ্জুর হয়ে গেছে। খুব অবাক লাগছে, তাই না?'

'জী, স্যার।'

'আমারও।' কেতলি থেকে কিছুটা গরম জল মগে ঢেলে নিল রায়ে। 'কাগজপত্র সব অফিসেই আছে। এখুনি নিয়ে নাও ওগুলো; এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেরিয়ে পড়ো। কোন ফিরতি অ্যাম্বুলেন্স ধরতে পারলে সবচেয়ে ভাল।' একটু থামল সে। কফির কাপে ছোট্ট একটা চুমুক দিল। 'আশঙ্কা করছি, যে কোন মুহূর্তে সব ছুটি বাতিল হয়ে যেতে পারে। সুতরাং···'

নিঃশব্দে ঘরের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত কিছুক্ষণ পায়চারি করল রায়ে। হঠাৎ থেমে পড়ল গ্রেবারের সামনে। ওর কাঁধে হাত রেখে আন্তরিক গলায় বলল, 'তোমার জন্যে শুভেচ্ছা থাকল আমার। আর দেরি না করে বেরিয়ে পড়ো।'

বিদায় নিয়ে পাশের ঘরে গেল গ্রেবার। অফিসের লোকটা কাগজপত্র ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে হাসিহাসি মুখে বলল, 'একেই বলে কপাল! এই সময় মারা গেলেও তো ছুটি দেয় না!'

'কিন্তু দু'বছরের ভেতরে এটাই আমার প্রথম ছুটি।'

ছুটতে ছুটতে ক্যাম্পে ফিরল গ্রেবার। পাখির মত হালকা লাগছে মনটা। রায়ের কাছে যাবার সময় ধরেই নিয়েছিল, বাতিল হয়ে গেছে ছুটি।

ব্যস্ত হাতে জিনিসপত্র যা ছিল গুছিয়ে নিল ও। ছুটি পাবে না ভেবে আগে থেকে

কিছুই করেনি। আগের দিন কুড়িয়ে পাওয়া যিশুর সুন্দর মূর্তিটা ভাল করে রাখল ব্যাগে; মা-কে দেবে ওটা।

কাজ সেরে মুখ তুলতেই দেখল, সামনে হির্শলাণ্ড—হাতে এক টুকরো কাগজ।

'কি ব্যাপার?' ধড়াস করে উঠল ওর বুকের ভেতরে। ছুটিটা বাতিল হয়ে গেল না তো?

চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি বোলাল হির্শলাণ্ড। ঘরে আর কেউ নেই, তবু ফিসফিস করে বলল, 'দয়া করে এই ঠিকানায় যদি চিঠিটা পৌঁছে দাও, আর···,' ইতস্তত করল সে, 'আর তুমি যদি নিজে গিয়ে বাড়িতে বলো, আমি ভাল আছি, তাহলে···'

'কিন্তু তুমি তো নিজেই বাড়িতে চিঠি লিখতে পারো?'

ছলছল করে উঠল হির্শলাণ্ডের চোখদুটো। 'পারি, কিন্তু বাড়িতে চিঠির কথা বিশ্বাস করে না কেউ। মায়ের ধারণা, আমি ইহুদি বলে···' ব্যথায় গলার স্বর বুজে এল ওর। একটু থেমে চিঠিটা গ্রেবারের হাতে দিল। 'সহযোদ্ধা কারও কাছ থেকে চিঠি আর খবর পেলে কথাটা হয়তো বিশ্বাস করবে ওরা।'

'কোন চিন্তা করো না তুমি,' চিঠিটা ব্যাগে রাখল গ্রেবার, 'আমি নিজে দেখা করব ওঁদের সাথে।'

পকেট থেকে দু'প্যাকেট সিগারেট বের করল হির্শলাণ্ড। গ্রেবারের হাতে দিয়ে বলল, 'রাখো এগুলো।'

'কেন?'

'আমি সিগারেট খাই না। তোমার কাজে লাগবে। আর এখানকার অবস্থার কথা জানিও না বাড়িতে। বলো, ভাল আছি আমি।'

'ঠিক আছে। আর কিছু বলতে হবে?'

'না।' দ্রুত বেরিয়ে গেল হির্শলাণ্ড। দীর্ঘশ্বাস ফেলল গ্রেবার।

অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভারের পাশে কোনরকমে বসে আছে গ্রেবার। আহত সৈনিকে ভরা অ্যাম্বুলেন্সটা।

গ্রাম ঘুরে সোজা মাঠের ভেতরে নেমে গেছে রাস্তা। দু'পাশে ধু ধু প্রান্তর, মাঝখান দিয়ে এঁকেবেঁকে যাওয়া এই পথ, যেন মিশেছে দিগন্তে, মাঝে মাঝে খুঁটি পোঁতা—পথের নিশানা।

গির্জার সামনে লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছে সৈন্যরা।

'সীমান্তে পাঠানো হচ্ছে ওদের,' জানাল অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার। শক্ত হাতে স্টিয়ারিঙ ধরে আছে সে, গাড়ি ছুটছে ঝড়ের বেগে; তুষারে ঢাকা গর্তের কাছে এসে গতি কমাচ্ছে, গর্ত পার হয়েই যে-কে সে-ই। কতগুলো জীবন যে নির্ভর করছে স্টিয়ারিঙ ধরা হাত-দুটোর ওপর, ভাবতেই শিউরে উঠল গ্রেবার। কম্বলে ঢেকে নিল পা-দুটো। অসম্ভব খারাপ লাগছে ওর—নিঃসঙ্গ, হতাশ, অপরাধী। ওর সঙ্গীরা যখন ঝাঁপিয়ে পড়ছে মৃত্যুর মুখে ঠিক তখনই, নিঃশব্দে, দূরে সরে যাচ্ছে ও। এও তো এক ধরনের পালানোই; আত্মগ্লানিতে একেবারে এতটুকু হয়ে গেল গ্রেবার; নিজেকে বোঝাতে চাইল, কিন্তু তাই বা কেন হবে? এ ছুটি তো আমি অর্জন করেছি! তবু

www.BanglaBook.org

বিষণ্ণতা থেকে মুক্তি পেল না ও।

বেশ ক'টা গ্রাম পার হয়ে এল ওরা। আরও খানিকটা আসতেই চোখে পড়ল রাস্তার ধারে কাত হয়ে পড়ে আছে একটা অ্যাম্বুলেন্স—সামনের একটা চাকা একেবারে ডুবে গেছে তুষারে।

গাড়ি থামাল ড্রাইভার। 'কি ব্যাপার, কি হয়েছে?'

'অ্যাক্সেল ভেঙে গেছে।'

'একটু দেখে চালাবে তো,' বিরক্তি প্রকাশ করল ড্রাইভার। ওকে গাড়ির পেছনে ডেকে নিয়ে গেল গ্রেবার।

ওদের অ্যাম্বুলেন্সে দু'জন আহত সৈনিক মারা গেছে। লাশগুলো নামিয়ে রেখে অন্য অ্যাম্বুলেন্স থেকে তিনজনকে তোলা হলো ওদের গাড়িতে। সাথে সাথে চিৎকার শুরু করল অন্যরা। খোলা মাঠে, হাড় জমানো শীতে, বিনা চিকিৎসায় এভাবে পড়ে থাকা মৃত্যুরই নামান্তর। অনেক বলেকয়ে, স্টেশন থেকে গাড়ি পাঠানোর আশ্বাস দিয়ে তবে ছাড়া পেল ওরা।

'মাস দু'য়েক আগে আমারও একবার হয়েছিল এ অবস্থা,' অ্যাম্বুলেন্স চালাতে চালাতে জানাল ড্রাইভার, 'যখন গাড়ি ঠিক করলাম, দেখি স্ট্রেচারেই জমে গেছে দু'তিনজন। শেষ পর্যন্ত যখন পৌঁছুলাম, মাত্র দু'জন বেঁচে ছিল। এখনও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে কথাটা মনে পড়লে। শীতে রাশিয়ায় খোলা প্রান্তরে দাঁড়িয়ে আছি, ভাবলেই কলজে ঠাণ্ডা হয়ে আসে।'

অপরিসীম কৌতূহল আর বিস্ময়ে সামনে তাকিয়ে আছে গ্রেবার। কোন কথা নয়, শুধু দেখছে ও—ঘর-বাড়ির চিহ্ন মাত্র নেই কোথাও, কোনদিন ছিল কিনা বলার উপায় নেই; ওপরে স্তব্ধ নীল আকাশ, নিচে অন্তহীন শাদা প্রান্তর—ভয়ঙ্কর, হিংস্র, বিরান।

আবার বুকের ভেতরে জল জমল কান্নার; ঠিকই বুঝছে, পালিয়ে যাচ্ছে ও—এই নরক থেকে পালাচ্ছে, পালাচ্ছে এই তুষার ঢাকা পথ ধরে, দিগন্তের ওপারে, অন্য এক জীবনের লোভে। কিন্তু এ তো চায়নি ও। ও চেয়েছিল একটু নির্জনতা, শুধু নিজেকে আপন করে পাবার জন্যে এক টুকরো নিঃসঙ্গ নির্জনতা।

গর্তে পড়ে জোরেসোরে একটা ঝাঁকুনি খেলো অ্যাম্বুলেন্স। চমকে উঠল গ্রেবার। পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাল। খোলা প্যাকেটটা এগিয়ে ধরল ড্রাইভারের দিকে।

BanglaBook.org

পাঁচ

বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মাঝে ছোট্ট স্টেশন। বিধ্বস্ত দেয়ালের ওপর ত্রিপলের ছাউনি। মূল রেললাইন থেকে একটা শাখা এসে পৌঁছেছে স্টেশনে।

এক দিকে রাশিয়ান বন্দীদের রাখা। হাঁটুর ভেতরে মাথা গুঁজে বসে আছে অনেকে। অন্যদের বিষণ্ন, হতাশ দৃষ্টি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে মাতৃভূমি।

ছুটি পাওয়া বেশ ক'জন সৈনিক ঘুরছে স্টেশনে। ভীত সন্ত্রস্ত ওরা, মোটামুটি ভিড়ের মধ্যে থাকতে চেষ্টা করছে, যেন শেষ মুহূর্তে ছুটি বাতিল করে দিলেও ওদের খুঁজে না পায়।

হঠাৎ গুঞ্জন উঠল বাতাসে। চমকে উঠল গ্রেবার, পরক্ষণেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। গর্জনটা মাটি থেকে আসছে, এর মানে ধারেকাছে বিমান ঘাঁটি আছে কোথাও।

আস্তে আস্তে জোরাল হয়ে উঠল গর্জন। একটু পরেই দেখা গেল শিকারি বাজের মত একঝাঁক যুদ্ধ বিমান। মুগ্ধচোখে ওদিকে তাকিয়ে থাকল গ্রেবার।

'কাগজপত্র দেখি!' হঠাৎ বাজখাঁই আওয়াজে কলজেটা লাফ দিয়ে উঠল ওর। মাথা ঘোরাতেই দেখল, ফিটফাট পোশাক পরা দু'জন অফিসার। দেখেই বোঝা যায় এখনও যুদ্ধে যেতে হয়নি ওদের। তাড়াতাড়ি কাগজপত্র বের করে দিল ও।

গম্ভীর মুখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবকিছু পরীক্ষা করল ওরা।

'হুঁ, ঠিকই আছে,' কাগজগুলো ফেরত দিতে দিতে বলল একজন, 'বাড়ি ফেরার আগে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে নিও।'

খাবার পাত্র হাতে লাইনে দাঁড়াল গ্রেবার। শীতে হি হি করে কাঁপছে ও। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে খাবার মিলল—মাংস, শাকসব্জী আর আলুর সুপ; যেমন দেখতে, তেমনি পরিমাণেও। মুখে দিতেই চোখমুখ বিকৃত হয়ে উঠল ওর—জঘন্য স্বাদ, তবু চেটেপুটে খেয়ে নিল সবটুকু। আর কিছু না হোক, জিনিসটা গরম, রাশিয়ার এই তীব্র শীতে একটু উষ্ণতার চেয়ে বড় আর কিছু নেই।

সন্ধ্যা। নীলচে ইস্পাত থেকে মুছে গেছে রোদের গন্ধ। ট্রেন আসেনি এখনও। এর মধ্যে আরও দু'বার কাগজপত্র পরীক্ষা করে গেছে অফিসার দু'জন।

বেশ কিছু আহত সৈনিক এসে পৌঁছেছে স্টেশনে। আসার পথে মারা গেছে তিনজন। যারা ছুটিতে যাবে, আরও অস্থির হয়ে পড়েছে তারা। ট্রেন না ছাড়া পর্যন্ত কোন ভরসা নেই।

সন্ধ্যার অনেক পরে ট্রেন এল। সাথে সাথে যেন লাফিয়ে উঠল পুরো স্টেশন। হুড়মুড় করে ছুটল সবাই ট্রেনে চাপতে, দেখতে দেখতে ভরে গেল সবক'টা কামরা।

ঝকঝকে পরিষ্কার আকাশ—আলোয় ভরা, মায়াময় নক্ষত্র যেন পরম স্নেহে নেমে এসেছে নিচে। অপলক দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থাকল গ্রেবার। 'তাহলে সত্যিই বাড়ি যাচ্ছি!' ভাবল ও।

'ছুটিতে যাচ্ছ যারা, তারা নেমে এসো গাড়ি থেকে।' চিৎকারটা শুনেই হাত-পা অসাড় হয়ে গেল গ্রেবারের। মাথার ভেতরটা যেন শূন্য লাগছে, কিছু ভাবতে পারছে না ও। আবার শোনা গেল চিৎকারটা, 'ছুটিতে যাওয়া সৈনিকদের অন্য কামরায় উঠতে হবে।'

www.BanglaBook.org

বুক থেকে বিশাল পাথর যেন নেমে গেল ওদের। লাফিয়ে ট্রেন থেকে প্ল্যাটফর্মে নামল ওরা।

সেই অফিসার দু'জন এগিয়ে এল সামনে। শেষবারের মত পরীক্ষা করল সবাইকে, যে চিরকুটগুলো দিয়েছিল ফেরত নিল সেগুলো। ওদের জন্যে নির্দিষ্ট কামরাটা দেখিয়ে ফিরে গেল।

ওরা চলে যেতেই শুরু হয়ে গেল ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি—সবারই উদ্দেশ্য এক, ভাল জায়গাটা দখল করা। কোনরকমে ঠেলেঠুলে ভেতরে ঢুকল গ্রেবার। আগে থেকে বেশ ক'জন আহত সৈনিক রয়ে গেছে কামরায়। ওদের মাঝখানে জায়গা করে নিল ও। জানালার ধারে বসল না; জানে, যে কোন মুহূর্তে বোমার টুকরো এসে আঘাত করতে পারে।

কামরার ভেতরে অন্ধকার। তুষারে ঠিকরে পড়েছে স্বপ্নালু নক্ষত্রের আলো, সবার চোখেও।

থেমে আছে ট্রেন। বাইরে দু'জন এস. এস. সৈন্য গল্প করছে, মাঝেমাঝেই গড়িয়ে পড়ছে হাসিতে। ঘুমোনোর চেষ্টা করল গ্রেবার।

একটা ঝাঁকুনি খেলো ট্রেনটা। সারা ট্রেন থেকে শোনা গেল চাপা উল্লাসধ্বনি, সেই সাথে খটাস খটাস দরজা বন্ধ করার শব্দ।

দুটো স্ট্রেচার নামিয়ে নিয়ে গেল বাহকেরা—মারা গেছে আহত দু'জন সৈনিক। 'আর যদি কেউ না ওঠে,' ভাবল গ্রেবার, 'বেশ কিছুটা জায়গা পাওয়া যাবে তাহলে।' অন্যরাও প্রায় একই কথা ভাবছে।

হুইসল দিল ট্রেন, ছোট্ট একটা ঝাঁকুনি দিয়ে চলতে শুরু করল। সবাই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে প্ল্যাটফর্মের দিকে, যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না, ট্রেনটা ছাড়ল শেষ পর্যন্ত। প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা, এই বুঝি থেমে যায়।

স্টেশনে দাঁড়ানো সৈন্যরা করুণ চোখে তাকিয়ে আছে ট্রেনের দিকে। মনটা খারাপ হয়ে গেল গ্রেবারের। সেই অনুভূতিটা ফিরে এল আবার—পালিয়ে যাচ্ছে ও। ট্রেনের চাকা ঘুরছে, একটু একটু করে এগোচ্ছে বাড়ির দিকে, নতুন জীবনের দিকে; কিন্তু সেই জীবন কেমন, কিছুই জানা নেই ওর।

ভোর এসেছে। তুষার পড়ছে গুড়িগুড়ি। নিশ্চিহ্ন হয়ে আসা শহরের গা ঘেঁষে দাঁড়ানো ছোট্ট একটা স্টেশনে থেমেছে ট্রেনটা—নাশতার জন্যে কফি আর রুটি দেয়া হবে। সেজন্যে সবাই ভিড় জমিয়েছে জানালার পাশে। অতি উৎসাহী কয়েকজন নেমেই গেল প্ল্যাটফর্মে।

জায়গা ছেড়ে নড়ল না গ্রেবার। বেশ আরামেই বসে আছে ও। মিছিমিছি এত ভাল জায়গাটা হারাতে রাজি নয়। সুযোগমত একবার জানালা থেকে নাশতাটুকু নিয়ে ফিরে এল নিজের জায়গায়।

আরও কয়েকজন আহত সৈন্য মারা গেছে। মৃতদেহগুলো নামিয়ে নিয়ে গেল স্ট্রেচারবাহকেরা। হঠাৎ শোনা গেল কয়েকজনের উত্তেজিত গলা, মুহূর্তের মধ্যে সারা ট্রেনে ছড়িয়ে গেল খবরটা—যারা সামান্য আহত, তাদেরকে ট্রেন থেকে

নামিয়ে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সাথে সাথে আতঙ্কে শাদা হয়ে গেল আহত সৈনিকদের মুখগুলো। কোনরকমে বাথরুমে ঢুকে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল দু'জন। কয়েকজন খোঁড়াতে খোঁড়াতে উল্টোদিকের দরজা দিয়ে নেমে গেল নিচে।

'আমি বাড়ি যেতে চাই,' ছলছল করে উঠল গ্রেবারের সামনে বসা অল্পবয়েসী ছেলেটার চোখ। ওর মাথার ব্যাণ্ডেজ ভিজে উঠেছে রক্তে। 'আগেও দু'বার ওরা ফিল্ড হসপিটাল থেকে ফ্রন্টে পাঠিয়ে দিয়েছে আমাকে, বাড়িতে যেতে দেয়নি। আমি বাড়ি যাব।' বাচ্চা ছেলের আকুতির মত শোনাল ওর গলা।

খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল তিনজন লোক; একজন ফিল্ড সার্জন—বয়স্ক; অন্য দু'জন মিলিটারি পুলিস। কঠোর চোখে সবার ওপর নজর বোলাচ্ছে সার্জন। হঠাৎ ছোটখাট শুকনো চেহারার একজনের ওপর দৃষ্টি স্থির হলো তার; 'তুমি নামো!'

চওড়া ব্যাণ্ডেজ লোকটার কাঁধে, শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সামনে, যেন কোন কথাই কানে ঢোকেনি তার।

ধমকে উঠল একজন মিলিটারি পুলিস, 'ওঠো শিগগির। কথা কানে যাচ্ছে না?'

দাঁতে দাঁত চেপে বসে থাকল লোকটা। চোখের পাতা পর্যন্ত ফেলেনি একবারও।

অন্যজন এগিয়ে এল এবার। দু'জনে মিলে টেনেহিঁচড়ে নামিয়ে নিয়ে গেল তাকে।

অল্পবয়েসী ছেলেটার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সার্জন। ভয়ে চোখ মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে ছেলেটার।

'তোমার কোন ভয় নেই,' ওকে বোঝাচ্ছে সার্জন, 'ওরা শুধু ব্যাণ্ডেজটা বদলে দেবে তোমার।'

'না। আমি যাব না।' কান্নায় প্রায় বুজে এল ছেলেটার গলা। শুকনো লোকটাকে ওভাবে নামাতে দেখে থরথর করে কেঁপে উঠল সে। সার্জনের দিকে ফিরে কাঁপা কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হয়ে গেলে আবার ট্রেনে উঠতে পারব তো আমি?'

'আমার সাধ্যমত চেষ্টা করব তোমাকে ট্রেনে তুলে দিতে।'

নেমে গেল ছেলেটা। চোখের কোণে টলটল করছে অশ্রুবিন্দু। প্ল্যাটফর্মে নামতেই ঝরে পড়ল দু'ফোঁটা লোনা জল।

আবার ফিরে এসেছে মিলিটারি পুলিস দু'জন। বাথরুমের দরজাটা দেখিয়ে একজন আরেকজনকে বলল, 'নিশ্চয় ওর ভেতরে লুকিয়ে আছে কেউ। দাঁড়াও, দেখছি।' উঠে গিয়ে দরজা ধাক্কাতে শুরু করল সে।

দরজা খুলে বেরিয়ে এল একজন। কলার ধরে তাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল পুলিসটা।

'চলো,' কাজ শেষ করে উঠে দাঁড়াল সার্জন, 'যাওয়া যাক এবার।' শেষবারের মত সবার ওপরে চোখ বুলিয়ে নেমে গেল।

www.BanglaBook.org

ক্যাঁচক্যাঁচ করে পুরোপুরি খুলে গেল বাথরুমের দরজাটা। সন্তর্পণে উঁকি দিল ঘামে ভেজা একটা মুখ—আস্তে করে একজন ল্যান্স কর্পোরাল বেরিয়ে এল বাথরুম থেকে।

'যাক্ বাবা,' বিরাট একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে, 'হারামজাদারা গেছে!' পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছল। 'এতক্ষণ শুধু প্রার্থনা করছিলাম ঈশ্বরের কাছে।'

'কার জন্যে?' জিজ্ঞেস করল একজন।

'ওই ছেলেটার জন্যে, এখানে বসেছিল সে।' গ্রেবারের সামনের খালি জায়গাটা দেখাল ল্যান্স কর্পোরাল, 'কোথায় ও?'

'নেমে গেছে।'

আরও ঘণ্টাখানেক পরে ছাড়ল ট্রেন। যারা নেমে গিয়েছিল, তাদের কেউই ফিরে আসেনি আর।

দুপুরের দিকে ট্রেন থামল। কামরায় উঠল সামরিক পোশাক পরা একজন। জিজ্ঞেস করল, 'কেউ কামাতে চান?'

'মানে?'

'দাড়ি কামাবেন কেউ? খুব ভাল সাবান আছে, ফ্রান্সের তৈরি। মাত্র পঞ্চাশ ফেনিগ নেব কামাতে।'

চলতে শুরু করেছে ট্রেন। একজন জানতে চাইল, 'চলন্ত ট্রেনে আবার কামানো যায় নাকি?'

'কেন যাবে না? এই করে করেই তো হাত পাকালাম।'

'ঠিক আছে, শুরু করো তাহলে।'

বড় একটা কাগজ পেতে দক্ষ হাতে সাবান, ব্রাশ সব সাজিয়ে ফেলল লোকটা। হাতের তালুতে খসখস করে ক্ষুরটা ঘষল বারকয়েক। গালে সাবান লাগিয়ে দিতেই সারা কামরায় ছড়িয়ে পড়ল সুগন্ধ।

দেখা গেল, কাজ জানে লোকটা। অল্প সময়ের ভেতরেই চমৎকার শেভ করে দিল তিনজনের। চার নম্বরে গ্রেবার বসল। আহতদের কেউ কামাতে রাজি হলো না।

তাকিয়ে তাকিয়ে অন্য তিনজনকে দেখল গ্রেবার। একেবারে অন্যরকম লাগছে ওদের—কেমন যেন অচেনা, অর্ধেক সৈনিক, অর্ধেক বাড়িতে থাকা সুখী মানুষের মত।

ওর গালে সাবান লাগাল লোকটা। ক্ষুরের প্রতিটা টানের সাথে সাথে শরীরটা যেন অসম্ভব নরম আর হালকা হয়ে গেল গ্রেবারের।

সন্ধ্যা নামছে সীমাহীন প্রান্তরে। দিগন্তে সোনালি আগুন ঢেলেছে সূর্য, সবুজ পাতায় সূর্যের শেষ বিকেলের ভালবাসা।

জার্মানীতে ঢুকল ট্রেন। বড় একটা স্টেশনে ট্রেন থামতেই প্রায় খালি হয়ে গেল কামরাগুলো। যুদ্ধফেরতা সব সৈনিকের ওপর হুকুম হলো গোসলখানায় যাবার।

জলীয় বাষ্পে কিছুই প্রায় দেখা যায় না ভেতরে। কার্বলিক সাবানের গন্ধে ভারী হয়ে আছে বাতাস। বহুদিন পরে গরম জলে প্রাণভরে স্নান করল গ্রেবার। ঘরের আরামদায়ক উষ্ণতায় আপনা থেকেই দু'চোখ মুদে এল ওর, কান পেতে শুনতে লাগল অন্যদের কথাবার্তা।

'আমার বউয়ের একটা ছেলে হয়েছে,' জানাল বের্নহার্ট; ট্রেনে তার সাথে পরিচয় হয়েছে গ্রেবারের। 'দু'বছর বাড়ি যাই না, অথচ বাচ্চার বয়েস এখন চার মাস; বউ অবশ্য লিখেছে চোদ্দ মাস।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। 'ও আমার জন্যে অপেক্ষা করতে পারত!'

'হয়তো পারত,' টাকমাথা একজন জবাব দিল তার কথার, 'কিন্তু ভুলে যাবেন না, এটা যুদ্ধ—সব দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে এখন; তাছাড়া বছরের পর বছর বাড়ি ফিরবেন না আপনি, তার পরেও সবকিছু আগের মত আশা করবেন, সেটা বোধ হয় ঠিক হবে না। এক কাজ করুন, ছেলেটাকে সরকারী কোন প্রতিষ্ঠানে দিয়ে দিন; বড় হয়ে পিতৃভূমির জন্যে যুদ্ধ করবে।'

এসব আলোচনা আর ভাল লাগছে না গ্রেবারের। গা মুছে জামাকাপড় পরে বেরিয়ে এল খোলা বাতাসে; শ্বাস নিল বুক ভরে, ঠাণ্ডা বাতাসে জুড়িয়ে গেল বুকটা।

একটু পরেই অন্য সবাই এল। সবাইকে দাঁড় করানো হলো লাইনে। উচ্চপদস্থ একজন সামরিক অফিসার ভাষণ দিল ওদের উদ্দেশে; ভাষণের মূল কথা—ফুয়েরার সবকিছু জানেন এবং বোঝেন, যুদ্ধে ওঁর অবস্থা বেশ ভাল, তবে যুদ্ধ সম্পর্কিত যে কোন ধরনের আলোচনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, নির্দেশ অমান্যকারীর একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। গেস্টাপোর গুপ্তচর ছড়িয়ে আছে সব জায়গায়, সুতরাং সাবধান!

ফুয়েরারের প্রীতি-উপহার হিসেবে সবাইকে খাবারের একটা প্যাকেট দেয়া হলো। উদ্দেশ্য, পরিবারের লোকদের বোঝানো, সৈনিকরা ভাল আছে, ফুয়েরার সবার দিকেই নজর রেখেছেন। বার বার সাবধান করে দেয়া হলো, রাস্তায় পরীক্ষা করা হবে, সুতরাং খাবারগুলো যেন কেউ খেয়ে না ফেলে। ভাষণ শেষ হলো 'হাইল হিটলার' দিয়ে।

বুক টানটান করে দাঁড়াল সবাই। প্রতিমুহূর্তে আশঙ্কা করছে গ্রেবার, থার্ড রাইখের বিখ্যাত সঙ্গীত বাজানো হবে। কিন্তু তার বদলে হুকুম হলো, 'যারা রাইনল্যাণ্ডে যাচ্ছেন, সামনে এগিয়ে আসুন।'

সামান্য ক'জন এগোল সামনে।

'রাইনল্যাণ্ডে যাওয়া নিষিদ্ধ এখন। অন্য কোথায় যেতে চান বলুন সবাই।' আপনি বলুন।' হালকা-পাতলা একজনের দিকে এগোল অফিসার।

'কলয়নে,' শুকনো মুখে উত্তর দিল সৈনিকটা, 'ওখানেই আমার সবকিছু।'

'বললাম তো রাইনল্যাণ্ডে ঢোকা নিষেধ। অন্য কোথায় যেতে চান বলুন।'

'অন্য আর কোথায় যাব?' সরল চোখে সামনে তাকিয়ে আছে সৈনিকটা। 'কলয়নে আমার বউ, ছেলেমেয়ে সবাই আছে।'

'পাগল,' মাথা নাড়ল অফিসার। একজন ক্যাপ্টেন এসে তার কানে কানে কি

www.BanglaBook.org

য়েন বলল। সব শুনে মাথা নাড়ল সে। 'যারা হ্যামবুর্গ আর আলজাসে যাবেন, সামনে এগিয়ে আসুন।'

কেউ এগোল না সামনে।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল অফিসার। তারপর বলল, 'রাইনল্যাণ্ডের সৈন্যরা ছাড়া বাকিরা যেতে পারেন।'

ফিরে এল ওরা। একটু পরে এল বাকিরাও। এক নিমেষে যেন বয়েস দশ বছর বেড়ে গেছে ওদের—শীর্ণ, হতাশ, দুঃখময় মানুষ সব। হঠাৎ কথাটা মনে পড়তেই মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে অসম্ভব হিমেল একটা স্রোত বয়ে গেল গ্রেবারের, সড়সড় করে ঘাড়ের ওপরের চুলগুলো খাড়া হয়ে গেল ওর—কলয়নে ঢুকতে দিচ্ছে না কাউকে, এর অর্থ বেরোতেও পারছে না কেউ, তার মানে কলয়নে থাকা তাঁদের পরিবারের সাথে দেখা হবে না লোকগুলোর!

হতভাগ্য সৈনিকদের দিকে চোখ ফেরাল গ্রেবার, সমস্ত হৃদয় দিয়ে দেখল ওদের। দীর্ঘ সংগ্রামের পরেও বুকের ভেতরে ছিল তিল তিল করে জমিয়ে রাখা ভালবাসা, ছিল নিবিড় উষ্ণতা আর শান্তির প্রত্যাশা। সেই আশাতেই ওরা যুদ্ধ করেছে, মুখোমুখি হয়েছে মৃত্যুর, মনের সেই শক্তিকে এক নিমেষে কেড়ে নিয়েছে কেউ। বুক খালি করে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ওর বুক চিরে।

হুইসল দিল ট্রেন, ঝাঁকুনি দিয়ে চলতে শুরু করল।

রাত নেমেছে বাইরে—পিচ্ছিল, কান্নাভরা, শীতার্ত রাত। ট্রেনের ছন্দোময় শব্দ, শুনল গ্রেবার, বলছে—এই তো ছুটি, এই তো আমার ছুটি।

আমার ছুটি এই?

BanglaBook.org

ছয়

ভোর হলো—বিষণ্ন ভোর। বাইরে সম্পূর্ণ বদলে গেছে প্রকৃতি—কুয়াশা নেই, ঝলমল করছে সকালের সোনাঝরা রোদ।

জানালার ধারে এসে বসেছে গ্রেবার; কাচের ভেতর দিয়ে তাকিয়ে আছে দূরে বহুদূরে, প্রাণ ভরে দেখছে সব।

ঢেউ খেলানো ফসলের মাঠ, হাওয়ায় হাওয়ায় বুনো, উদ্দাম; দিগন্তে ছুঁয়েছে সবুজ কার্পেট—কী নরম, কী স্নেহময়! অল্প অল্প তুষার জমে আছে কোথাও কোথাও। কী অসম্ভব শান্ত যে লাগছে। গোলার গর্জন নেই, ক্ষতচিহ্ন নেই, ট্রেঞ্চ নেই। এ সবই ওর কত পরিচিত, কত আপন, অথচ কত দূরের।

জানালা দিয়ে গ্রাম এল একটা। সকালের সোনা রোদ এসে পড়েছে গির্জার চূড়ায়, খেলনা মোরগটা নাচছে বাতাসের সাথে, স্নিগ্ধ মমতা আর নিবিড় স্নেহমাখা ছায়াময় সবুজ গাছ, একেবেঁকে চলে যাওয়া মেঠো পথ মিশেছে দিগন্তে। ছোট ছোট সরাইখানার সামনে সাধারণ মানুষের ভিড়, বাড়িতে কাজ করছে মেয়েরা, কয়েকটা

শিশু ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এল বাইরে।

শক্ত করে জানালার ফ্রেম চেপে ধরল গ্রেবার, কতদিন যে শিশুদের দেখেনি ও; আজ দু'চোখ ভরে দেখছে এই দেবশিশুদের, এই মাঠ, এই প্রকৃতি আর এই মানুষগুলোকে—এর জন্যেই তো এতদিন প্রতীক্ষা করে ছিল।

দিগন্তপারের অরুণ্যরেখা স্পষ্ট হলো ধীরে ধীরে, ছোট্ট মিষ্টি পাখিটা শিস দিয়ে উড়ে গেল দূরে। দু'চোখ ঝাপসা হয়ে এল গ্রেবারের, অসহ্য কষ্ট কেঁপে কেঁপে উঠছে বুকের ভেতরে—যুদ্ধের স্মৃতি, সহযোদ্ধাদের কথা যেন আর মনেই পড়ে না ওর।

ব্যাগ থেকে রুটি বের করেছে অনেকে। কফির তেষ্টা পেল গ্রেবারের। সাথে সাথে বাড়ির খাবার ঘরের ছবিটা ফুটে উঠল ওর চোখের সামনে—শাদা-নীল ডোরাকাটা কাপড়ে ঢাকা টেবিল, ওপরে মায়ের হাতে সাজানো কফির সরঞ্জাম, প্লেটে মাখন লাগানো রুটি; খাঁচায় রাখা পাখিটা দেখছে ওদের, জানালায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে ওকে গোলাপ আর জিরেনিয়াম। বাতাসে যেন ওদের সুগন্ধ পেল গ্রেবার, লম্বা করে শ্বাস টানল, মনে পড়ল, ল্যাভেণ্ডার পাতা হাতে ঘষে ঘষে রস বের করে নাকের কাছে ধরত ও, অপূর্ব সুগন্ধে আপনা থেকেই মুদে আসত দু'চোখের পাতা, আর স্বপ্ন দেখত, পাখি হয়ে গেছে ও—উড়ে যাচ্ছে কত নাম না জানা দূর দেশে। আজ অবধি কত দেশ দেখেছে; কিন্তু সেই স্বপ্নের দেশের দেখা আজও পায়নি ও।

জানালা দিয়ে বের্নহার্টকে হাত নাড়তে দেখে বাইরে তাকাল গ্রেবার। মাঠে কাজ করছে মেয়েরা, একবার মাথা তুলে ওদের দেখে আবার কাজে মনোযোগ দিল ওরা।

'আশ্চর্য,' কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে গেছে বের্নহার্ট, 'কেউ দেখতে পেল না হাত নাড়া?'

মুচকি হাসল টাকমাথা লোকটা। 'অন্য সব কামরা আহত সৈনিকে ভর্তি, আর তারা সবাই শুয়ে।'

'কিন্তু আমি তো মেয়েদের দিকে হাত নাড়লাম,' হতাশ গলায় বলল বের্নহার্ট। 'অথচ ওদের জন্যেই যুদ্ধে জীবন দিচ্ছি আমরা!'

'ওদের জন্যে লড়াই করছি না আমরা,' গম্ভীরভাবে জানাল টাকমাথা, 'ওরা যুদ্ধবন্দী, জোর করে খাটানো হচ্ছে ওদের।'

ছায়া মেলতে শুরু করেছে বিকেল—দীর্ঘ ছায়া। পাকা আঙুরের মত রোদ, মিষ্টি মদির আমেজ মাখা।

দুটো স্টেশন পেরোল। আরও হেলে পড়েছে সূর্য, রঙের পসরা সাজিয়ে বসেছে গোধূলি।

ধীরে ধীরে পরিচিত হয়ে উঠছে চারপাশের দৃশ্য, আর গ্রেবারের বুকের ভেতর ছলকে উঠছে রক্ত। বিশেষ কোন গাছ নয়, মানুষ নয়, পাহাড়ও নয়, একসাথে কথা বলে উঠল প্রকৃতি—এই তো আমি, তোমার কত পরিচিত, কত কাছের! কোথায় তুমি?

অতীত স্মৃতি ঝাঁপিয়ে এল গ্রেবারের মনে, স্বপ্নময় হয়ে উঠল এই গোধূলি আলোয়; দু'চোখ প্লাবিত করে নামল অশ্রুর বন্যা।

একটা স্টেশনে থামল গাড়ি। নামটা দেখেই চমকে উঠল গ্রেবার, এই পরের স্টেশনেই নামতে হবে ওকে। তাড়াতাড়ি জিনিসপত্র গুছিয়ে নিল ও। জানালা দিয়ে ভেসে এল এক ঝলক মিষ্টি গন্ধ।

পরের স্টেশনে গাড়ি থামতেই হুড়মুড় করে নেমে গেল অনেকে। জানালা দিয়ে মুখ বাড়াল গ্রেবার। পরিচিত নয় জায়গাটা। স্টেশনের নামফলকের আশায় এদিক-ওদিক তাকাল, কিচ্ছু চোখে পড়ল না। তাড়াতাড়ি দরজার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল একজনকে, 'এটা ভার্ডেন নাকি?'

ওর দিকে ফিরেও তাকাল না লোকটা। আরও কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করেও উত্তর পেল না গ্রেবার। যেন কারও সময়ই নেই ওর কথা শোনার। কি করবে ভাবছে, এমন সময় স্টেশন মাস্টারকে আসতে দেখল। চেঁচিয়ে বলে যাচ্ছে সে, 'ভার্ডেনের যাত্রীরা নেমে পড়ুন সবাই।'

মালপত্র নিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে পড়ল গ্রেবার। বুঝল, স্টেশন সরিয়ে নেয়া হয়েছে আগের জায়গা থেকে। একজনকে জিজ্ঞেস করে জানল, স্টেশনের বাইরে বাস আছে, ভার্ডেন যাবে।

সীটে বসে স্টিয়ারিঙের ওপর দু'পা তুলে সিগারেট ফুঁকছে ড্রাইভার।

'বাস কি ভার্ডেন যাবে?' জিজ্ঞেস করল গ্রেবার।

'হুঁ,' চোখ বন্ধ করেই উত্তর দিল ড্রাইভার। ভুশ করে ধোঁয়া ছাড়ল ছাতে।

বাসে উঠে কোণের দিকে একটা সীটে বসে পড়ল গ্রেবার, বাইরে তাকাল—পার্কের কোণ ঘুরে যাওয়া চওড়া রাজপথে অনেক লোকের নিঃশব্দ মিছিল; হিংস্র দানবের চোখের মত জ্বলছে কারও কারও সিগারেটের আগুন।

একটু পরেই ছেড়ে দিল বাস। জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখার চেষ্টা করল গ্রেবার, অন্ধকারে সুবিধে হলো না, তবে নিশ্চিত হলো ও, রাস্তাগুলো এখনও মসৃণ।

একটা মোড় ঘুরে থামল বাস। স্টার্ট বন্ধ করে নেমে গেল ড্রাইভার।

'কি হলো?' লোকজনকে দাঁড়াতে দেখে পাশের জনকে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল গ্রেবার।

'এসে গেছি তো! এটাই শেষ স্টপেজ।'

'বলেন কি? কোথায় এলাম তাহলে?'

'রামশেস্ট্রাসে। যাবেন কোথায় আপনি?'

'হাকেনস্ট্রাসে, আঠারো নম্বর।'

'সে তো বেশ দূরে। এক কাজ করুন,' হাত তুলে একটা রাস্তা দেখাল লোকটা, 'এদিক দিয়ে সোজা চলে যান। একেবারে শেষ মাথায় গিয়ে নিজেই চিনতে পারবেন।'

ধন্যবাদ জানিয়ে বাস থেকে নেমে এল গ্রেবার।

চারপাশে জমাট অন্ধকার। তারাভরা আকাশ, নক্ষত্রের ম্লান আলোয় অস্পষ্ট

www.BanglaBook.org

দেখা যাচ্ছে বাড়িঘরের অবয়ব; রাস্তাঘাটে লোক নেই—পুরোপুরি ভুতুড়ে শহর একটা। গা-টা কেমন শিরশির করে উঠল গ্রেবারের।

বেশ কিছুটা এগোনোর পরে হঠাৎ থামল ও। একটা দোকান দেখে চিনতে পেরেছে; ঘোড়ার সাজসরঞ্জাম বিক্রি হত ওখানে। দোকানের সামনে ঘাড় বাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা খড়ের ঘোড়া—হঠাৎ দেখলে মনে হয়, জীবন্ত। ছেলেবেলায় স্কুল পালিয়ে বহুবার এখানে এসে দাঁড়িয়ে থেকেছে ও। এখনও ঘোড়াটা আছে দেখে অবাক হলো, দ্রুত পা চালাল বাড়ির দিকে।

জুতোজোড়া বদলে গরম জলে স্নান করতে হবে, ভাবল গ্রেবার। পরিষ্কার হালকা পোশাকে ওকে কেমন লাগবে দেখতে, ভেবে হাসি পেল ওর। হঠাৎ ধোঁয়ার পোড়া পোড়া গন্ধ নাকে যেতেই থমকে দাঁড়াল। নাক কুঁচকে বারকয়েক শ্বাস নিল লম্বা করে—ইঁট-কাঠ পোড়া গন্ধ। এপাশ-ওপাশ তাকাল গন্ধের উৎসের খোঁজে, না পেয়ে এগোল সামনে।

রাস্তাটা বাঁক নিয়েছে একটা পার্কের সামনে এসে। ফুলে ফুলে ভরে আছে পার্কটা। এখানে আসতেই জোরাল হয়ে উঠল গন্ধ। এখন মনে হচ্ছে, চারপাশ থেকেই আসছে গন্ধটা, যেন কেউ ছড়িয়ে দিয়েছে আকাশ থেকে।

একটা তেমাথায় আসতেই ভাঙা বাড়িটা চোখে পড়ল গ্রেবারের। ধড়াস করে উঠল ওর বুকের মধ্যে। হতভম্বের মত শুধু তাকিয়ে রইল সামনে। জীবনের গত কয়েক'টা বছর শুধু মৃত্যু ধ্বংসই দেখেছে, কিন্তু সেটা যুদ্ধক্ষেত্রে। এখানেও একই দৃশ্য দেখবে কল্পনা করতে পারেনি ও। অপলক দৃষ্টিতে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে রইল গ্রেবার, যেন জীবনে এই প্রথম দেখছে ভাঙা বাড়ি।

অনেক অনেকক্ষণ পরে চমক ভাঙল ওর। মস্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এক মুঠো বালি তুলে নাকের কাছে ধরল, কোন গন্ধ নেই, অর্থাৎ বেশ কিছুদিন আগে ধ্বংস হয়েছে বাড়িটা। কোন দুর্ঘটনা হয়তো, কিংবা কে জানে, ফিরতি পথে শেষ বোমাটা শুধু শুধু বয়ে না নিয়ে নামিয়ে দিয়ে গেছে হয়তো শত্রু-বিমান।

দ্রুত পা চালাল গ্রেবার—হাকেনস্ট্রাসে এখনও আধঘণ্টার রাস্তা। পথে কোন লোকজন চোখে পড়ল না। রাস্তার মোড়ে ঢাকনা দেয়া টিমটিমে বাতিতে আরও ভয়ঙ্কর লাগছে পুরো পরিবেশ। গা-টা ছমছম করে উঠল ওর।

প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেলো গ্রেবার। পা দুটো যেন পেরেক দিয়ে কেউ গেঁথে দিল মাটিতে, অবিশ্বাসে হাঁ হয়ে গেল মুখ। সামনে, যতদূর দৃষ্টি যায়, ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা; বোঝাই যায় না, এককালে বাড়ি ছিল ওগুলো। ভিতসুদ্ধ উপড়ে গেছে কোনটার, শুধু পেছনের দেয়াল দাঁড়িয়ে আছে কোন বাড়ির—ভাঙা রেলিং, বাঁকানো শিক, পাথরের গায়ে পড়ে আছে সাপের মত। একপাশে ইঁট-কাঠের স্তূপ দেখে বোঝা গেল, বেশ ক'দিন আগে ধ্বংস হয়েছে বাড়িটা।

হঠাৎ মনে হলো গ্রেবারের, গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে কয়েকটা ঘন কালো ছায়া। আঁতকে উঠল ও। কিছুটা ভয়ার্ত গলায় জানতে চাইল, 'কে ওখানে?' উত্তর এল না কোন।

কানের কাছে ভারী নিঃশ্বাস ফেলল কেউ। শিউরে উঠে পাঁই করে পেছনে

www.BanglaBook.org

ফিরল গ্রেবার। কেউ নেই। একটু খেয়াল করতেই বুঝল, ওটা ওর নিজেরই নিঃশ্বাসের শব্দ। দূরে, দেয়াল থেকে ঝুর ঝুর করে চুনবালি খসে পড়তেই সাহসটুকু উবে গেল ওর। খিচে দৌড় দিল সামনে।

বাতাসে বেড়ে গেছে পোড়া গন্ধ। ধ্বংস এখানে আরও বীভৎস, আরও নগ্ন। আহত বিস্ময়ে পুরানো শহরটাকে দেখল গ্রেবার—মধ্যযুগীয় বাড়ি, উজ্জ্বল দেয়ালে উপকথার চরিত্র—সব স্মৃতিমাত্র; বাস্তব শুধু ধিকিধিকি জ্বলা ধ্বংসস্তূপ, কুয়াশাভেজা জমাট অন্ধকার, হতাশা, বেদনা, ঘৃণা।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তেই মাথার ভেতরে ঝিমঝিম করে উঠল গ্রেবারের, শরীর আর বশে রইল না। নিজেও জানে না, কি করে দাঁড়িয়ে রইল। ওদের বাড়ির পাশেই ছিল একটা তামার কারখানা। ও নিশ্চিত, ওটাই ছিল শত্রু বিমানের লক্ষ্যস্থল। তার মানে···, আর ভাবতে পারল না গ্রেবার, আহত জন্তুর মত টলতে টলতে এগোল সামনে।

একসময় থামল ও। অসহায়ভাবে শুধু চারপাশে তাকাল; কিছু চিনতে পারছে না—না বাড়িটা, না আশপাশের কোন দৃশ্য। অথচ কী আশ্চর্য, এই শহরে, শহরের এই পথে শৈশব আর কৈশোর কেটেছে ওর, কিন্তু কখনও তো মনে হয়নি এই রাস্তা এত নির্জন, সামনের বাড়িটা এত একলা, এত দূরে, বাইরে, যেন সব মানুষের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। যেখানে থাকবার কথা সেখানেই আছে, তবু অনুপস্থিত।

রাস্তার ধারে একটু বসল গ্রেবার। কতক্ষণ বসে ছিল বলতে পারবে না, কাউকে আসতে দেখে লাফিয়ে উঠল। কাছে আসতেই বুঝল বুড়ো মানুষ একজন।

'হাকেনস্ট্রাসেটা কোনদিকে?' ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞেস করল গ্রেবার।

আঁতকে উঠে মুখ দিয়ে অস্ফুট আওয়াজ করল বুড়ো, ঘুরে দাঁড়িয়ে ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ওর দিকে। তারপর মুখ খুলল, 'কি বললে?'

'হাকেনস্ট্রাসেটা কোন দিকে?' হাঁপাচ্ছে গ্রেবার।

'ওই যে, সামনে গিয়ে ডানদিকে···'

'ওই যে, সামনে গিয়ে ডানদিকে···'

পুরোটা শোনার মত ধৈর্য নেই গ্রেবারের, ছুটল ও। ডানদিকে মোড় নিতেই চোখে পড়ল আধগোড়া বিশাল গাছ—রিক্ত, নিঃস্ব, জীর্ণ, শুধু দাঁড়িয়ে আছে মানুষের নীচতা আর মহাকালের চিহ্ন নিয়ে; ছোট ছোট ডালগুলোকে, অন্ধকারে গ্রেবারের মনে হলো, প্রতিবাদমুখর মুষ্টিবদ্ধ হাত।

একটু থামল ও, দৃষ্টি প্রসারিত হলো দিগন্তে। এখানে দাঁড়ালে স্পষ্ট দেখা যেত ক্যাথেরীনেনকির্শে গির্জার চুড়োটা—এখন নেই। মনটা অসম্ভব শান্ত লাগছে গ্রেবারের, যেন সবকিছু মেনে নিয়েছে। সামনে এগোল ও। ধোঁয়া উঠছে, উঠছে আগুনের লালচে আভা, লোকজন ছুটোছুটি করছে—কেউ স্ট্রেচার নিয়ে, কেউ পানির বালতি নিয়ে। সেই কারখানাটা এতক্ষণে চোখে পড়ল গ্রেবারের, এখনও ধিকিধিকি জ্বলছে। রাস্তার ওপাশে নিজের বাড়িটা চিনতে পারল গ্রেবার।

সাত

রাস্তার ঠিক মাঝখানে বিশাল গর্ত, ধ্বংসস্তূপের আবর্জনা দিয়ে আধাআধি বোজানো। গর্তের ওপর শুয়ে আছে একটা বাঁকানো ল্যাম্পপোস্ট।

সাবধানে গর্তটা পার হয়ে বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল গ্রেবার। বুকের ভেতরে ওর ছলকে উঠল রক্ত, কাঁপা কাঁপা আঙুল রাখল দরজায়। আঠারো নম্বর বাড়ি, শুধু এ বাড়িটাই অক্ষত আছে তাহলে!

ক্যাঁচক্যাঁচ করে খুলে গেল দরজাটা। ভেতরে ঢুকল ও, হতাশায় মরে যেতে ইচ্ছে করল। অক্ষত সামনের দেয়ালের এপাশে যেন সীমাহীন ধ্বংসের স্মৃতিসৌধ। বাড়ি বলতে আর কিছুই নেই—দোমড়ানো মোচড়ানো শিক আর কড়িবরগা, মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা ঢাকনাবিহীন পিয়ানো, সব যেন দাঁত বের করে হাসছে।

নিঃশব্দে, বিষ-কাঁটা বুকে নিয়ে সামনে পা বাড়াল গ্রেবার।

'সাবধানে!' ভরাট গলা শোনা গেল কারও, 'কোথায় যাবে?'

কথা বলল না গ্রেবার, একটা ঘোরের মধ্যে আছে ও, সবকিছু এখন অবাস্তব মনে হচ্ছে ওর কাছে। এটাই ওদের বাড়ি তো, আঠারো নম্বর? যুদ্ধক্ষেত্রে বাড়ি, ওর শহরের অলিগলির ছবি বাস্তবের চেয়েও নিখুঁতভাবে ফুটে উঠত ওর মনে, অথচ আজ বাড়ির রাস্তাটাও মনে করতে পারছে না!

'প্রাণটা খোয়াতে না চাইলে আর এগিয়ো না।' আবার শোনা গেল সেই অদৃশ্য কণ্ঠস্বর। ঘাড় ফেরাল গ্রেবার। কোণের দিক থেকে নড়েচড়ে উঠল একটা ছায়া, কাছে এল—একজন এয়াররেইড ওয়ার্ডেন।

'এটা কি আঠারো নম্বর?' জিজ্ঞেস করতে গিয়ে গলাটা কেঁপে গেল গ্রেবারের।

'হয়তো ছিল,' হো হো করে হাসল ওয়ার্ডেন, 'এখন আর কোন নম্বর নেই।'

'আঠারো নম্বর হাকেনস্ট্রাসে খুঁজছি আমি,' ব্যাকুল হয়ে বলল গ্রেবার, 'আমার বাবা-মা থাকতেন ওখানে।'

'হাকেনস্ট্রাসে কেউ থাকে না এখন।' পাগলের মত হেসে উঠল লোকটা। একদিন আমিও অবশ্য থাকতাম। কিন্তু দশদিনে ছ'বার বোমাবৃষ্টি হলে সেখানে জ্যান্ত মানুষ থাকে কি করে, বলো?' গলাটা একটু ভারী হয়ে এল ওয়ার্ডেনের। একটা ভগ্নস্তূপের দিকে আঙুল তুলল সে, 'ওখানে আমার বউটা চাপা পড়ে আছে আজ ক'দিন হলো, এখনও তোলার সময় পায়নি কেউ। আরও নাকি জরুরী কাজ করছে ওরা।' কলজে কাঁপানো হাসি হাসল ওয়ার্ডেন। 'আপনার আঠারো নম্বর ওইটা,' আঙুল তুলে দেখাল সামনে, 'খোঁড়াখুঁড়ি হচ্ছে।'

গ্রেবারের মনে হলো, স্বপ্ন দেখছে ও—এটা যুদ্ধ বিধ্বস্ত রাশিয়া, ওর জার্মানী অক্ষত। একটু পরেই স্বপ্ন ভাঙবে ওর, সব ঠিক হয়ে যাবে তখন।

নিশিতে পাওয়া লোকের মত অসম্ভব ধীর পায়ে এগোল গ্রেবার। বাতাসে

www.BanglaBook.org

শাবল, বেলচার ঠং ঠং শব্দ; রাস্তায় থইথই করছে জল আর কাদা, অস্পষ্ট আলোয় থিরথির করে কাঁপছে পানির স্রোত।

ঢিবির ওপর দাঁড়িয়ে লম্বামত একটা লোক চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে নির্দেশ দিচ্ছে সবাইকে, মাঝে মাঝেই ধমকে উঠছে। লোকটাকে দেখেই ছুটে গেল গ্রেবার, 'এটা কি আঠারো নম্বর?'

'জানি না,' ঝাঁঝিয়ে উঠল লোকটা, 'এখন ঝামেলা করবেন না, অন্যদিকে যান।' হঠাৎ শ্রমিকদের দিকে ফিরে চিৎকার করে উঠল, 'উঁহু, উঁহু, থামো! ওভাবে নয়।'

কাজ থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল লোকগুলো। খেয়াল করল গ্রেবার, ধ্বংসস্তূপের ভেতরে একটা পাইপ বসাচ্ছে ওরা।

গাঢ় অন্ধকার। হঠাৎ করে শব্দ বন্ধ হওয়ায় নিস্তব্ধতা অসম্ভব জোরাল হয়ে বাজল কানে; মাথার ভেতর ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল গ্রেবারের।

ঢিবি থেকে নেমে গিয়ে পাইপে কান লাগাল লোকটা। গভীর মনোযোগের সাথে শুনতে চেষ্টা করল কি যেন। অনেকক্ষণ পর সোজা হয়ে মুখ খুলল, 'নিঃশ্বাস আর গোঙানি এখনও শোনা যাচ্ছে, তবে আগের চেয়ে অনেক আস্তে। মনে হচ্ছে, বাতাস ফুরিয়ে গেছে প্রায়। এক কাজ করো,' এক জায়গায় আঙুল দিয়ে দেখাল সে, 'এখানে আরেকটা পাইপ বসাও।'

অবাক বিস্ময়ে ওদের কাজকর্ম দেখছিল গ্রেবার, এতক্ষণে বুঝল, ব্যাপারটা কি। সেলারে আটকা পড়েছে কেউ।

কাঁধ থেকে ব্যাগটা নামাল ও। এগিয়ে গেল লম্বা লোকটার দিকে। 'আমি সৈনিক, ছুটিতে এসেছি। আমিও সাহায্য করতে পারব আপনাদের।' উত্তরের অপেক্ষা না করেই ঝাঁপিয়ে পড়ল কাজে।

ভারী লোহার বীমে পা দুটো থেঁতলে গেছে লোকটার, তবে বেঁচে আছে, এবং, হয়তো দুর্ভাগ্য লোকটার, পুরোপুরি জ্ঞান রয়ে গেছে তার। লোকটার মুখের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল গ্রেবার, চিনতে না পেরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। ধরাধরি করে লোকটাকে স্ট্রেচারে তুলে দিল ওরা। আস্তে করে দু'চোখের পাতা বন্ধ হয়ে গেল লোকটার।

সেলারের দরজার সামনে পাওয়া গেল দু'জনকে—মাথার জায়গায় কালো চুলের অরণ্যে রক্ত-মাংস-মগজের স্তূপ, আবছা আলোয় চিকচিক করছে দু'সারি শাদা দাঁত। বুকের ওপর থেকে পাষাণ-ভার নেমে গেল গ্রেবারের—ওর বাবা-মা দুজনেরই চুল পাকা।

চাঁদ উঠেছে আকাশে, ম্লান জ্যোৎস্নায় ঝরে ঝরে পড়ছে কান্নার মত কুয়াশা; কালচে নীল আকাশে নক্ষত্রের মেলা।

'কখন আক্রমণ হয়েছিল?' একটু ফাঁক পেতেই পাশের লোকটাকে জিজ্ঞেস করল গ্রেবার।

'কাল রাতে।'

হঠাৎ নিজের কনুইয়ের দিকে নজর পড়ল গ্রেবারের—শুকিয়ে কালচে হয়ে আছে ক্ষীণ একটা রক্তের ধারা। বুঝল না, কাটল কখন!

চোখ দিয়ে টপটপ করে জল ঝরছে ওর—ধ্বংসস্তূপের ভেতরে জমে থাকা ধোঁয়া আর গ্যাস চোখে যাওয়ার ফল। জামার হাতায় চোখ মুছে আবার হাত লাগাল কাজে।

'তুমি সৈনিক না?' চেঁচিয়ে উঠল কে যেন।

'হ্যাঁ,' মাথা তুলল গ্রেবার। 'কেন?'

'ওখানে যে ব্যাগটা ছিল সেটা তোমার?'

'হ্যাঁ।'

'শিগগির দৌড় দাও,' সামনের দিকে দেখাল লোকটা, 'ওই যে, ব্যাগ নিয়ে পালাচ্ছে!'

খিঁচে দৌড় দিল গ্রেবার। একটা ঢিবির প্রায় আড়ালে চলে গেছে লোকটা, ধরে ফেলল ও। হ্যাঁচকা টানে লোকটার হাত থেকে ছিনিয়ে নিল ব্যাগ। জামার কলার চেপে ধরে ওর দিকে ফেরাল লোকটাকে।

বিবর্ণ চাঁদের আলোয় জ্বলজ্বল করে উঠল একজন বুড়োর শীর্ণ, কঙ্কালসার চেহারা। হাঁপাচ্ছে বুড়ো—উস্কখুস্ক চুল, ধূলিমলিন পোশাক; স্থির অকম্পিত চোখে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

'পাগল নাকি রে বাবা,' বিড়বিড় করল গ্রেবার। লোকটাকে ছেড়ে দিয়ে রাস্তায় উঠে এল।

ব্রেকের তীব্র আর্তনাদে একেবারে চমকে উঠল ও। ঘ্যাঁচ করে ওর সামনে এসে থামল জীপটা। লাফ দিয়ে দু'জন এস. এস. অফিসার নামল জীপ থেকে। কড়া গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কি করা হচ্ছে এখানে?'

'কিছু না,' বলল গ্রেবার, 'খোঁড়াখুঁড়ির কাজে সাহায্য করছি, সেই সাথে বাবা-মা আর নিজেদের বাড়িটা খুঁজছি।'

'কাগজপত্র দেখি,' আরও কঠিন হলো অফিসারের গলা।

অন্ধকারেও জ্বলে উঠল গ্রেবারের চোখজোড়া। দাঁতে দাঁত পিষল। জানে, ফ্রন্টের সৈনিকদের জেরা করার অধিকার নেই এস.এস. অফিসারদের। তবু ঝামেলার মধ্যে গেল না ও। ব্যাগ থেকে ছুটির কাগজপত্র বের করে অফিসারের হাতে দিল।

টর্চ জ্বালল অফিসার, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করতে লাগল কাগজগুলো। এত সময় লাগাল যে, গ্রেবারের মনে হলো, টর্চের আলোয় কাগজগুলো বোধহয় পুড়িয়ে ফেলার প্রতিজ্ঞা করেছে ব্যাটা।

'আঠারো নম্বর হাকেনস্ট্রাসে থাকতেন তাহলে?' টর্চ নিবিয়ে প্রশ্ন করল অফিসার।

'হ্যাঁ,' ঝাঁঝাল গলায় উত্তর দিল গ্রেবার, 'এতক্ষণ সেখানেই 'উদ্ধারকাজ চালাচ্ছিলাম। আপনারা না···'

'ওটা আঠারো নম্বর নয়,' বাধা দিল অফিসার।

www.BanglaBook.org

'কি?' ভূত দেখার মত চমকে উঠল গ্রেবার।

'ওটা আঠারো নয়, বাইশ। আঠারো এটা।' ইশারায় জায়গাটা দেখাল সে।

ভাঙা, ছিন্নভিন্ন পিয়ানোওয়ালা বাড়িটার ঠিক পাশেই জায়গাটা—অন্ধকার, বিধ্বস্ত। বুকের ভেতর ছ্যাঁৎ করে উঠল গ্রেবারের। কেন যেন দোমড়ানো মোচড়ানো পিয়ানোর ছবিটা ভেসে উঠল ওর মনে—ঠিক যেন বীভৎস প্রাগৈতিহাসিক কোন জন্তু, গুড়ি মেরে এগিয়ে আসছে ঝাঁপিয়ে পড়ার আশায়।

ব্যাকুল হয়ে উঠল গ্রেবার, 'আপনি ঠিক জানেন?'

'অবশ্যই।' কাগজগুলো ফিরিয়ে দিল অফিসার।

'আচ্ছা, কবে আক্রমণ হয়েছিল? কেউ বেঁচে আছে নাকি জানেন?'

'দিন সাত-আট আগে বোমা পড়েছে ওখানে। কেউ বেঁচে গেছে কিনা বলতে পারব না। তবে সবসময়ই কেউ না কেউ বেঁচে যায়। আর অত চিন্তা করছেন কেন? আপনার বাবা-মা হয়তো তখন বাড়িতেই ছিলেন না!'

'কেন?'

'বিমান আক্রমণের আগে সাইরেন বাজানো হয়, সবাই তখন আশ্রয় নেয় কাছের এয়ার-রেড শেল্টারে।'

'ওদের কোথায় খুঁজে পাওয়া যেতে পারে?' কিছুটা আশ্বস্ত হলো গ্রেবার।

'এত রাতে কোথাও পাবেন না, চেষ্টা করে লাভ নেই। রাতটা রেডক্রসের তাঁবুতে কাটিয়ে কাল সকালে আঞ্চলিক অফিসে গিয়ে খোঁজ নেবেন।'

'আচ্ছা,' জিজ্ঞেস করতে গিয়ে গলাটা কেঁপে গেল গ্রেবারের, 'বাড়িটার নিচে এখনও চাপা পড়ে আছে নাকি কেউ?'

'অসম্ভব কি,' নির্বিকার গলায় বলল অফিসার, 'ওপরেই এত লাশ পড়ে আছে যে, শুধু সেগুলোর ব্যবস্থা করতে গেলেই একশো গুণ বেশি লোক লাগবে। বোমা পড়তে তো আর বাকি নেই কোথাও!'

একসময়ের আঠারো নম্বর বাড়িতে এল গ্রেবার। বাড়িটা ওদের ছিল, ভাবতেই থরথর করে কেঁপে উঠল ও।

ধ্বংসস্তূপ কিছুটা পরিষ্কার করে একপাশে জড়ো করে রাখা হয়েছে ইঁটবালি। ভেতরে ঢোকার মত কোন ফাঁক-ফোকর নেই। ঢিবির ওপরে উঠে এল গ্রেবার। ঢিবির ঠিক মাঝখানে শেষ হয়েছে দোতলার সিঁড়ি, ল্যাণ্ডিংয়ে ধুলোবালিভরা চেয়ার একটা, যেন কেউ রেখে গিয়েছে কারও প্রতীক্ষায়। বাড়ির পেছনের দেয়ালটা সোজা শুয়ে পড়েছে ওদের ফুলবাগানের ওপর। ওখানে কিছু একটা নড়ে উঠতেই বুকটা ধড়াস করে উঠল গ্রেবারের। ভাল করে চাইতেই দেখল, একটা বেড়াল। হঠাৎ করে অসম্ভব ক্রোধে আর হতাশায় বুকের ভেতরটা জ্বলে উঠল ওর। একটা ঢিল তুলে প্রাণপণে ছুঁড়ল বেড়ালটাকে তাক করে, লাগল না জায়গামত। লাফ দিয়ে অন্ধকারে মিশে গেল ধকধকে চোখজোড়ার মালিক।

বাগানের পেছনে আধখানা গাছ, নিচে ভাঙাচোরা একটা দোলনা। হু হু করে উঠল গ্রেবারের বুকের ভেতরে—এটা ওদেরই বাড়ি, ওই দোলনায় ছোটবেলায় কত

দোল খেয়েছে ও! ছোটবেলার অসংখ্য স্মৃতি একসাথে ঝাঁপিয়ে এল ওর মনে। নষ্ট আলোয় চোখের কোলদুটো চিকচিক করে উঠল ওর। আধ-খাওয়া চাঁদের অপার্থিব জ্যোৎস্না, এই বিধ্বস্ত প্রাচীন নগরী, ভাঙা দোলনা, কী অবাস্তব, কী অদ্ভুত! কে জানে, হয়তো সবই স্বপ্ন!

কি মনে করে লোহার বীমে ইঁটের টুকরো দিয়ে ঘা মেরে কান খাঁড়া করল গ্রেবার। হঠাৎ মনে হলো চাপা গোঙানির মত কিছু শোনা গেল। মনের ভুল, ভাবল ও, কিন্তু আবার শোনা গেল শব্দটা। পাগলের মত সিঁড়ির দিকে ছুটল ও। পায়ের নিচে নরম তুলতুলে কি যেন পড়তেই 'ক্যাঁ' করে শব্দ হলো; তিন লাফে ছুটে পালাল বেড়ালটা।

সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে আবার কান পাতল গ্রেবার, ঠিক তখনই দৃশ্যটা মনে এল ওর। সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে দিয়ে গেল দৃশ্যটা, সড়সড় করে দাঁড়িয়ে গেল ঘাড়ের ওপরের চুলগুলো—ওর বাবা-মা চাপা পড়ে আছে ঠিক ওর পায়ের কাছে, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওপরে, ওর দিকে, তাদের আর্তনাদ যেন ভাসছে বাতাসে।

দু'হাতে মাথা চেপে ধরে ছুটল গ্রেবার, হাঁপাতে হাঁপাতে পৌঁছুল উদ্ধারকারী লোকগুলোর কাছে। সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে ওর, পরস্পরের সাথে বাড়ি খাচ্ছে হাঁটু।

'শিগগির চলুন ওদিকে,' কোনরকমে কথাগুলো গলা দিয়ে বেরোল ওর, 'এটা আঠারো নম্বর নয়, আঠারো নম্বর ওদিকে।'

'দেখুন,' শান্ত গলায় ওকে বোঝানোর চেষ্টা করল লম্বা লোকটা, 'ও বাড়িতে বোমা পড়েছে আজ পাঁচ-ছ'দিন হলো। কেউ চাপা পড়ে থাকলেও এতদিন বেঁচে থাকতে পারে না। আর কেউ বেঁচে থাকলে খবর পেতাম আমরা। তাছাড়া এখন এখানকার কাজ বন্ধ করলে মারা যাবে কয়েকজন। আপনি কি তাই চান?'

চুপ করে থাকল গ্রেবার। উত্তর দেবার মত কিছু নেই ওর। কথাটা সত্যি, ও জানে। অন্যের বেলায় হলে নিজেও ঠিক এ কথাটাই বলত। কিন্তু মন যে মানে না! মনে হয়, হয়তো এখনও বেঁচে আছে কেউ, ধ্বংসস্তূপ সরালে এখনও বাঁচানো যায় তাকে।

ঝাপসা, শূন্য দৃষ্টিতে সামনে তাকিয়ে রইল গ্রেবার। চোখের সামনে অসংখ্য তারা জ্বলে উঠছে, নড়াচড়া করছে অনেকগুলো ছায়ামূর্তি, বিষণ্ন আলোর নিচে কাঁপা কাঁপা জলের স্রোত। ভেবেছিল, সারাক্ষণ উদ্ধারকারী দলের সাথে কাজ করে যাবে, কিন্তু ওদের বাড়ি নয় এটা, জানতেই যেন শরীরের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে ওর, অসম্ভব দুর্বল লাগছে।

কয়েক ঘণ্টার অপরিসীম ক্লান্তি নিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে আঠারো নম্বর ধ্বংসস্তূপে ফিরে এল গ্রেবার, এসেই ধুলোবালির ওপর টানটান শুয়ে পড়ল। চোখ ফেটে জল এল ওর, বুকের মধ্যে কেঁপে কেঁপে উঠছে। বিড়বিড় করছে ও, 'মা, মাগো, জানি না, কোথায় তুমি! হয়তো ওদের কথাই ঠিক, বোমা পড়ার সময় বাড়িতে ছিলে না তুমি, হয়তো কোন নিরাপদ আশ্রয়ে ঘুমোচ্ছ এখন। মাগো, একবার দেখে যাও শুধু,

www.BanglaBook.org

তোমার আদরের ছেলেটা তোমার জন্যে কাঁদছে।'

অনেক অনেকক্ষণ পরে আস্তে করে উঠে দাঁড়াল ও। ধীরে ধীরে সিঁড়ির ওপরে গিয়ে বসল।

অসম্ভব শান্ত রাত, সীমাহীন নীল চাদরে ফুটে আছে আধখানা চাঁদ, ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় প্লাবিত ভুতুড়ে শহর। ভাবছে গ্রেবার, জীবনে তো অনেক মৃত্যু, অনেক ধ্বংস দেখেছে, কিন্তু হৃদয় দিয়ে কি এর আগে অনুভব করেছে সে ধ্বংসের বিভীষিকা? এর আগে কি কখনও বুঝেছে, বোমার আঘাতে প্রথমেই ধ্বংস হয় নিজের হৃদয়?

মায়াবী জ্যোৎস্নায় পান্নার মত সবুজ দুটো চোখ এগিয়ে এল গ্রেবারের কাছে, পায়ের কাছে ঘুরঘুর করল কিছুক্ষণ, 'ম্যাও' করে আস্তে ডাক ছাড়ল একবার; সাহস পেয়ে পিঠ বেঁকিয়ে, ল্যাজ ঘুরিয়ে ওর পায়ের সাথে শরীর ঘষল—আরামে গলা দিয়ে ঘড়ঘড় শব্দ করল বেড়ালটা। এসবের কিছুই টের পেল না গ্রেবার।

আট

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল, জানে না গ্রেবার, বোধহয় সকালের দিকে। ঝকঝকে সোনালি আলোয় ঘুম ভাঙল ওর। প্রথমে ঠাহর করতে পারল না, কোথায় ও, শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আকাশের অসীম নীলে। হঠাৎ একসাথে সবকিছু মনে পড়ে গেল ওর। এক ঝটকায় উঠে বসল, দেখল, একটু দূরে নিশ্চিন্তে থাবা চাটছে বেড়ালটা।

ঘড়ি দেখল গ্রেবার, প্রায় সাতটা। এত সকালে আঞ্চলিক অফিস খোলেনি।

আড়মোড়া ভাঙতে গিয়ে মুখচোখ বিকৃত হয়ে গেল ওর; সারা শরীরে অসহ্য ব্যথা, হাতদুটো নোংরা খসখসে। এদিক ওদিক তাকাল ও। কিছুটা দূরে বড়সড় ভাঙা একটা গামলা দেখে এগোল সেদিকে, কাছে গিয়ে খুশি হয়ে উঠল—পরিষ্কার টলটলে জল গামলায়। বৃষ্টি হয়নি এদিকে, নিশ্চয়ই দমকলের জল!

গামলায় উঁকি দিয়েই থমকে উঠল গ্রেবার, জলের ভেতরে কে ও? উস্কখুস্ক চুল, গিজগিজে দাড়ি, চোখদুটো লাল। কী আশ্চর্য! ওই লোকটা সে নিজেই।

ব্যাগ থেকে একটুকরো সাবান বের করে গা হাত-পা যতটা সম্ভব পরিষ্কার করল গ্রেবার। অসম্ভব খিদে পেয়েছে ওর, সেই সাথে তেষ্টা—গলার ভেতরটা শুকিয়ে একেবারে কাঠ। ব্যাগ থেকে রুটি বের করে চিবোতে শুরু করল। বেড়ালটা লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেখে একটুকরো ছুঁড়ে দিল ওর দিকে। খাওয়া শেষ করে রাস্তায় নেমে এল গ্রেবার।

যাচ্ছে, আর বারবার থমকে দাঁড়াচ্ছে ও। ধ্বংসের নির্মমতা, বীভৎসতা আরও নগ্ন এখানে—ক্যাথেড্রালনেনকির্শের গির্জার সবুজ চূড়াটা অদৃশ্য, মাটির সাথে মিশে গেছে হাকেনস্ট্রাসে, ওর এতদিনের স্বপ্ন-জড়ানো সে শহর চিরদিনের জন্যেই

হারিয়ে গেছে। এ যেন রাশিয়ারই বিধ্বস্ত কোন নগরী। একমাত্র অক্ষত বাড়ি বলে যেটাকে ভেবেছিল গ্রেবার, তার সামনে এসে আরেকবার থমকে দাঁড়াল। সামনে থেকে দেখে বোঝাই যায় না, পেছনে কিছু নেই।

'এখনও বাবা-মাকে খুঁজছ নাকি?' বিদঘুটে ভঙ্গিতে হাসতে হাসতে এগিয়ে এল গত রাতের সেই এয়ার-রেইড ওয়ার্ডেন। 'ভাবছ, তুমি একাই বোধ হয় বাবা-মাকে হারিয়েছ, আর কেউ হারায়নি? ওই দেখো!'

লোকটার কথায় এতক্ষণে দরজার পাল্লার ওপরে চোখ পড়ল গ্রেবারের। দেখল, অসংখ্য ছোট ছোট কাগজের টুকরো সাঁটা দরজায়—তাতে কালি, কয়লা, ইঁটের টুকরো দিয়ে লেখা হারানো মানুষের নাম-ঠিকানা। সাথে সাথে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল ও, আঁতিপাতি করে খুঁজল ওর বাবা-মার নাম। নেই ওর কাঙ্ক্ষিত নামগুলো। হৃদয়ের গভীর থেকে ঠেলে উঠল একটা দীর্ঘশ্বাস, দূরে হারাল ওর বিষাদময় দৃষ্টি।

'পাওনি তাই না?' খিকখিক করে হাসল ওয়ার্ডেন। 'তুমিও বরং তোমার নাম-ঠিকানা লিখে রেখে যাও। একদিন দেখো, ঠিক উত্তর আসবে।'

এক টুকরো কাগজের আশায় এদিক-ওদিক তাকাল গ্রেবার। আর কিছু না পেয়ে ভাঙা ফ্রেমে আটকানো হিটলারের রঙিন ছবি থেকে খানিকটা ছিঁড়ে নিল। কাগজের পেছন দিকটা শাদা। পেনসিল বের করে কিছুক্ষণ ভাবল, কী লিখবে! শেষ পর্যন্ত লিখল: 'পল আর মেরী গ্রেবারের খবর জানতে চাই। আমি ছুটিতে আছি—আর্নস্ট গ্রেবার।'

'ফুয়েরারের ছবিটা ছিঁড়ে ফেললে?' হাসি হাসি মুখে জানতে চাইল ওয়ার্ডেন।

'ওটা অনেক আগে থেকেই ছেঁড়া,' শীতল গলায় জানাল গ্রেবার। এপাশ-ওপাশ তাকাচ্ছে; ভেবে পাচ্ছে না, কি দিয়ে আটকাবে চিঠিটা। শেষে চারটে পিন দিয়ে আটকানো একটা চিঠি থেকে দুটো পিন খুলে নিল। কাজটা অন্যায় মনে হলো ওর, কিন্তু কিছুই করার নেই এখন। চিঠিটা পিন দিয়ে আটকে দিল দরজায়।

'বাহ্, চমৎকার হয়েছে,' মন্তব্য করল ওয়ার্ডেন, 'অনেকের বিয়ের কার্ডও এত সুন্দর হয় না!'

কি মনে করে ছবি থেকে আরও খানিকটা কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে দরজা থেকে লুসিদের ঠিকানাটা টুকে রাখল গ্রেবার। ওদের চেনে ও, ওখানে চিঠি লিখে বাবা-মার খবর জানার চেষ্টা করবে। হঠাৎ করে বুদ্ধিটা মাথায় আসতেই ছবির বাকি অংশটুকু নিয়ে আঠারো নম্বরে ফিরে এল। বাবা-মার খোঁজ জানতে চেয়ে আরেকটা চিঠি লিখে পাথর চাপা দিয়ে রাখল কাগজটা। এখন রাস্তা দিয়ে যেই যাক, চোখে পড়বে চিঠিটা।

ফিরছে গ্রেবার। বুকটা অনেক হালকা লাগছে ওর; মনে হচ্ছে, সব শেষ হয়ে যায়নি; এখনও আশা আছে—আছে ভালবাসা, উষ্ণতা।

রাস্তার পাশে আধপোড়া গাছ; তবু, মনে হলো গ্রেবারের, বাকলের কঠোর বৈরাগ্য বিদীর্ণ করে উথলে উঠেছে হাজার হাজার কচি পাতা, ফুটে উঠেছে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল; প্রাণপণে ঘোষণা করছে, এখনও বেঁচে আছি, বেঁচে থাকার চেষ্টা করছি,

www.BanglaBook.org

করে যাব।

ডালে ডালে তুমুল ঝগড়া শুরু করেছে ক'টা সবুজ-সোনালি পাখি।

আঞ্চলিক অফিসে নিখোঁজ লোকদের জন্য আলাদা বিভাগই খোলা হয়েছে। কাউন্টারের পেছনে দু'জন মেয়ে আর একজন সৈনিক দাঁড়িয়ে, সামনে লাইনে দাঁড়ানো অসংখ্য লোক। এতজনকে সামলাতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে মেয়েদুটো।

লাইনের একেবারে শেষে দাঁড়াল গ্রেবার। শামুকের মত এগোচ্ছে লাইন, বহুক্ষণ পর কাউন্টারে পৌঁছুল ও।

'নাম?' জিজ্ঞেস করল সুন্দরমত মেয়েটা।

'গ্রেবার, পল আর মেরী গ্রেবার। আঠারো নম্বর হাকেনস্ট্রাসে।'

'কি বললেন?' গলা চড়াল মেয়েটা, 'জোরে বলুন।'

'গ্রেবার,' গলার স্বর কয়েক পর্দা ওপরে তুলল গ্রেবার। বাইরের ফিসফিস, গুনগুন শব্দে প্রায় শোনাই যাচ্ছে না কথা।

নামের তালিকার ওপর দিয়ে আঙুল বোলাতে শুরু করল মেয়েটা। এক জায়গায় এসে হঠাৎ থেমে গেল আঙুল। 'গ্রেবার, পাওয়া গেছে একটা, আর্নস্ট গ্রেবার।'

'ওটা তো আমার নাম,' প্রায় খেপে উঠল গ্রেবার।

'নাহ্, গ্রেবার নামের আর কেউ নেই,' তালিকাটা দেখা শেষ করে জানাল মেয়েটা।

হতাশ হয়ে কাউন্টার থেকে সরে আসবে, কথা বলে উঠল সৈনিকটা, 'আপনার খুশি হওয়া উচিত হের গ্রেবার, নামগুলো নেই বলে। এটা নিহত কিংবা মারাত্মকভাবে আহতদের তালিকা। এক কাজ করুন; রেজিস্ট্রি অফিসে যান, ওখানে কোন খোঁজ-খবর পেতে পারেন।'

বেরিয়ে এল গ্রেবার। বিষণ্ন দৃষ্টিতে তাকাল আকাশের দিকে। রোদ ঝলমলে দিনটাকে হঠাৎ করে বড্ড বিবর্ণ, বড্ড স্যাঁতসেঁতে লাগল ওর কাছে।

টাউন হলের একেবারে শেষ প্রান্তে রেজিস্ট্রি অফিসটা—পোড়া কাঠ আর বারুদের গন্ধে ভরা। পুরো একঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে তবে কাউন্টারের নাগাল পেল গ্রেবার।

ফ্যাকাসে চেহারার এক বুড়ি বসে আছে কাউন্টারে—প্যাঁকাটির মত শরীর, নাকের ডগায় কায়দা করে বসানো চশমা, মেজাজটা সারাক্ষণ চড়েই আছে। দেখেই মেজাজটা খিঁচড়ে গেল গ্রেবারের। কিছু জিজ্ঞেস করবে কি করবে না ভাবছে, একেবারে চালু হয়ে গেল মেশিনগান। হড়হড় করে যা বলল বুড়ি, তার সার কথা হলো, কাগজপত্র বেশির ভাগই পুড়ে অথবা নষ্ট হয়ে গেছে, সুতরাং কারও খোঁজ না পাবারই সম্ভাবনা ষোলো আনা।

শুধু পণ্ডশ্রমই হলো এতক্ষণ, বুঝতেই রাগে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত জ্বলে উঠল গ্রেবারের। কিছু বলার জন্যে মুখ খোলার আগেই পেছনে থেকে ওর কাঁধে হাত রাখল একজন। ঘুরে তাকাল গ্রেবার—একজন সৈনিক দাঁড়িয়ে।

'চলুন, বাইরে যাই,' বলল সৈনিকটা, 'যতসব আহাম্মকের দল এসে জুটেছে এখানে!'

বাইরে বেরিয়ে এল দু'জন। টাউন হলের সামনের দিকটা উড়ে গেছে, বাগানের অর্ধেকটা নেই। শুধু ধ্বংস আর ধ্বংস, আর কত? বিসমার্কের মূর্তির শুধু পা দুটো আছে, মারীনকির্শের ভাঙা চুড়োর চারপাশে শাদা শাদা পায়রার উচ্ছল ছুটোছুটি।

'কাকে খুঁজছেন আপনি?' জানতে চাইল সৈনিকটা।

'বাবা-মাকে। আপনি?'

'আমার স্ত্রীকে। কি বলব,' আপসোস করল সে, 'আগে থেকে কিছু জানাইনি, অবাক করে দেব বলে, এখন···।'

'আমারও একই অবস্থা। আগেও বারকয়েক ছুটি পেয়েছি, কিন্তু বাতিল হয়ে গেছে শেষ মুহূর্তে সব। তাই এবারে আর চিঠি লিখিনি। কী যে হবে এখন!'

হাঁটতে হাঁটতে মার্কেট স্কোয়্যারে এল ওরা। জায়গাটার নাম কাইজার প্লাটসের বদলে হিটলার প্লাটস রাখা হয়েছে এখন।

'এতগুলো লোক শহর থেকে,' আপন মনেই বলে যাচ্ছে লোকটা, 'একেবারে উধাও হয়ে গেল কি করে? গত পাঁচটা দিন এক নাগাড়ে আমার স্ত্রীকে খুঁজছি আমি, অথচ কোন হদিস পর্যন্ত পেলাম না!'

'গ্রামগুলো তো নিরাপদ এখনও,' নরম গলায় বলল গ্রেবার, 'কাছাকাছি কোন গ্রামে···'

'গ্রাম তো আর এক আধটা নয়,' বাধা দিল সৈনিকটা, 'সবক'টা গ্রাম খুঁজতে গেলে বার-বিশেক ছুটি নিতে হবে।'

কথাটা যে কতখানি সত্যি, হাড়ে হাড়ে বুঝছে গ্রেবার। এভাবে খুঁজে আসলে লাভ নেই। এখন ওর মনে হচ্ছে, ওর বাবা-মা বেঁচে থাকলেই সুখী ও।

'আচ্ছা,' হঠাৎ সৈনিকটা ফিরল ওর দিকে, 'এক কাজ করি আমরা। আপনি যেখানে যাবেন, আমার স্ত্রীর খোঁজটাও করবেন, আমি করব আপনার বাবা-মারটাও।'

'খুব ভাল হয় তাহলে,' সাথে সাথে সম্মতি দিল গ্রেবার।

'আমার নাম ব্যোটশার। আমার বউয়ের নাম আলমা ব্যোটশার।'

নামদুটো লিখে নিয়ে নিজের বাবা-মার নাম লিখে ব্যোটশারকে দিল গ্রেবার।

'উঠেছেন কোথায়?' জিজ্ঞেস করল ব্যোটশার।

'কোথাও না। কোথায় ওঠা যাবে, সেটাই ভাবছি।'

ভাবাভাবির কিছু নেই, সোজা ক্যাম্পে চলে যান। আমাদের মত ছুটিতে আসা সৈনিকদের জন্যে ওখানেই ব্যবস্থা করা আছে। প্রথমে কমাণ্ড্যান্ট অফিসে গিয়ে অনুমতিপত্র জোগাড় করবেন, চেষ্টা করবেন আটচল্লিশ নম্বরে থাকার অনুমতি নিতে। অসুস্থ সৈনিকদের জায়গা ওটা—ঝামেলা নেই, চমৎকার খাওয়া-দাওয়া। ওখানেই উঠেছি আমি।'

পকেট থেকে দুটো সিগারেট বের করল ব্যোটশার। নিজে একটা ধরিয়ে অন্যটা গ্রেবারকে দিল। সিগারেটে কষে টান দিয়ে একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বলল,

'আজকে গোটা হাসপাতালে খবর নেব। সন্ধ্যার পরে দু'জনে দেখা করি, কি বলেন?'

'সেটাই ভাল হয়।'

'তাহলে এখানে, ঠিক ন'টার সময়। যে আগে আসবে সে অন্যজনের জন্যে অপেক্ষা করবে।'

গার্টেনস্ট্রাসের প্রথম দুটো বাড়ি একেবারে মিশে গেছে মাটির সাথে। আশ্চর্যজনকভাবে প্রায় অক্ষত রয়ে গেছে তৃতীয় বাড়িটা। সীগলাররা থাকত এ বাড়িতে—গ্রেবারদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল ওদের।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে ঘণ্টা বাজাল গ্রেবার। ভেতরে টুংটাং শব্দ হতেই অবাক হয়ে গেল, সীগলাররা এখনও আছে তাহলে! দরজা খোলার অপেক্ষায় অস্থির হয়ে উঠল ও।

ছাল ওঠা ক্ষতবিক্ষত দেয়াল, নিচের দিকে কারও আঁকিবুঁকি, সময় কাটাতে সেদিকে তাকিয়ে রইল গ্রেবার। হঠাৎ দরজা খোলার শব্দে চমকে উঠল।

এক বৃদ্ধার শীর্ণ অবয়ব দেখা গেল দরজার ফাঁকে—সন্ত্রস্ত, ভীত, বিষণ্ন।

মিষ্টি করে হাসল গ্রেবার, 'আপনি নিশ্চয়ই ফ্রাউ সীগলার?'

'হ্যাঁ।' ভয়ের ছাপ পড়ল বৃদ্ধার চোখেমুখে।

'আমি আর্নস্ট গ্রেবার। আমাকে বোধ হয় চিনতে পারেননি আপনি।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল বৃদ্ধা। 'চিনেছি এবার, এসো, ভেতরে এসো।' দরজা খুলে ধরল সে।

ঘরে ঢুকল গ্রেবার। ভেতর থেকে ভারী গলায় কে যেন জিজ্ঞেস করল, 'কে এল?'

'পলের ছেলে,' চেঁচিয়ে জবাব দিল বৃদ্ধা, 'আর্নস্ট।' গ্রেবারকে বলল, 'যাও, বাবা, ভেতরে গিয়ে বসো।'

বেশ বড়োসড়ো ড্রইংরুম, ঝকঝকে মসৃণ মেঝেতে বাহারি নকশা কাটা, সোফার পাশে টবে মানিপ্ল্যান্টের ঝাড়, জানালায় ঝোলানো সুন্দর পর্দা। নিজের অজান্তেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল গ্রেবার।

দরজার পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকল হের সীগলার।—শাদা ধবধবে চুল, ঠোঁটের কোণে সস্নেহ একটুকরো হাসি। 'তোমাকে আবার দেখতে পাব, ভাবতেই পারিনি। সোজা ফ্রন্ট থেকে আসছ?'

'হ্যাঁ, ছুটিতে এসেছি। এসে আর বাবা-মার খোঁজ পাচ্ছি না। আপনি···'

'এ কি, দাঁড়িয়ে কেন?' ঘরে ঢুকল ফ্রাউ সীগলার। এক ফাঁকে ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিল সে। 'বসো, বসো। আমি কফি নিয়ে আসছি তোমার জন্যে।'

ব্যাগটা নামিয়ে রাখল গ্রেবার। অস্বস্তিমাখা গলায় বলল, 'জামাকাপড়ের যে অবস্থা, সোফাগুলো নোংরা হবে শুধু শুধু।'

'সে জন্যে ভেব না, আরাম করে বসো তো আগে!' বলে রান্নাঘরে চলে গেল ফ্রাউ সীগলার।

www.BanglaBook.org

'বাবা-মার কথা কিছু জানেন?' সীগলারের দিকে ফিরল গ্রেবার, 'কোন খোঁজ পেলাম না ওঁদের। কেউ কিছু বলতে পারছে না।'

'পাঁচ ছ' মাস আগে ওঁদের সাথে শেষ দেখা হয়েছিল আমার।'

'তখন কেমন ছিলেন ওঁরা?' উৎকণ্ঠায় সামনে ঝুঁকে পড়ল গ্রেবার।

'কেন? ভালই তো!'

'ফ্রন্টে থাকার সময়ই শুনেছিলাম, আমাদের শহরেও বোমা পড়েছে। কিন্তু অবস্থা যে এতটা খারাপ, কল্পনাও করতে পারিনি।'

ফ্রাউ সীগলার কফি নিয়ে এল, সাথে বিস্কুট। কিচ্ছু খেতে ইচ্ছে করছে না এখন, তবু কফির কাপ ঠোঁটে ছোঁয়াতে হলো গ্রেবারের। কোনরকমে কফিটুকু শেষ করে উঠে দাঁড়াল ও। 'কোথায় গেলে ওঁদের খোঁজ পাওয়া যেতে পারে, বলতে পারেন?'

একটু যেন চমকে উঠল সীগলার। বলল, 'না, কোন ধারণাই নেই।'

'আচ্ছা, চলি।' ঘুরে দাঁড়াল গ্রেবার। ওকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল ফ্রাউ সীগলার। বিদায় দেয়ার আগে বলল, 'বাড়তি ঘর থাকলে থাকতে বলতাম তোমাকে।'

'না, না,' ব্যস্ত হয়ে উঠল গ্রেবার, 'কোন অসুবিধে নেই আমার। থাকার ব্যবস্থা একটা হয়েই যাবে।' রাস্তায় নেমে এল ও। কেন যেন মনে হলো, কিছু একটা গোপন করে গেল সীগলাররা। তখনই ব্যোটশারের কথা মনে পড়ল ওর—জানলেও ভয়ে মুখ খুলবে না কেউ।

তেত্রিশ সাল থেকে তিলে তিলে যে ভয়, যে আতঙ্কের পাহাড় জমেছে মনে, সে কি এত সহজে যায়।

'মারা গেছে ওরা।'

এক নিমেষে মুখ থেকে রক্ত সরে গেল গ্রেবারের, মনে হলো, ওর বুকের ভেতরে খামচে ধরেছে কেউ; হঠাৎ করে যেন অক্সিজেনের অভাব পড়ে গেছে বাতাসে।

'আ···আপনি দেখেছেন?' থিরথির করে কাঁপছে ওর ঠোঁটজোড়া। শরীরের সবটুকু শক্তি খরচ হলো কথাটা বলতে।

'না; কিন্তু চারদিকের অবস্থা দেখে বুঝতে পারছ না, কেউ আর বেঁচে নেই? লেন মারা গেছে, আগাস্ট···' হাউহাউ করে কেঁদে উঠল ফ্রাউ লুসি। 'ওদেরকেও দেখতে পাইনি আমি। তুমি তো সৈনিক, বলো আমাকে, কেন অমন কাজ করল ওরা?'

পরিচিত একজনের খোঁজ পেয়ে সাথে সাথে তার কাছে ছুটেছিল গ্রেবার। ওর বাবা-মার কথা জিজ্ঞেস করতেই এই বিপত্তি।

ইশারায় ওকে ডাকল হের লুসি। বয়স পঁয়তাল্লিশ বছর মত হবে, দেখতে লাগছে আশি বছরের বৃদ্ধের মত—মাথায় টাক, চোখদুটো ঢুকে গেছে কোটরে, ঠেলে বেরিয়ে এসেছে কণ্ঠার হাড়। গ্রেবার কাছে যেতেই ফিসফিস করে বলল,

www.BanglaBook.org

'কিছু মনে কোরো না, বাবা, ছেলেদুটো মারা যাবার পর থেকেই এই অবস্থা ওর।'

চমকে উঠল গ্রেবার, 'বাবা-মা তাহলে···?'

'ঠিক বলতে পারব না,' জানাল লুসি, 'আজকাল যে অবস্থা, কেউ জানলেও বলবে না, সবাই কুঁকড়ে আছে ভয়ে। ওদের সাথে মাসখানেক আগে দেখা হয়েছিল আমার।'

'কেমন ছিল তখন,' ব্যাকুল হয়ে উঠল গ্রেবার। বলেই মনে হলো ওর, প্রশ্নটা অর্থহীন। এখন, এই দুঃসময়ে, এক ঘণ্টা আগেও কেউ কেমন ছিল, কোন লাভ নেই জেনে।

'ভালই তো দেখেছিলাম।'

'আচ্ছা, আজ আসি তাহলে।' বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে এল গ্রেবার।

রাস্তায় খেলা করছে দুটো কুকুর। মাথার ওপরে বিষণ্ন নীল আকাশ—একেবারে চুপচাপ; যেন মানুষের এত দুঃখ, এত কষ্ট, এত নীচতা, আর হিংস্রতায় নির্বাক, স্তব্ধ।

সূর্যের সোনারঙে থিরথির করে কাঁপছে গাছের সবুজ সবুজ পাতা।

নয়

খুঁজতে খুঁজতে সন্ধ্যা পার করে ফেলল গ্রেবার, বাইশ নম্বর মারীনস্ট্রাসে আর পায় না। শেষ পর্যন্ত মোটামুটি আন্দাজ করে একটা বাড়ির সামনে দাঁড়াতেই ওপাশ থেকে ভেসে এল গম্ভীর গলা, 'কি চাই?'

'এটা কি বাইশ নম্বর?'

'হ্যাঁ, কি দরকার?'

'হের ক্রুজের সাথে দেখা করতে চাই।'

'ক্রুজে?' গলার স্বরে বোঝা গেল বিস্ময়ে লোকটার চোখ ঠিকরে পড়ার যোগাড়। বাইরে বেরিয়ে এল সে। পরনে এস. এস. আর্মির ইউনিফর্ম, হাতে রাইফেল নেই, সুতরাং ব্লক ওয়ার্ডেন জাতীয় কেউ হবে, আন্দাজ করল গ্রেবার।

'কেন? কি দরকার?' প্রশ্ন করল সে।

'সেটা তাকেই বলব।' লোকটাকে প্রায় ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ভেতরে ঢুকল গ্রেবার।

ভীষণ ক্লান্ত লাগছে, শুধু শরীর আর মনই নয়, অন্য কিছু, হয়তো ওর বিশ্বাস, মূল্যবোধ, মানবিক অনুভূতি, সব, সব অসম্ভব ক্লান্ত। সারাদিন কেটে গেল, অথচ একটা খবর পর্যন্ত যোগাড় করতে পারল না! হয়তো গেস্টাপোর ভয়ে কেউ জানলেও বলল না।

সিঁড়ি বেয়ে তেতলায় উঠে এল গ্রেবার। বারান্দাটা অন্ধকার। ঘণ্টা বাজাতে লম্বামত এক মহিলা দরজা খুলে দিল। তীক্ষ্ণ চোখে তার দিকে তাকাল গ্রেবার,

চিনতে পারল না।

'ডাক্তার ক্রুজে আছেন?' জিজ্ঞেস করল ও।

'আপনি ডাক্তার ক্রুজের সাথে দেখা করতে চান?' ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকাল মহিলা, দরজা ছেড়ে একটুও নড়েনি সে।

'হ্যাঁ,' কিছুটা রুক্ষ গলায় উত্তর দিল গ্রেবার, 'উনি আছেন?'

'আপনি কি চিকিৎসার জন্যে এসেছেন?'

'না, ব্যক্তিগত ব্যাপারে। আপনি কি ফ্রাউ ক্রুজে?'

'না। ফ্রাউ ক্রুজে মারা গেছেন।' ভাবলেশহীন মুখে কথাটা জানাল মহিলা।

সারাদিনের ব্যর্থতা, মানুষের ভয়, নীচতা আর সতর্কতা—সব কিছুর সাথে মহিলার পাথরের মত নিষ্প্রাণ ব্যবহার একেবারে খেপিয়ে তুলল গ্রেবারকে। ঝাঁঝাল গলা কয়েক পর্দা চড়াল ও, 'ডাক্তার ক্রুজে আছেন কি নেই, বলুন। ওঁর সাথে কথা বলব আমি।'

'উনি এখানে থাকেন না,' তীক্ষ্ণ গলায় জানাল পাথর।

হয়তো মহিলার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত গ্রেবার, পাশ থেকে খুলে গেল একটা দরজা, ভেতর থেকে গড়িয়ে আসা আলোর ফ্রেমে ভেসে উঠল অপূর্ব একটি মুখ—আশ্চর্য মিষ্টি সুর ঝরল তার কণ্ঠ থেকে, 'আমাকে খুঁজছেন?'

'হ্যাঁ,' মহিলার অস্তিত্ব পুরোপুরি উপেক্ষা করল গ্রেবার, 'আমি ডাক্তার ক্রুজে কিংবা তাঁর কোন আত্মীয়ের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'আমি এলিজাবেথ ক্রুজে।'

'বড় আলো নিবিয়ে ছোটটা জ্বেলে দিও।' ওদের দিকে বিষদৃষ্টি হেনে চলে গেল পাথর।

মুগ্ধ বিস্ময়ে এলিজাবেথের দিকে চেয়ে রইল গ্রেবার। উনিশ-কুড়ি বছরের সদ্য ফোটা ফুল—বাঁকানো ভুরুর নিচে টলটলে কালো চোখ, কালো চুলের বন্যা লুটিয়ে পড়েছে কাঁধে।

হেঁটে নয়, যেন আলোর সাগরের ওপর দিয়ে ভেসে ওর দিকে এগিয়ে এল মেয়েটা। মিষ্টি একটা গন্ধে বুক ভরে উঠল গ্রেবারের। কানের কাছে জলতরঙ্গ বাজল, 'বাবা তো আর চিকিৎসা করেন না।'

'চিকিৎসার জন্যে নয়,' ঘোর কাটল গ্রেবারের, 'একটা খবর নিতে এসেছি।'

চঞ্চল কালো মণিদুটো দ্রুত ঘুরে গেল অন্য দরজার দিকে। মহিলাটি নেই দেখে ওর কানের কাছে ফিসফিস করে বলল মেয়েটা, 'ভেতরে আসুন।'

'আমি কিন্তু আপনাকে চিনি,' ওরা ঘরে ঢুকতেই দরজা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াল এলিজাবেথ। 'আপনি তো এখানকার হাইস্কুলে পড়তেন, তাই না?'

গভীর, অতলস্পর্শী দুটো স্বচ্ছ চোখের ওপর চোখ রেখে ছোট্ট করে উত্তর দিল গ্রেবার, 'হ্যাঁ। আমার নাম আর্নস্ট গ্রেবার।'

'জানি আমি,' ঠোঁটের কোণে একটুকরো দুষ্টু হাসি এলিজাবেথের।

চমকে উঠল গ্রেবার। বলে কি মেয়েটা! ভাল করে খেয়াল করল ওকে—বড় বড় কাজলকালো চোখ, ঝাঁপিয়ে পড়া চুল। কোথায় যেন দেখেছি···দেখেছি···,

www.BanglaBook.org

তারপরই মনে পড়ল ওর, চেঁচিয়ে উঠল আনন্দ-উল্লাসে, 'এলিজাবেথ, তুমি! একেবারে চিনতেই পারিনি। কত বড় হয়ে গেছ!'

'হবই তো,' হাসল এলিজাবেথ। টোল পড়ল গালে। 'সাত-আট বছর তো আর কম সময় নয়!'

'অনেক বদলে গেছ তুমি।'

'তুমিও।'

'দেখে মনে হচ্ছে,' ঘরের চারপাশে নজর বুলিয়ে হাসল গ্রেবার, 'রাজার হালে আছ!'

'রাজার হাল!' কান্না ঝরে পড়ল এলিজাবেথের হাসিতে, 'রাজারহালই বটে! বন্দীকে ওরা এভাবেই রাখে।'

চমকে উঠল গ্রেবার। কিছু বলার জন্যে মুখ খুলতেই 'হিস্···স্···' করে ঠোঁটের ওপর আঙুল রাখল এলিজাবেথ। এগিয়ে গিয়ে গ্রামোফোনে রেকর্ড চাপাল একটা। 'এবার বলো।'

'এসব কি?' হতবাক হয়ে গেছে গ্রেবার। পাগল হয়ে গেছে নাকি মেয়েটা? রেকর্ডে সৈনিকদের জোরকদমে এগিয়ে যাবার জন্যে তারস্বরে চিৎকার করছে গায়ক।

'বন্ধ করো, শিগগির,' কিছুটা গলা চড়াল গ্রেবার, 'অনেক এগিয়েছি, আর না এগোলেও চলবে। তার চেয়ে বলো, তুমি বন্দী কেন?'

'যে মেয়েটাকে দরজায় দেখলে,' কাছে এসে ফিসফিস করল এলিজাবেথ, 'স্পাই সে। দরজার···' পাশের দরজাটা দেখাল ও, 'ওপাশে আড়ি পেতে আছে সম্ভবত। এখন বলো, বাবার খবর কি জানো।'

'কিছু জানি না তো!'

'সে কি, কিচ্ছু শোনোনি তুমি?'

'না তো!' ভীষণ অবাক হলো গ্রেবার, 'আমি শুধু আমার বাবা-মা'র খবর জানতে এসেছিলাম।'

নিমেষে কালো হয়ে গেল এলিজাবেথের চেহারা। গালে হাত দিয়ে চুপচাপ অনেকক্ষণ বসে থাকল। একসময় দীর্ঘশ্বাস ফেলে ম্লান স্বরে বলল, 'আমি ভেবেছিলাম, বাবার কোন খবর নিয়ে এসেছ তুমি।'

'কেন, কি হয়েছে ওঁর?'

'বাবা এখন বন্দীশিবিরে। সরকারী নীতির বিরোধিতা করার অপরাধে মাসখানেক আগে বাবাকে ধরে নিয়ে গেছে ওরা। আমি ভেবেছিলাম, বাবার খবর জানাতে এসেছ তুমি। সেজন্যেই সাবধান···'

এলিজাবেথের কথা শেষ হবার আগেই আর্তনাদ করে উঠল সাইরেন, একেবারে বুকের ভেতরে গিয়ে ঘা দিল শব্দটা।

ঠকঠক করে শব্দ হলো বন্ধ দরজায়। বাইরে থেকে শোনা গেল মহিলার গলা, 'আলো নিবিয়ে দাও শিগগির।'

'পেত্নীটা জুটল কোত্থেকে?' খেপে গেছে গ্রেবার।

'সামরিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশে আমার ওপর নজর রাখার জন্যে পাঠানো হয়েছে ওকে।'

দূর থেকে ভেসে আসছে ভয়ার্ত মানুষের চিৎকার। তাড়াতাড়ি গায়ে একটা কোট চাপিয়ে নিল এলিজাবেথ। 'চলো, শেল্টারে যাই।'

'এখনও সময় আছে অনেক,' ওকে তাড়াহুড়ো করতে দেখে আশ্বস্ত করল গ্রেবার, 'এই নরকে পড়ে না থেকে অন্য কোথাও চলে যাও না কেন?'

'হয়তো পালাতে চাই না, সেজন্যে।' আলোটা নেবাল এলিজাবেথ, হাতড়ে হাতড়ে এগিয়ে গিয়ে রাস্তার দিকের জানালাটা খুলে দিল। প্রকট হয়ে উঠল সাইরেনের কানফাটানো তীক্ষ্ণ চিৎকার।

কাচের গায়ে গুণচিহ্নের মত ক'র কাগজ সাঁটা, যেন ওদের সমস্ত স্বপ্নকে অবলীলায় কেটে দিয়েছে কেউ।

গাঢ় ছায়ার মত ফুটে আছে এলিজাবেথ। পায়ে পায়ে এগিয়ে এল, অন্য কোন জগৎ থেকে যেন ভেসে এল ওর কথাগুলো—'এখন আর কোথাও পালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।' অন্ধকারেও চিকচিক করে উঠল ওর চোখের কোল।

বুকের মাঝখানে আগ্নেয়গিরির জ্বালা, ভেতর থেকে কেঁপে কেঁপে উঠছে লাভাস্রোত; হাতদুটো মুঠি পাকিয়ে গেছে গ্রেবারের, থির-থির করে কাঁপছে ওর ঠোঁটজোড়া। প্রচণ্ড আক্রোশে সবকিছু ভেঙেচুরে একাকার করে দিতে ইচ্ছে করছে। আক্রোশ ওর নিজের বিরুদ্ধে, ভেজা চোখ, বুক-কাঁপানো সাইরেন, মানুষের ভয়ার্ত আর্তনাদ, নীচতা, হিংস্রতা আর পশুত্বের বিরুদ্ধে।

'না,' নিজের কণ্ঠস্বরে নিজেই অবাক হলো গ্রেবার, 'এখানে থাকলে পাগল হয়ে যাবে তুমি। অন্য কোথাও চলে যাও।'

অবাক চোখে ওর দিকে তাকাল এলিজাবেথ। শান্ত গলায় বলল, 'আমাকে একটু একা থাকতে দাও।' কথা শেষ করেই দ্রুত দরজা খুলে বাইরে পা বাড়াল সে। ছুটে এসে ওর পথ আগলে দাঁড়াল গ্রেবার।

এক ধাক্কায় ওকে সরিয়ে দিল এলিজাবেথ, অকল্পনীয় শক্তি এখন ওর গায়ে।

কোনরকমে নিজেকে সামলে নিল গ্রেবার। কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে থেকে এলিজাবেথের যাওয়া দেখল। তারপর পেছন থেকে চিৎকার করে উঠল, 'দাঁড়াও, আমিও আসছি!'

বাইরে তুমুল হৈ-হট্টগোল, নারী-পুরুষ-শিশুর ভয়ার্ত চিৎকারে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। প্রতিধ্বনিত হয়ে ক্রমাগত যেন বেড়েই উঠছে শব্দ। এই হাহাকারধ্বনি, এই আর্তনাদ শিরায় শিরায় বয়ে যায় অসহ্য অসহায় ক্রোধে—কেন বন্ধ হয় না সবকিছু, কেন বন্ধ হয় না সৃষ্টির এই অনর্থক অপচয়?

আরও বেড়ে উঠেছে চিৎকার। সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন সবার, যেন এ-থেকে মুক্তি নেই কারও—মহাপ্রলয় পর্যন্ত যেন প্রলম্বিত এই দীর্ঘ আর্তনাদ।

হুড়মুড় করে অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে নামছে ভীতসন্ত্রস্ত লোকজন। এলিজাবেথের কানের কাছে মুখ এনে চেঁচাল গ্রেবার, 'শেল্টারটা কোথায়?'

www.BanglaBook.org

'কাছেই, কার্লস প্লাটসে।'

রাস্তার দৃশ্য আরও ভয়াবহ—উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটছে মানুষ, রক্ষা নেই কেউ হুমড়ি খেয়ে পড়লে, তাকে মাড়িয়ে যাবে শতসহস্র পা—চিৎকারে, আর্তনাদে নরক গুলজার। সবার গলা ছাপিয়ে মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে এয়ার-রেইড ওয়ার্ডেনের গলা, চেঁচিয়ে নির্দেশ দিচ্ছে লোকজনকে।

পেছন ফিরে নাতিকে ধরতে চাইল এক বৃদ্ধ, উল্টে গেল এক ধাক্কায়, দেখতে না দেখতে অদৃশ্য হয়ে গেল লোকজনের পায়ের নিচে, তার শেষ আর্তনাদও শুনতে পেল না কেউ, শুধু চশমাটা পড়ে রইল রাস্তার পাশে—ঘটনার সাক্ষী হয়ে।

কার্লস প্লাটসে এয়ার-রেইড শেল্টারের সামনে গিজগিজ করছে কালো কালো মাথা। গ্রেবারের হাত ধরে একপাশে টানল এলিজাবেথ। ছুটে যাবার ভয়ে শক্ত করে পরস্পরের হাত ধরে আছে ওরা।

'অপেক্ষা করি আমরা,' কোনরকমে ভিড়ের মাঝখান থেকে সরে এল দু'জন, 'ভিড় কমলে নামব।'

আস্তে আস্তে কমছে মানুষের সংখ্যা, অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে দুঃখের অতল কোন গহ্বরে।

'তোমার ভয় করছে না তো?' জিজ্ঞেস করল গ্রেবার।

'করছে,' ম্লান হাসল এলিজাবেথ, 'আরও ভয় করছে নিচে নামতে।'

চিৎকার করে ওদের ডাকল ওয়ার্ডেন, চেঁচামেচিতে গলা ভেঙে গেছে তার।

মাটির বেশ নিচে শেল্টারটা—বড়োসড়ো আর মজবুত; গ্যালারির মত থাক থাক আসন পাতা, মাঝখান দিয়ে যাতায়াতের রাস্তা। টিমটিমে কয়েকটা বাতি জ্বলছে সিলিংয়ে, তাতে অন্ধকার আরও ঘন হয়েছে।

লোকজন এরই মধ্যে চাদর বালিশ বিছানা পেতে নিয়েছে মেঝেতে, পাশে খাবার-দাবারের প্যাকেট। অবাক বিস্ময়ে দেখল গ্রেবার, মাটির নিচে শুরু হয়ে গেছে অন্য এক জীবন। এই প্রথম—জার্মানীতে, নিজের দেশে—শেল্টারে আশ্রয় নিল ও।

হালকা সবুজ আলো—মৃত, বিবর্ণ, লাশের গন্ধমাখা; চারপাশে দ্বিতীয় মৃত্যুর প্রতীক্ষায় যেন অসংখ্য লাশ। এলিজাবেথের দিকে চোখ ফেরাল গ্রেবার, দেখল, ওর ফ্যাকাসে সবুজ চুল, কালো হরিণ চোখে মৃত্যু-সবুজ ছায়া, চারপাশের ভয়, ঘৃণা, হতাশা আর মৃত্যু।

শিশুদের চোখগুলো শুধু জীবন্ত। মায়ের কোলে নিরাপদ আর পরম নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে বসে বড় বড় অবাক চোখে দেখছে সব; ঝিকমিক করছে যেন কালো মুক্তোগুলো, ঘুরছে, থামছে ক্ষণিক; ওরা কি বুঝতে পারছে সব, জীবনের এই অর্থহীন অপচয়ের? নাকি ওরা খুঁজছে কিছু; বাবা নয়, মা নয়, পরিচিত কেউ নয়, এমন কিছু, যা দৃশ্যমান নয়, শুধু মনের ভেতরে গড়ে ওঠা মূর্তি, মৃত্যুর মত ভয়ঙ্কর কিছু, যা দেখেনি কোনদিন, কিন্তু অনুভব করছে ঠিকই।

নিস্পন্দ নিথর সবাই, খাড়া করে রেখেছে কান, যেন একটি শব্দও হারিয়ে না যায়; যদি দ্রুত নিলে ফুরিয়ে যায় সব, শ্বাস-প্রশ্বাস ধীর, অতি ধীর, যেন আরও ক'টা

মুহূর্ত রাখতে পারে অনুভবে।

সময়মত বিপদের গন্ধ ঠিকই পেল গ্রেবার।

হঠাৎ জোরাল হয়ে উঠল গুঞ্জন, সেই সাথে ছুটে এল এক ঝলক মিষ্টি, ঠাণ্ডা বাতাস। বুকটা জুড়িয়ে গেল গ্রেবারের। অন্যেরা নড়েচড়ে বসল, খুশি হয়ে উঠল শিশুরা—আতঙ্কের কালো পর্দাটা যেন সরিয়ে নিয়েছে কেউ।

'ওরা,' একজন মহিলার কণ্ঠ শোনা গেল, 'চলে গেছে বোধহয়।'

'মাঝে মাঝে এ রকম করে ওরা,' উত্তর দিল আরেকজন। 'তারপর সবাই যখন বেরিয়ে আসে শেল্টার ছেড়ে, তখন মশামাছির মত মারে কে যা ফেলে।'

আধঘণ্টা কাটল আরও। দরজা খুলে দিল ওয়ার্ডেন, গড়িয়ে নামল একফালি রুপোলি জ্যোৎস্না। সিঁড়ি দিয়ে উঠছে এলিজাবেথ, একেক ধাপ উঠছে, আর বদলে যাচ্ছে—ফিরছে আলোয়, মৃত্যু থেকে জীবনে; ফিরে আসছে স্বপ্ন, আশা, ভালবাসা, শরীরের উজ্জ্বল দীপ্তি, লাবণ্য, আরও পরিপূর্ণ জীবন—নিটোল হয়ে, যেন এই একটিমাত্র মুহূর্তের জন্যে সারা জীবন অপেক্ষা করে ছিল ও। গ্রেবারের চোখের সামনে আস্তে আস্তে অচেনা আর অপরূপা হয়ে উঠল জ্যোৎস্নাজড়ানো মেয়েটা।

'বাবা, বাঁচলাম,' বাইরে বেরিয়ে বিরাট একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল এলিজাবেথ, 'গা ঘিনঘিন করে ভেতরে। নামার সময় মনে হয় না আবার কোনদিন উঠতে পারব ওপরে।'

নীরব থাকল গ্রেবার, অনুভব করল শুধু ওর ক্ষতবিক্ষত অনুভূতি। নিঃশব্দে হাঁটল ওরা—পাশাপাশি, কার্লস প্লাটসে আসতেই ধেয়ে এল ঝোড়ো বাতাস। দ্রুত পা চালাল ওরা। একসময় আবার জিজ্ঞেস করল গ্রেবার, 'তুমি চলে যাও না কেন ওখান থেকে?'

'তোমার জানাশোনা কোন জায়গা আছে নাকি?' চোখের কোণে দুষ্টুমির আভাস এলিজাবেথের।

'না।' কঠোর সত্যি কথাটা বলতে কষ্ট হলো গ্রেবারের।

'আমারও নেই। হাজার হাজার লোকের যখন থাকবার জায়গা নেই, তখন অন্য কোন জায়গা পাব কোথায়? তাছাড়া,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল এলিজাবেথ, 'অন্য কোথাও গেলে বাবার বিপদই বাড়বে শুধু।'

গ্রেবারের মনে হলো, এলিজাবেথ নয়, অন্য কেউ বলল কথাগুলো, যে তার সম্পূর্ণ অপরিচিত। হঠাৎ করে অসম্ভব ক্লান্তি এসে ভর করল ওর শরীরে, সমস্ত দিনের অবসাদ যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল একসাথে। ঠিক তখনই ওর মনে হলো, ও এখানে, আর ওর বাবা-মা হয়তো ওকে পাগলের মত খুঁজে মরছে হাকেনস্ট্রাসেতে। শিরদাঁড়া বেয়ে শিরশির করে একটা হিমেল স্রোত নেমে গেল ওর। থমকে দাঁড়াল সাথে সাথে, 'জরুরী একটা কাজ আছে, এলিজাবেথ। চলি আমি।'

'শুভরাত্রি।'

চলে গেল এলিজাবেথ। যতক্ষণ দেখা যায়, ওর দিকে তাকিয়ে থাকল গ্রেবার।

www.BanglaBook.org

একবার শুধু মনে হলো, ওকে পৌঁছে দেয়া উচিত ছিল ওর।

খাঁ খাঁ করছে হাকেনস্ট্রাসে। মাথার ওপর মৌন আকাশ, রুপোলি বোবা চাঁদ, মুঠো মুঠো জ্যোৎস্না।

টাউন হলের সিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল ব্যোটশার। দূর থেকে গ্রেবারকে দেখেই হাত নাড়ল সে। চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কোন খবর আছে নাকি?'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল গ্রেবার। 'তোমার?'

'কিচ্ছু না। সব ক'টা হাসপাতালে খোঁজ নিয়েছি। কেউ কিছু বলতে পারে না। সারাদিন অনেক ধকল গেছে শরীরের ওপর দিয়ে। গলাটা একটু ভেজাই, চলো।'

'চলো।'

হিটলার প্লাটসের দিকে পা বাড়াল দু'জন। রাতের নিস্তব্ধতায় অসম্ভব কানে বাজছে ওদের বুটের শব্দ। অনেকক্ষণ চুপচাপ কাটল, একসময় দীর্ঘশ্বাস ফেলল ব্যোটশার, 'ছুটির একটা দিন চলে গেল।'

রেস্তোরাঁটা ছোট। ব্যোটশার আগেও এসেছে এখানে। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল ওরা। আর কেউ নেই রেস্তোরাঁয়। জানালার কাছে একটা টেবিল নিয়ে বসল দু'জন। দু'গ্লাস বিয়ার দিয়ে গেল একটা মেয়ে, মেয়ে না বলে চর্বির ডিপো বলাই ভাল।

'আমি এখানে বসে, আর আমার বউটা যে কোথায়!' এক নিঃশ্বাসে গ্লাসটা খালি করে টেবিলে নামিয়ে রাখল ব্যোটশার। আবার অর্ডার দিল বিয়ারের।

'যদি শুধু জানতে পারতাম, আমার বাবা-মা সুস্থ শরীরে বেঁচে আছে,' উদাস কণ্ঠে জানাল গ্রেবার।

'তা ঠিক,' বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিল ব্যোটশার, 'কিন্তু বউ কাছে নেই, ছুটিতে আসা সৈনিকের পক্ষে ভাবাই যায় না।'

'একটা জুটিয়ে নিলেই তো পারো,' মুচকি হেসে মন্তব্য করল গ্রেবার। ব্যাগ থেকে খাবার বের করে টেবিলে রাখল।

'এখানে যাদের পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে থেকে?' নাক সিটকাল ব্যোটশার। 'গায়ে দুর্গন্ধ, আর হাড্ডির ওপরে শুধু চামড়া লেপটানো। আমার দরকার, গায়ে-গতরে মাংস আছে এমন কেউ, ঠিক আমার বউয়ের মত।'

'তাহলে তো,' হাসতে হাসতে কাউন্টারের মেয়েটার দিকে ইশারা করল গ্রেবার, 'হাতের কাছেই আছে!'

খেপে গিয়ে কি যেন বলতে গেল ব্যোটশার, তার আগেই হেসে ওকে থামিয়ে দিল গ্রেবার; আরেক গ্লাস বিয়ারের অর্ডার দিল ওর জন্যে।

হঠাৎ মিষ্টি একটা গন্ধ ভেসে এল বাতাসে। ঘাড় ফেরাল গ্রেবার। পেছনের টেবিলে রাখা এক গোছা ভায়োলেট—আশ্চর্য সুন্দর! চোখ বন্ধ করে গভীরভাবে শ্বাস টানল গ্রেবার, বুকের ভেতরে হাহাকার করে এল সোনালি স্মৃতি: ওর শৈশব,

কৈশোর, খাঁচায় রাখা ছোট্ট পাখি, যৌবনের হারিয়ে যাওয়া স্বপ্ন—সব অসম্ভব স্পষ্ট, যেন এইমাত্র ও যাপন করে এল ওর অতীত জীবন; অথচ এই এক নিমেষের ব্যবধানে কী অসম্ভব নিঃস্ব, রিক্ত ও, যেন অন্তহীন তুষারাচ্ছন্ন স্তেপের মাঝখান দিয়ে একাকী হাঁটছে—গন্তব্য জানা নেই।

নিজের অজান্তেই উঠে দাঁড়াল গ্রেবার।

'এ কি, উঠলে যে!' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল ব্যোটশার।

'হ্যাঁ, একটু কাজ আছে।'

'কমাণ্ড্যান্ট অফিসে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ, আটচল্লিশ নম্বরে থাকার অনুমতি মিলেছে।'

'চমৎকার! সোজা চলে যাও ওখানে।'

'তুমি যাবে না?'

চুপ করে থাকল ব্যোটশার; অনেকক্ষণ পরে মুখ তুলল। চোখদুটো কি একটু ভেজা ভেজা বুঝতে পারল না গ্রেবার। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল ব্যোটশার, 'তুমি যাও, আমি আরেকটু পরে যাব।'

ফিরছে গ্রেবার। অকৃপণ হাতে তার ঐশ্বর্য ঢেলে দিয়েছে চাঁদ। আকাশ, প্রান্তর ভেসে যাচ্ছে মোহনীয় রুপোলি বন্যায়; নিস্তব্ধ চারপাশ।

মাঠের শেষ প্রান্তে ওর ক্যাম্প। মাঠটাকে মনে হচ্ছে তুষার ছাওয়া স্তেপ। তাঁবুর সামনে দু'জন গার্ড।

মাঠ পেরিয়ে তাঁবুতে ঢুকল গ্রেবার। বুকের গভীরে কী যে কষ্ট! মনে হচ্ছে, ছুটি ফুরিয়ে গেছে ওর; হাকেনস্ট্রাসের বাড়িটার মত নিশ্চিহ্ন, ধ্বংস হয়ে গেছে ওর স্মৃতি, ওর জীবন; আবার ফিরে এসেছে ও ফ্রন্টে,অন্য এক ফ্রন্টে, যেখানে গোলার গর্জন নেই, কামান, মেশিনগান, রাইফেল নেই, অথচ জায়গাটা অনেক বেশি বিপজ্জনক।

দশ

তিনদিন কেটে গেছে। গত দু'দিন ধরে একনাগাড়ে তাস পেটাচ্ছে চারজন—খাওয়া আর ঘুমোনোর সময়টুকু বাদ দিয়ে। তিনজন বারকয়েক জায়গাটা বদল করেছে, কিন্তু চতুর্থজন—রুমেল, একেবারে খুঁটি গেড়ে বসেছে তার জায়গায়। ছুটিতে এসেছে ও, এসে বউ আর মেয়েকে দেখতে পেয়েছিল কবরে নামানোর ঠিক আগের মুহূর্তে। শরীরে একটা বিশেষ চিহ্ন দেখে স্ত্রীকে সনাক্ত করেছিল ও। কবর দেয়া হয়ে গেলে সোজা চলে এসেছে এখানে, এসেই বসে গেছে তাস পেটাতে। কারও সাথে এখন পর্যন্ত একটা কথাও বলেনি। খেলায় ক্রমাগত জিতেছে ও।

জানালার পাশে বসে চিঠি লিখছে গ্রেবার। ওর পাশে, চোখ বুজে চেয়ারে হেলান দিয়ে আছে ল্যান্স কর্পোরাল রয়টার—আহত পা-টা জানালার ফ্রেমে, হাতে বিয়ারের মগ। বয়স্ক লোক সে। তার ওপাশে এঞ্জিনিয়ার ফেল্ডমান, খাবার সময়টুকু

www.BanglaBook.org

বাদ দিলে সারাক্ষণ শুধু শুয়েই থাকে, ভাবখানা যেন, যুদ্ধের তিন বছরের সমস্ত বকেয়া বিশ্রাম এই তিন হপ্তায় উশুল করে নেবে।

'ব্যোটশারের খবর কি?' মাথা তুলল গ্রেবার,, 'ওকে তো দেখছি না!'

'দুপুরে ইবুর্গে যাবার কথা। সেখান থেকে হাস্ট-এ,' জানাল রয়টার। 'কোত্থেকে একটা সাইকেল জোগাড় করেছে, সেটা নিয়ে দিনে দুটো করে গ্রাম চষে ফেলছে। কিন্তু,' হতাশ শোনাল ওর গলা, 'কত ঘুরবে ও! গ্রাম ছাড়াও তো উদ্বাস্তু শিবির রয়েছে।'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল গ্রেবার। ও নিজেও চারটে উদ্বাস্তু শিবিরে চিঠি লিখেছে। জানে, উত্তর পাবে না, তবু আশা যায় না।

রংরুটদের প্যারেড হচ্ছে বাইরে: সামনে এগোও, পিছু হটো, শুয়ে পড়ো, কিংবা হ্যাণ্ডগ্রেনেড কি করে ছুঁড়তে হয় তার প্রশিক্ষণ। দেখতে দেখতে হাসি পেয়ে গেল গ্রেবারের। পুতুলনাচের মত মনে হলো পুরো ব্যাপারটা।

একসময় উঠে দাঁড়াল ও।

'কোথায় চললে?' বিয়ারের মগ থেকে ঠোঁট সরাল রয়টার।

'শহরে। প্রথমে পোস্টঅফিস, সেখান থেকে রেজিস্ট্রি অফিসে। তারপর কোথায়, জানি না।'

মগটা টেবিলে রাখল রয়টার। 'কিন্তু একটা কথা মনে রেখো সবসময়—তুমি এখন ছুটিতে এবং শিগগিরই শেষ হয়ে যাবে ছুটি।'

'জানি,' বেদনার্ত হয়ে উঠল গ্রেবারের কণ্ঠস্বর, 'ফ্রন্ট থেকে ছুটিতে আসা সৈনিক এ কথাটা কক্ষনো ভুলে থাকতে পারে না।'

ভাঙা পা-টা জানালা থেকে সরিয়ে নিল রয়টার। বলল, 'অবশ্য তোমার বাবা-মা-কে খুঁজবে না, সে হতে পারে না; কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে, ছুটি একবার শেষ হলে জীবনে আবার কোনদিন ছুটি পাবে কিনা কেউ বলতে পারবে না।'

জুতো পরে নিয়ে দরজার দিকে এগোল গ্রেবার।

'আর্নস্ট।'

চমকে উঠল ও। সামনে দাঁড়িয়ে একজন এস. এ কমাণ্ডার—ছিপছিপে শরীর, সুদর্শন, মুচকি মুচকি হাসছে ওর দিকে তাকিয়ে।

ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল গ্রেবার, বাদামী চোখদুটো দেখে সাথে সাথে চিনল তাকে। উচ্ছ্বসিত ভাব দেখাল ও, 'আরে বিনডিং, তুমি! তোমাকে তো চিনতেই পারিনি!'

'হ্যাঁ, জনাব,' হো হো করে প্রাণখোলা হাসি হাসল বিনডিং, 'আমিই সেই।' গ্রেবারের হাত চেপে ধরল সে, 'ভাবতেই পারিনি, এখনও বেঁচে আছ তুমি। মনে হচ্ছে, এক হাজার বছর পরে দেখা হলো আমাদের। কোথায় ছিলে এতদিন?'

'রাশিয়ায়।'

'তার মানে ছুটিতে এখন। তাহলে তো আমার উচিত তোমাকে খাওয়ানো। চলো, কাছেই থাকি আমি। এই তো এখানে,' হাত দিয়ে একদিকে দেখাল বিনডিং, 'সবচেয়ে ভাল কনিয়্যাক খাওয়াব তোমাকে। আরে, দিনখানা কী

চমৎকার—সহপাঠী বন্ধু, তার ওপর সদ্য ফ্রন্ট থেকে ফেরা!' হো হো করে আবার হেসে উঠল সে।

বিনডিংয়ের মুখের দিকে বোকার মত চেয়ে রইল গ্রেবার, যেন কিছুই বুঝতে পারছে না। দু'বছর একসাথে পড়াশোনা করেছিল ওরা, তবে ঘনিষ্ঠতা খুব বেশি ছিল না। ওকে প্রায় ভুলেই গিয়েছিল গ্রেবার, শুধু মনে ছিল, ওর চোখজোড়া আর প্রাণখোলা হাসি। সেনাবাহিনীতে থাকার সময়ই অবশ্য শুনেছিল, এস. এ. তে যোগ দিয়েছে সে।

ওকে প্রায় হিড়হিড় করে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে এল বিনডিং। 'চলো, আজকে প্রাণভরে গেলা যাবে।'

পাশ কাটিয়ে যাবে কিনা ভাবল গ্রেবার, হঠাৎ মনে হলো, ওর বাবা-মাকে খোঁজার ব্যাপারে হয়তো সাহায্য করতে পারবে বিনডিং। বলল, 'চলো।'

যতটা বলেছিল, আসলে ততটা কাছে নয় বাড়িটা; শহরের একেবারে শেষ প্রান্তে, নির্জন নিঃসঙ্গ শাদা রঙের ছোট্ট একতলা বাড়ি। সূর্য ডুবছে, অকৃপণ হাতে মুঠো মুঠো সোনালি মাধুরী ছড়িয়েছে সে; বাগানে বার্চ আর পপলারের সারি—হাওয়ার সাথে কত কথা যে বলে যাচ্ছে ওরা, ডালে ডালে পাখিদের মাতামাতি, ফোয়ারায় জলের শব্দ।

বসার ঘরে ঢুকে চোখ কপালে উঠল গ্রেবারের—দেয়াল জুড়ে সাজানো বিভিন্ন পশুর মাথা। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি আবার শিকার···'

'সব কেনা।' বাধা দিয়ে বলে উঠল বিনডিং, 'কেমন হয়েছে?'

'চমৎকার!'

ওকে হাত ধরে ভেতরে নিয়ে গেল বিনডিং। এ ঘরের মেঝেতে পুরু কার্পেট, তার ওপর চামড়া-মোড়া দামী সোফাসেট, জানালায় দামী রঙিন পর্দা, দেয়ালে আশ্চর্য সুন্দর পেইন্টিং, ঘরের এক কোণে ওপরে অসামান্য সুন্দর এক নগ্ন নারীমূর্তি—অপূর্ব, যেন জীবন্ত একটা পিয়ানো। মুগ্ধ বিস্ময়ে প্রাণ ভরে সবকিছু শুধু দেখল গ্রেবার; ওর মনের গহীনে যে স্বপ্ন লুকিয়ে ছিল এতদিন, আজকে তারই বাস্তবরূপ যেন দেখতে পেল। অথচ ভাবতে অবাক লাগছে ওর, এই বিনডিংই ছোটবেলায় বহুবার টিফিনের পয়সা পর্যন্ত জোগাড় করতে পারত না।

'তোমার খবরাখবর এবার বলো দেখি,' বিনডিংয়ের কথায় চমক ভাঙল গ্রেবারের। 'দেখি, তোমাকে কোন সাহায্য করতে পারি কিনা!'

কথাটা বিনডিং আন্তরিকভাবে বললেও কেন যেন ইতস্তত করল গ্রেবার। ওর জীবনে এই প্রথম কেউ তাকে নিজে থেকে সাহায্য করতে চাইছে। শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলল কথাটা, 'আমার বাবা-মাকে খুঁজে পাচ্ছি না কোথাও।'

সোফায় বসে টেবিলের ওপর পা তুলে দিল বিনডিং। বলল, 'শহরে না থাকলে খুঁজে পাওয়া কঠিন। দিন দু'য়েক সময় দিলে চেষ্টা করে দেখতে পারি। শহরের অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছ!'

'হ্যাঁ, দেখছি তো।'

'আগে গলায় কিছু ঢালা যাক, তারপর···,' উঠে গিয়ে দুটো গ্লাস আর বোতল

www.BanglaBook.org

নিয়ে এল বিনডিং। 'একেবারে আসল আরমায়নাক। কনিয়্যাকের চেয়ে ভাল।'

গ্লাসদুটো ভরে একটা গ্রেবারকে দিয়ে অন্যটা উঁচু করে ধরল সে, 'প্রস্ত!'

'প্রস্ত।'

'উঠেছ কোথায়?' গ্লাসে চুমুক দিল বিনডিং।

'ক্যাম্পে, ওই তাঁবুতেই।'

গ্লাসটা নামাল বিনডিং। 'ছুটিতে এসে ওখানে থাকার কোন মানেই হয় না। উপায় না থাকলে অন্য কথা, কিন্তু আমার এখানে প্রচুর জায়গা খালি পড়ে আছে। কোন অসুবিধে হবে না তোমার। চাই কি,' চোখ টিপল সে, 'মেয়ে নিয়েও আসতে পারো।'

'অর্থাৎ, তুমি একা থাকো এখানে?'

'অবশ্যই, বিয়ে করিনি এখনও। তাছাড়া দিব্যি ফুর্তিতে আছি। মেয়েরা তো এখন আমাকে খুশি করতে পারলে বর্তে যায়। কালকের কথাই ধরো না, বিকেলে বসে সবেমাত্র বোতলটা খুলেছি, দরজা খুলে একেবারে কোলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল মেয়েটা। আহ, কী জিনিস!' জিভ দিয়ে সুড়ুৎ করে শব্দ করল বিনডিং। 'সোজা নিয়ে এলাম বিছানায়। ঘণ্টাখানেক যে কিভাবে পার হয়ে গেল টেরই পেলাম না।

'ঠিকঠাক হয়ে নিয়ে টাকা দিতে গেলাম, নেবে না। ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। ফোঁপাতে ফোঁপাতে জানাল, ওর স্বামী বন্দীশিবিরে, তাকে ছাড়িয়ে দিতে হবে।'

শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল গ্রেবার, 'তুমি পারো সেটা?'

হাসল বিনডিং। 'বন্দীশিবিরে যত সহজে ঢোকানো যায়, বের করে আনা তার চেয়ে হাজারগুণ কঠিন। আমি অবশ্য মেয়েটাকে কোন কথা দিইনি। বলেছি, যথাসাধ্য চেষ্টা করব। সে যাকগে। থাকার ব্যাপারে তুমি কি ঠিক করলে?'

'কোন খবর থাকলে আটচল্লিশ নম্বর তাঁবুতে পাঠাতে বলেছি তো, সেজন্যে ভাবছি, ওখানেই থাকি আর ক'টা দিন।'

'ঠিক আছে। তবে তোমার যখন ইচ্ছে, চলে আসবে এখানে। আমার এখনও মনে পড়ে, স্কুলে ছোটবেলায় তোমার মায়ের দেয়া টিফিন কতদিন ভাগ করে খেয়েছি আমরা।'

হাসল গ্রেবার, 'তোমার মনে আছে ওসব? আচ্ছা, আসি আজকে।'

'কালকে আসছ তাহলে, সন্ধ্যায়। অনেকক্ষণ থাকতে হবে কিন্তু!'

'এর মধ্যে কোন খোঁজ পাওয়া যাবে বলে মনে হয়?'

'যেতেও পারে। তুমি হাসপাতালগুলোতে খবর নিয়েছ?'

'হ্যাঁ।'

'কবরখানায়?'

'না। কাল সকালে যাব তাহলে একবার।'

'কিছু মনে কোরো না যেন কথাটা বললাম বলে। তো সে কথাই থাকল, কাল সন্ধ্যায়।'

'ঠিক আছে।'

খুশিতে গ্রেবারের হাতদুটো জড়িয়ে ধরল বিনডিং। 'তুমি জানো না, আর্নস্ট, মাঝে মাঝে কী অসম্ভব নিঃসঙ্গ লাগে নিজেকে! আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হয় তখন। কত লোক আসে আমার কাছে, শুধুই সাহায্যের আশায়।'

ম্লান হাসল গ্রেবার, 'আমিও তো সেজন্যেই এসেছি।'

'তোমার কথা আলাদা, তুমি আমার ছেলেবেলার বন্ধু।' চট করে আলমারি থেকে একটা আরমায়নাকের বোতল বের করল বিনডিং। 'তোমার জন্যে। দাঁড়াও, এক মিনিট।' হাউসকীপারের উদ্দেশে হাঁক ছাড়ল সে, 'ফ্রাউ ক্লাইনার্ট, একটু কাগজ দিয়ে যান তো।'

কাগজে মুড়ে বোতলটা গ্রেবারের হাতে প্রায় জোর করেই ধরিয়ে দিল বিনডিং।

হাকেনস্ট্রাসে ফিরে এল গ্রেবার। সারা পথ ওর ঘুরেফিরে কেবল বিনডিংয়ের কথাই মনে পড়ছে—ওর জীবনে প্রথম যে ওকে নিঃস্বার্থভাবে সাহায্য করতে চাইল, নিঃসঙ্কোচে নিজের বাড়িতে থাকতে বলল, ওর সান্নিধ্যে উচ্ছ্বসিত হলো, সে একজন এস. এ. কমাণ্ডার—জীবনে যে কোনদিন বন্দুক ছোঁয়নি, অথচ অসংখ্য মানুষকে ঠেলে দিয়েছে মৃত্যুর হিমশীতল অন্ধকারে। কী অসম্ভব বৈপরীত্য জীবনের!

লাজনম্র কুণ্ঠিত পায়ে এগিয়ে আসছে সন্ধ্যা; বাতাসে কাঁচা সোনার রঙ, গাছের পাতাগুলো কী মোহনীয়, কী কোমল, স্নিগ্ধ!

জমাট বাঁধতে শুরু করেছে অন্ধকার। কাগজ সাঁটা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল গ্রেবার। ছ্যাঁৎ করে উঠল ওর বুকের ভেতরে—ওর চিঠিটা নেই, সেই সাথে পিনগুলোও, এর অর্থ কেউ ছিঁড়ে নিয়ে গেছে চিঠিটা।

বুকের খাঁচায় বাড়ি খাচ্ছে হৃৎপিণ্ড, শরীরের সমস্ত রক্ত উঠে এসেছে মুখে। আঁতিপাতি করে খুঁজল ও। না, নেই; ওর জন্যে কেউ চিঠি লিখে রাখেনি দরজায়।

একছুটে আঠারো নম্বরে এল ও। দ্বিতীয় চিঠিটা তেমনি আছে। কাগজটা উল্টেপাল্টে দেখল গ্রেবার, ওর জন্যে কিছু নেই। এক নিমেষে প্রচণ্ড হতাশা গ্রাস করল ওকে। ধুলোবালির মধ্যেই ধপ্ করে বসে পড়ল, উদ্‌ভ্রান্তের মত তাকাল এদিক ওদিক।

ল্যাণ্ডিংয়ে চেয়ারটা নেই। ওখানে শাদামত কি যেন নড়তে দেখে লাফিয়ে উঠল গ্রেবার। প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে তুলে নিল সেটা—পুরানো নোংরা একটা খাতা। টান মেরে ওটাকে একদিকে ছুঁড়ে দিল ও। সামনে চোখ পড়তেই দেখল, দুটো ইঁটের ফাঁকে পাতলা একটা বই; এমনভাবে রয়েছে, যেন কেউ পড়তে পড়তে রেখে উঠে গেছে কোন কাজে।

বইটা হাতে নিল গ্রেবার। সামনের মলাট নেই, প্রথম পাতায় ওর নামটা অস্পষ্টভাবে বোঝা যায় এখনও—ওর স্কুলের ইতিহাস বই ওটা।

পাতা ওল্টাল ও। মানুষের কত শত বছরের কত কথা জমে আছে এইটুকু জায়গায়—কালো কালো কিছু চিহ্নের ভেতরে—পাশে মাঝে মাঝে ওর নিজের হাতে লেখা মন্তব্য। শূন্য দৃষ্টিতে বইটার দিকে তাকিয়ে রইল গ্রেবার। ওর মনে

www.BanglaBook.org

হচ্ছে, থরথর করে কাঁপছে সব কিছু; সে কি পৃথিবী, সৃষ্টি, বিধ্বস্তপ্রায় সমস্ত শহর, নাকি সোনারঙে রাঙানো আকাশ অথবা হাতে ধরা দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের বিশাল সাম্রাজ্য, জানে না ও।

বইটা সিঁড়ির ল্যাণ্ডিংয়ে নামিয়ে রাখল গ্রেবার। তন্নতন্ন করে চারপাশে দেখল আরেকবার—কিচ্ছু নেই। গালে হাত দিয়ে অনেক অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল ও। হঠাৎ মনে পড়তেই বোতলের ছিপি খুলে ঢকঢক করে গলায় ঢেলে নিল সোনালি আগুন। আবার নামল রাস্তায়।

অন্ধকার গ্রাস করেছে আকাশ, মন, চেতনা। কার্লস প্লাটসের দিকে হাঁটছে গ্রেবার। পার্কের কাছাকাছি এসে বাঁক ঘুরতেই একজনের সাথে ধাক্কা খেলো। সাথে সাথে খেঁকিয়ে উঠল সে, 'কানা নাকি?'

লোকটার দিকে তাকাল গ্রেবার। মিটিমিটি হাসল ও, 'দুঃখিত। ভুল হয়ে গেছে।'

তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থাকল লোকটা, তারপর বাঘের মত থাবা বসাল ওর কাঁধে। কলকল করে উঠল লেফটেন্যাণ্ট লুডভিগ, 'আরে আর্নস্ট, তুমি! কোত্থেকে? ছুটিতে নাকি?'

'হ্যাঁ, তুমি?'

'আমার শেষ হলো; তাড়া দেখে বুঝতে পারছ না?'

'তা কেমন কাটল ছুটিটা?'

'চমৎকার! ছুটিতে আর বাড়ি আসছি না আমি।'

'বলো কি?' অবাক হলো গ্রেবার।

'এই বাড়ির জন্যে,' সিগারেট বের করল লুডভিগ, 'ছুটিটা আমার মাঠে মারা গেল। তা তুমি কতদিন হলো এসেছ?'

'চারদিন।'

'আর ক'টা দিন যাক, নিজেই বুঝবে।' সিগারেট ধরাবার চেষ্টা করছে লুডভিগ, বাতাসের জন্যে সুবিধা করতে পারছে না। লাইটার জ্বেলে ওর সিগারেটের নিচে ধরল গ্রেবার।

'বাড়ির সবার ধারণা,' একগাল ধোঁয়া ছাড়ল লুডভিগ, 'আমি সেই আগের মতই ছোট্টটি আছি—সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখবে; ভাবখানা, যদি পড়ে গিয়ে ব্যথা পাই! মা-তো পুরো সময়টাই চোখের জলে বুক ভাসাল, অর্ধেক সময়—এতদিন পরে আমি বেঁচেবর্তে অক্ষত অবস্থায় বাড়ি ফিরেছি বলে, বাকি অর্ধেক—আবার আমি চলে যাব বলে।'

'তোমার বাবা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে লড়াই করেছিলেন না?' জানতে চাইল গ্রেবার।

'হ্যাঁ, আর তার ছেলে লড়ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে। সে জন্যে গর্বের শেষ নেই তার। যেখানে যাবে, সঙ্গে নিয়ে যাবে, পরিচিত যাকে দেখবে, তার সাথেই আলাপ করিয়ে দেবে। উফ্, জীবনটা একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে গেছে!' বিরাট একটা মুক্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল লুডভিগ, 'সেজন্যে একটা সৎ পরামর্শ দিচ্ছি, পারতপক্ষে ওদের

কাছে ঘেষবে না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল গ্রেবার, 'আমার বাবা-মার সাথে দেখাই হয়নি এখনও!'

'চমৎকার, বড় বাঁচা বেঁচে গেছ,' গ্রেবারের কাঁধে দুটো চাপড় দিল লুডভিগ, 'আচ্ছা চলি। বেঁচে থাকলে আবার দেখা হবে।' চলে গেল সে।

একা একা দাঁড়িয়ে রইল গ্রেবার; ভেবে পাচ্ছে না, কি করবে এবার। অন্ধকারে ঢাকা প্রেতপুরী; কোথায় যাবে ও, কী খুঁজবে, কাকে খুঁজবে? নিঃসঙ্গ সন্ধ্যা, ব্যর্থ শহর, হতাশা; পাগলের মত লাগল নিজেকে গ্রেবারের। অন্ধকারে ভয়াল ভগ্নস্তূপের দিকে চোখ ফেরাল—অন্তহীন নৈরাশ্যের মাঝে যেন ছোট্ট একটা দ্বীপ। এখানে আশ্রয় নিতেই কি সোনালি স্বপ্ন নিয়ে ফ্রন্ট থেকে ছুটে এসেছিল ও? না, মাথা নাড়ল গ্রেবার, সে দ্বীপ তলিয়ে গেছে মৃত্যুর অতলে, এখন সমস্ত পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে গেছে ফ্রন্ট—দেশে দেশে, বুকের গহীনে, শিরায়-উপশিরায়, রক্তে-মজ্জায়-অস্থিতে।

এগারো

মৃত লোকগুলোও রেহাই পায়নি যুদ্ধ থেকে। বোমার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত কবরখানা—ক্রুশ উড়ে গেছে পাথরগুলো এসে ছিটকে পড়েছে রাস্তায়, প্রাচীন মহীরুহ মুখ থুবড়ে পড়ে আছে মাটিতে; একপাশে হাড়গোড়ের স্তূপ, কফিনের ভাঙা টুকরো ছড়ানো-ছিটানো চারপাশে।

তিনজন লোক খোঁড়াখুঁড়ির কাজ করছে কবরখানায়। ঘামে চকচক করছে ওদের শরীর। গ্রেবার ওর বাবা-মায়ের খোঁজ করতেই ওর দিকে এমনভাবে তাকাল লোকগুলো, যেন বদ্ধ পাগল ও।

'যাদের কবর দেয়া হচ্ছে, তাদের নামের কোন তালিকা নেই?' জিজ্ঞেস করল গ্রেবার।

'তালিকা?' ওর আপাদমস্তকে ভাল করে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিল ওভারসিয়ার, তারপর ফেটে পড়ল হাসিতে। 'তালিকা? কবরে শোবার জন্যে বাইরে কতজন লাইন দিয়ে আছে, জানেন? সাতশো। তার আগে এসেছে পাঁচশো। এর মধ্যে আবার বিমান আক্রমণ হলে কতজন যে আসবে, তার ঠিক আছে? এই দুপুরের আগেই বারো জনকে নামাতে হবে কবরে। তালিকা—হুঁহ,' নাক দিয়ে অবজ্ঞাসূচক শব্দ করল সে।

পকেট থেকে নিঃশব্দে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করল গ্রেবার। চারটে সিগারেট আলাদা করে প্যাকেটটা রেখে দিল পকেটে। মৃদু হেসে জানাল, 'রাশিয়ান সিগারেট, খুব ভাল জিনিস।'

একটু ইতস্তত করে প্রত্যেকে একটা করে সিগারেট নিল, ধরিয়ে টান দিতেই মেজাজ বদলে গেল ওভারসিয়ারের, 'আহ্, জিনিস বটে একখানা!' কষে আরেকটা

www.BanglaBook.org

টান দিল সিগারেটে। 'একটা কাগজে আপনার বাবা-মার নাম ঠিকানা লিখে দিন, অফিস থেকে খবর আনার ব্যবস্থা করছি। আপনি ততক্ষণ গির্জার ভেতরের লাশগুলো দেখে আসুন একবার। ওদের নামের তালিকা তৈরি হয়নি এখনও।'

গির্জায় ঢুকল গ্রেবার। স্যাঁতসেঁতে, চিমসে একটা গন্ধ এসে লাগল নাকে। পরক্ষণেই প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেলো যেন ও—জীবনে অসংখ্য মৃতদেহ দেখেছে, কিন্তু তার এমন ভয়াবহ, বীভৎস চেহারা কোনদিন কল্পনাও করতে পারেনি: কফিনে, স্ট্রেচারে, খোলা মেঝেয় শুধু লাশ আর লাশ। মাথার কাছে ছোট্ট চিরকুটে নাম লেখা কারও, জীবনের শেষে এই পৃথিবীতে ওটা ছাড়া আর কিছুই জোটেনি তার। কারও বুকের ওপরে একগুচ্ছ শুভ্র ফুল। বেশির ভাগ মৃতদেহই উদ্ধার করে এনে শুধু ফেলে রাখা হয়েছে এখানে।

গির্জার এ-মাথা থেকে ও-মাথা, প্রতিটি লাশের চেহারা দেখতে দেখতে এগিয়ে চলল গ্রেবার। জীবনে এই প্রথম প্রার্থনা করল ও, যা খুঁজছে যেন না পায়; ওর পেছনে দীর্ঘ মিছিল, মাঝে মাঝেই উঠছে বুকফাটা বিলাপের ধ্বনি, কেঁপে কেঁপে ওঠে ও, প্রতিবারই মনে হয়, এবার ওর পালা।

অবশেষে জীবনের দীর্ঘতম পথ পাড়ি দিয়ে গির্জার বাইরে বেরিয়ে এল গ্রেবার। ঘামে ভিজে গেছে সারা শরীর। মুক্ত বাতাসে বুক ভরে শ্বাস নিল ও। আস্তে আস্তে, হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দন অনুভব করে বাতাসটুকু ছাড়ল।

'পাওয়া গেল?' জিজ্ঞেস করল ওভারসিয়ার।

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল গ্রেবার।

'আপনি সৈনিক বলেই পারলেন,' ওকে প্রশংসা করল ওভারসিয়ার, 'অনেকেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, বমি করতে করতে মারা যাবার দশা হয় অনেকের।' একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, 'এখানকার অবস্থা তো তবু ভাল, অন্য জায়গায় শ' শ' লোককে একসাথে কবর দেয়া হচ্ছে। কাজ করার মত লোক কোথায়!'

স্লিপ হাতে যে গিয়েছিল, ফিরে এল সে। 'না, নেই।'

ধন্যবাদ জানিয়ে কবরখানা ছেড়ে বেরিয়ে এল গ্রেবার।

উইলোর ডালে প্রবল ঝগড়া শুরু করেছে ক'টা প্রাণোচ্ছল শালিক।

সন্ধ্যার অনেক আগেই বিনডিংয়ের বাড়িতে পৌঁছুল গ্রেবার। বারান্দায় খাঁচায় ঝোলানো অচেনা একটা পাখি; ওকে দেখে অদ্ভুত মিষ্টি সুরে শিস দিয়ে উঠল।

ঘণ্টা বাজাতে কালকের সেই হাউসকীপার দরজা খুলল—মহিলা মাঝবয়সী, শাদা পোশাক পরনে; রুপোলি ছোপ ধরতে শুরু করেছে চুলে।

'আপনিই তো হের গ্রেবার?' প্রশ্ন করল সে।

'হ্যাঁ।'

'কুমাণ্ডারকে জরুরী একটা পার্টি মীটিংয়ে যেতে হয়েছে। আপনার জন্যে একটা চিঠি রেখে গেছেন তিনি।' ভেতর থেকে চিঠিটা এনে ওর হাতে দিল মহিলা—বাঁ হাতে কাগজে মোড়া একটা বোতল ধরা তার।

চিঠিটা পড়ল গ্রেবার। বিনডিং লিখেছে—শহরে গ্রেবারের বাবা-মা আহত

হননি। সম্ভবত অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাঁদের, সুতরাং এখানে খোঁজাখুঁজি করে যেন সময় নষ্ট না করে ও: ভদকার বোতলটা রাশিয়াফেরত বন্ধুর রাতের উৎসবের জন্যে।

চিঠি পড়া শেষ করে মুখ তুলল গ্রেবার। ফ্রাউ ক্লাইনার্ট বোতলটা এগিয়ে দিল ওর দিকে।

'ধন্যবাদ,' বলল গ্রেবার, 'বিনডিংকে বলবেন, কালকে আসব আমি।'

'অবশ্যই! উনি খুব খুশি হবেন।'

হাঁটছে গ্রেবার। ভাবছে, আর মনে মনে হাসছে; কী অদ্ভুত ব্যাপার—বিনডিং, একজন এস.এ. কমাণ্ডার, কারও কারও প্রতি অসম্ভব আন্তরিক, অথচ একই সাথে অসংখ্য শান্তিপ্রিয় লোকের ভবিষ্যৎকে এক ফুৎকারে নিবিয়ে দিয়েছে সে।

চিঠির একটা কথা মনে পড়তেই হাসি পেল ওর—ভদকাটা রাতের উৎসবের জন্যে: তা সে উৎসবটা কোথায়, আটচল্লিশ নম্বর তাঁবুতে অসুস্থ সৈনিকদের সাথে, না কি অন্য কোথাও? হঠাৎ এলিজাবেথের কথা মনে পড়ল ওর। হ্যাঁ, ওটাই এখন একমাত্র জায়গা, যেখানে রাতের উৎসবটা হতে পারে।

এলিজাবেথই দরজা খুলে দিল।

'তোমাকে এ সময় পাব, ভাবতেই পারিনি,' উল্লসিত হয়ে উঠল গ্রেবার, 'ভেবেছিলাম, সেই ডাইনীই বোধ হয় দরজা খুলে দেবে।'

'সে নেই এখন। কোন এক নারীবাহিনীর সম্মেলনে গেছে। এসো, ভেতরে এসো।'

'নারীবাহিনীর যোগ্য সদস্যই সে,' হো হো করে হেসে উঠল গ্রেবার। পকেট থেকে ভদকার বোতলটা বের করে টেবিলে রাখল। 'তোমার জন্যে; আমার এস. এ. কমাণ্ডার বন্ধুর কাছ থেকে পাওয়া উপহার।'

'বলো কি?' হাসল এলিজাবেথ, 'তোমার আবার ও রকম বন্ধুও আছে নাকি?'

বোতলের ছিপি খুলল গ্রেবার। কাবার্ড থেকে দুটো গ্লাস নিয়ে এল এলিজাবেথ। ওর দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল গ্রেবার—কালো সোয়েটার, আঁটোসাঁটো পোশাক, লাল ফিতে দিয়ে শক্ত করে বাঁধা চুল, সব মিলিয়ে প্রথম দিনের তুলনায় অনেক অনেক সুন্দর আর চঞ্চল। ঘরটাও আজকে আরও সুন্দর করে সাজানো।

'কতদিন পরে আমাদের দেখা হলো, বলো তো?' গ্লাসে ভদকা ঢালতে ঢালতে প্রশ্ন করল এলিজাবেথ।

'ঠিক একশো বছর পরে। শেষবার যখন দেখা হয় তখন আমরা শিশু ছিলাম, পৃথিবীতে যুদ্ধ বলে কিছু ছিল না।'

'আর এখন?'

'এখন আমরা একশো বছরের বৃদ্ধ,' হতাশা ঝরে পড়ল গ্রেবারের কণ্ঠে, 'বীভৎস অভিজ্ঞতার ভারে ক্ষতবিক্ষত—হতাশ, ক্লান্ত, বিষণ্ণ, বিধ্বস্ত।'

অবাক হয়ে তাকাল এলিজাবেথ। ভাবতেই পারেনি, গ্রেবারের বুকেও এত

www.BanglaBook.org

কান্না জমে আছে। সুগভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও, 'মাঝে মাঝে মনে হয়, পাগল হয়ে যাব।'

'সহ্যের সীমা আছে একটা,' ভদকাভর্তি গ্লাসটা টেনে নিল গ্রেবার। এক চুমুকেই আধাআধি খালি করে ফেলল গ্লাসের।

ভদকাটা চমৎকার। দ্বিতীয়বারের মত গ্লাস ভরে নিল গ্রেবার। এলিজাবেথের গ্লাসটাও ভরে দিল।

আস্তে আস্তে ভদকাটুকু শেষ করল এলিজাবেথ, গ্লাস নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল, 'চলো, তোমাকে একটা জিনিস দেখাই।'

টানা বারান্দা পেরিয়ে ফ্রাউ লিজারের ঘরের সামনে দাঁড়াল ও। বলল, 'তাড়াহুড়োয় বন্ধ করতে ভুলে গেছে।'

গ্রেবারকে ইতস্তত করতে দেখে হাসল এলিজাবেথ, 'সঙ্কোচের কিছু নেই। সুযোগ পেলে সে-ও আমার ঘরে ঢুকে গোপনে তল্লাশি করে।'

ঘরটা সাধারণ—রাস্তার দিকে জানালা, উল্টোদিকের দেয়ালে হিটলারের বিশাল ছবি টাঙানো, মালা আর ওক পাতা দিয়ে ঘেরা; নিচে, টেবিলে রুপোর পাতে মোড়া চামড়ায় বাঁধানো হিটলারের আত্মজীবনী—মলাটে সোনার জলে স্বস্তিকাচিহ্ন। বইটার দু'পাশে দুটো রুপোর মোমদানি; তাতে ফুয়েরারের দুটো ছবি, একটাতে বার্চবনে শিকারি কুকুর নিয়ে, অন্যটাতে শাদা পোশাক পরা বাচ্চা একটা মেয়ে ফুলের তোড়া উপহার দিচ্ছে তাকে—সমস্ত জিনিস যেন পূজার সামগ্রী। অবাক হলো না গ্রেবার। স্বেচ্ছাচারীর প্রতি অন্ধ ভালবাসা লিজারের আগেও বহু লোকের মধ্যে দেখেছে ও।

ঘুরে দাঁড়াতেই থমকে গেল গ্রেবার। হৃৎপিণ্ডটা যেন খামচে ধরল কেউ—এলিজাবেথের চোখে জল।

'এত মৃত্যু, এত ধ্বংসের পরেও বলো, সহ্য হয় এসব?' টুপ করে ঝরে পরল একফোঁটা মুক্তো।

এতবড় সত্যি কথাটার সামনে স্তব্ধ হয়ে রইল গ্রেবার। অনেক অনেকক্ষণ পরে ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কি মনে হয়, ফ্রাউ লিজারই ধরিয়ে দিয়েছে তোমার বাবাকে?'

'হতে পারে,' চোখ মুছল এলিজাবেথ। 'বাবাকে ধরে নিয়ে যাবার আগে থেকেই এ বাড়িতে ছিল সে। তুমি তো জানো, বাবা অন্যায় একটুও সহ্য করতে পারেন না; যা সত্যি, সেটা মুখের ওপর বলে দিতেন। সেজন্যে সন্দেহের তালিকায় বাবার নাম অনেক আগে থেকেই ছিল। পার্টি বক্তৃতা শুনে খেপে উঠতেন বাবা, বলতেন, এ যুদ্ধে কোনদিন জিতবে না জার্মানি!'

'সে কথা এখন অনেকেই বিশ্বাস করে, বলে না শুধু প্রাণের মায়ায়।'

ঘরে ফিরে এল ওরা। গ্লাসে আবার ভদকা ঢালল গ্রেবার। অসম্ভব ক্লান্ত লাগছে ওর। সোফায় হেলান দিয়ে চোখ বুজল। হাহাকার ফুটল ওর গলায়, 'ফ্রাউ লিজার তোমাকেও তো যে কোন সময় বন্দীশিবিরে পাঠাতে পারে, তবু কেন রয়ে গেছ এ বাড়িতে?'

'কথাটা হয়তো তোমাকে বোঝাতে পারব না আমি,' আর্তনাদের মত শোনাল এলিজাবেথের কণ্ঠ, 'মনে হয়, এখানে থাকলে তবু বাবা ফিরে আসবেন একদিন, কিন্তু চলে গেলে কোনদিন আর ফিরবেন না।'

নিচ থেকে অস্পষ্ট হৈচৈ আর মেয়েলি গলার আওয়াজ পেতেই ব্যস্ত হয়ে উঠল এলিজাবেথ। 'চলো, ফ্রাউ লিজার আসার আগেই বাইরে যাই কোথাও।'

বেরিয়ে এসে জানতে চাইল গ্রেবার, 'কোথায় যাবে?'

'জানি না। চলো, যে কোন জায়গায়।'

'ধারেকাছে ভাল কোন রেস্তোরাঁ নেই?'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল এলিজাবেথ, 'ভিড় আমার একদম ভাল লাগবে না এখন, তার চেয়ে বরং হাঁটি।'

'সে-ই ভাল।'

ঘন অন্ধকার চাদর মুড়ি দিয়ে আছে সারা শহর; পথঘাট নির্জন সুনসান, নিথর।

কার্লস প্লাটস পেরিয়ে মারিয়েনস্টাসে, সেখান থেকে পুরানো শহরের ভেতর দিয়ে নদীর দিকে এগোল ওরা।

দু'পাশের দৃশ্য সম্পূর্ণ অবাস্তব, ভৌতিক, রহস্যময়; নির্জন, জনশূন্য পথে শুধু ওরা দু'জন, যেন পৃথিবীর শেষ মানব-মানবী; ক্ষীণ সান্ত্বনার মত মাথার ওপর একফালি চাঁদ, জানালার শার্শিতে আলোর প্রতিফলন; সমস্ত শহর শুয়ে আছে মৃত্যুর মধ্যে—সরল, অচেতন স্ফটিকের শবাধারে।

অখণ্ড নিস্তব্ধতা ভাঙল গ্রেবার, 'আজকে যে শহর আরও নিঝুম মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা কি।'

'গত দু'দিন বিমান আক্রমণ হয়নি, তাই দরজা-জানালা সেঁটে ঘরে বসে আছে সবাই। বিমান আক্রমণ হয়ে গেলে এতক্ষণ দেখতে, লোকজন গিজগিজ করছে রাস্তায়।'

হাসল গ্রেবার, 'চমৎকার নিয়ম করে নিয়েছে দেখছি।'

আকাশে ছেঁড়াখোঁড়া মেঘ, মাঝে মাঝে ঢেকে দিচ্ছে চাঁদকে; অমনি যেন বিশাল, ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে ভগ্নস্তূপ, হিংস্র শ্বাপদের মত সুযোগ খুঁজছে ঝাঁপিয়ে পড়ার; মেঘ সরে গেলেই আবার রুপোলি আলোয় ভেসে যায় মৃতপুরী। হঠাৎ, খুব কাছেই কোথাও ঠুংঠাং শব্দ হলো বাসনকোসনের।

'যাক,' হাসল গ্রেবার, 'এ পৃথিবীতে আরও একজন অন্তত বেঁচে আছে!'

'কফি খাচ্ছে লোকটা,' জানাল এলিজাবেথ, 'খুব বেশি বোমা পড়ার পর বাড়তি কিছু কফি আর চিনি দেয়া হয় রেশনে।'

'আমাদেরও তাই—লড়াই করে ফিরলে পাই এক প্যাকেট সিগারেট, খানিকটা কড়া মদ আর কফি। পরিমাণটা ঠিক হয় মোট বরাদ্দকে যারা ফিরতে পেরেছে তাদের সংখ্যা দিয়ে ভাগ দিয়ে। ফলে, ক্রমেই বেশি বেশি করে পাচ্ছি সবকিছু।'

আরও কিছুক্ষণ উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটল ওরা। একসময় থামল গ্রেবার। 'রাতটা কী চমৎকার, দেখেছ? ভদকার বোতল আনা উচিত ছিল সাথে। এক কাজ করি,

www.BanglaBook.org

চলো,' প্রস্তাব দিল ও, 'তাঁবু থেকে একটা বোতল নিয়ে আসি। কোথাও বসব তারপর।'

ঘাড় কাত করে সম্মতি জানাল এলিজাবেথ।

মাঠের পাশে তাকে দাঁড় করিয়ে তাঁবুতে ঢুকল গ্রেবার। ঢুকেই জিজ্ঞেস করল, 'ব্যোটশার কোথায়?'

'বেচারা,' বই থেকে মুখ তুলল রয়টার, 'সকালবেলা দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে সাইকেলটা ভেঙেছে। এখন হেঁটে চলে। কোথায় গেছে কে জানে! যাবার আগে অবশ্য জানিয়ে গেছে, তোমার জন্যে কোন খবর নেই।'

বিছানার তলা থেকে ব্যাগ বের করল গ্রেবার। গুণে দেখল, মদের বোতল কম একটা। জিজ্ঞেস করতেই একগাল হেসে উত্তর দিল রয়টার, 'ওটা বোধহয় শরীর থেকে বেরিয়েও গেছে এতক্ষণে।'

হাসল গ্রেবার। একটা কনিয়্যাকের বোতল বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'তাহলে এটারও একই ব্যবস্থা করুন।'

হৈহৈ করে উঠল কয়েকজন। 'একা একাই সারড়ে দিও না যেন।'

শোয়া থেকে উঠে সোজা হয়ে বসল ফেল্ডমান। গ্রেবারের হাতে এক প্যাকেট সিগারেট গুঁজে দিয়ে বলল, 'রাখো এটা, টাকা-পয়সা লাগলে বোলো।'

'ধন্যবাদ,' বলল ও। বিনডিংয়ের দেয়া আরমায়নাকের বোতল আর দুটো কাগজের গ্লাস পকেটে নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

'বুঝতেই পারছি, সাথে কোন মহিলা আছে,' চোখ টিপল রয়টার, 'সুতরাং রাতটা মাটি কোরো না যেন। মনে রেখো, যুদ্ধের তুলনায় তোমার ছুটি সমুদ্রের তুলনায় বুদবুদের মত। তোমাদের মত বীর সৈনিকদের বাঁচার চেয়ে মরা অনেক সহজ, কাজেই দুর্লভ জীবনের একটি কণাও যেন বৃথা অপচয় না হয়, খেয়াল রেখো।'

একেবারে বুকের ভেতরে গিয়ে কথাটা বিঁধল গ্রেবারের। ফিরে আসার সময় আড়চোখে তাকাল রুমেলের দিকে; তখনও খেলছে সে এবং জিতছে—ভাবলেশহীন চেহারা, সামনে নোটের স্তূপ। ওর মনের খবর শুধু ও-ই জানে।

উঁচু টিলা, জায়গাটুকু ঘিরে রেখেছে চেস্টনাটে।

বসল ওরা। ফুটফুটে জোৎস্নায় ডুবে গেছে প্রান্তর। প্রান্তর পেরিয়ে, অনেক নিচে, কান্নার মত চিকচিক করছে নদী, তার ওপাশে পাহাড়, মনে হয় কত দূরে, অথচ বুকের কাছাকাছি, এত বড়, এত নিঃশব্দ, একই সঙ্গে এমন উদাসীন ও উপস্থিত; বড় কষ্ট হয় গ্রেবারের।

গ্লাসটা ভরে নিল ও, রুপোলি আলোয় হেসে উঠল তরল সোনা। এলিজাবেথের দিকে একটা গ্লাস এগিয়ে দিয়ে নিজেরটা ছোঁয়াল ঠোঁটে।

'সুন্দর রহস্যময় রাত,' আস্তে করে গ্লাসে চুমুক দিল এলিজাবেথ।

'কিন্তু জীবনটা অসুন্দর, এবং রিক্ত,' গ্লাস খালি করল গ্রেবার, 'শুধু সান্ত্বনা, এখনও বেঁচে আছি; হয়তো এই আশায়, সুন্দর জীবনের দেখা পেতেও পারি।'

গ্লাসটা আবার ভরে নিল ও।

হেলান দিয়ে বসে আছে এলিজাবেথ। চাঁদের আলো এসে পড়েছে ওর মুখে, লেখান থেকে গড়িয়ে নেমেছে কাঁধে, মাথার ওপরে নেমে এসেছে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল,—আপন সৌন্দর্য ঢেলে দিয়েছে অকাতরে—সব মিলিয়ে মনে হলো গ্রেবারের, কল্পলোকের দেবী বুঝি নেমে এসেছে ওর পাশে।

গ্লাসে চুমুক দিল ও। আশ্চর্য এক উষ্ণতা ছড়িয়ে গেল ওর সমস্ত অণু-পরমাণুতে; আর ঠিক তখনই অনুভব করল গ্রেবার, বুকের ভেতরে কী অসীম শূন্যতা, কী অসীম যন্ত্রণা—ভাষাহীন, অথচ বাস্তব!

ছোট্ট পাহাড়ী টিলা ছুঁয়েছে নদীকে। ওপারে, পাহাড়ের কোলে, শুয়ে আছে মাঠ, জ্যোৎস্নাধোয়া সরু মেঠোপথ, গ্রাম, গির্জা, সারি সারি পপলার—হাওয়ার সাথে অবিরল মিতালি—দিগন্তের গা য় কালো ছায়া বিছিয়ে অরণ্য। জ্যোৎস্নার বৃত্তের বাইরে অন্ধকার গভীর, গভীরতর।

দু'জনে বসে আছে চুপচাপ; মনে মনে কত কথা যে হয়ে যাচ্ছে ওদের! নিস্তব্ধ, নিঝুম চারপাশ—গাঢ় হয়ে উঠছে ক্রমাগত। বহুদূর অরণ্যের ওপাশ থেকে ভেসে এল ঝিরিঝিরি বাতাস, ফুলের গন্ধ, আকাশের গান। আকাশে মেঘের সাথে চাঁদের লুকোচুরি।

'কি ভাবছ?' নীরবতা ভাঙল গ্রেবার। অসম্ভব জোরাল শোনাল ওর ফিসফিস কণ্ঠ।

'কিছু না।' ঝিকমিক করে উঠল এলিজাবেথের চোখের মণি দুটো। 'ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। মনে পড়ে না, এমন শান্তিতে কতদিন আগে ঘুমিয়েছি।'

অপলক দৃষ্টিতে শুধু চেয়ে রইল গ্রেবার। এতক্ষণ ধরে কত কী যে ভেবেছে ও, নিজেও জানে না, তবু, অন্তর দিয়ে অনুভব করছে, কেন যেন বুকের ভেতরে শান্তির ঝর্না বইছে ঝিরিঝিরি।

শহরের ভেতর দিয়ে ফিরছে ওরা। আবার ঝাঁপিয়ে পড়েছে যুদ্ধ, আদিম অন্ধকার। হিমেল বাতাসে কেঁপে উঠল ওরা, একটু আগের সোনালি স্বপ্ন যেন এক ফুৎকারে উবে গেছে।

সারি সারি শোকার্ত বসতি, আলো নেই কোথাও; নেই সারা ইউরোপেই, শুধু সুইজারল্যাণ্ড ছাড়া—আলোয় ভরা ছোট্ট একটা দ্বীপ যেন সে, আর তার চারপাশে জার্মানি, ইটালী, স্পেন, বলকান, আফ্রিকা জুড়ে মৃত্যুর তাণ্ডবনৃত্য। মানুষেরই সৃষ্টি আলো অথচ আজ সে-ই ফিরে চলেছে আদিম অন্ধকারে, হৃদয়ের সমস্ত দুয়ার বন্ধ করে দিয়ে।

এলিজাবেথের দিকে চোখ ফেরাল গ্রেবার। দেখল, কাঁদছে ও।

বুকের ভেতরে কেমন যেন করে উঠল ওর। দু'হাতে মুখটা উঁচু করে ধরল এলিজাবেথের। অপ্রকৃতিস্থের মত বলে গেল, 'কেঁদো না, সোনামণি, কেঁদো না। কাল আমরা আর অন্ধকার রাস্তায় ঘুরব না, যাব আলো ঝলমল অন্য কোন জায়গায়,' আলতো করে ওর ঠোঁট নেমে এল একজোড়া কম্পিত ঠোঁটের ওপর,

www.BanglaBook.org

শিরায় শিরায় বয়ে গেল কোমল স্নিগ্ধতা; উজ্জ্বল হয়ে উঠল চাঁদ।

'কালকে আটটায় এসো,' বলে চলে গেল এলিজাবেথ। দাঁড়িয়ে থেকে ওর চলে যাওয়া দেখল গ্রেবার, তারপর ফিরে চলল। পকেট থেকে বোতলটা বের করে চাঁদের আলোয় ধরল—কিচ্ছু নেই ভেতরে। বোতলটা ছুঁড়ে ফেলে দিল পাশের ধ্বংসস্তূপে। ছুটির আরেকটা দিন শেষ হলো, ভাবল ও।

বারো

'ভাল খাবার পাওয়া যায়, এমন কোন জায়গার খোঁজ জানা আছে?' রয়টারকে জিজ্ঞেস করল গ্রেবার।

'একা?'

'না।'

'তাহলে জার্মেনিয়ার তুলনা নেই। কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে, তোমার এই পোশাক নিয়ে ঢুকতে পারবে না ওখানে। রেস্তোরাঁটা শুধুমাত্র অফিসারদের জন্যে, অবশ্য বেয়ারাদের ম্যানেজ করতে পারলে চেষ্টা করে দেখতে পারো।'

নিজের পোশাকের দিকে এতদিনে ভালমত তাকাল গ্রেবার। আসলেই খুব নোংরা হয়ে গেছে পোশাকটা। রয়টারকে বলল, তার পোশাকটা একদিনের জন্যে ধার দিতে।

'শুধু কোট কেন?' সাথে সাথে রাজি হয়ে গেল রয়টার, 'প্যান্টও নিয়ে যাও। আরে, তোমার যা চেহারা, ধরে কার বাবার সাধ্যি! এই চেহারা আর যোগ্যতা নিয়ে অনেক আগেই তো তোমার লেফটেন্যান্ট হবার কথা!'

'কর্পোরাল হয়েছিলাম একবার,' জানাল গ্রেবার, 'এক ব্যাটা বদমায়েশ লেফটেন্যান্টকে ধোলাই দেয়ার অপরাধে ফের নামিয়ে দিল আগের পদে; ভাগ্য ভাল, শাস্তি শিবিরে যেতে হয়নি।'

'শাব্বাশ,' ওর পিঠ চাপড়ে দিল রয়টার, 'তোমাকে দিয়ে হবে। কিছু ভেব না, কর্পোরালের পোশাক পরার সম্পূর্ণ অধিকার আছে তোমার। এবার ভাল করে আমার কথাগুলো শোনো। যদি কোন মহিলাকে নিয়ে ওখানে যাও, বেয়ারাকে বলবে, জি. এইচ. ফন মুমের স্টোর থেকে জোহানিসবার্গের ককসবার্গ—উনিশ শো সাঁইতিরিশ দিতে। এ একেবারে যাকে বলে মৃতসঞ্জীবনী, মরা মানুষ পর্যন্ত বেঁচে ওঠে ও মদ পেলে।'

'বলো কি?' খুশিতে চকচক করে উঠল গ্রেবারের চোখ, 'ঠিক এ জিনিসই খুঁজছিলাম আমি।'

তিনতলার কড়া নাড়তেই খুলে গেল দরজা, যেন ওর জন্যেই অপেক্ষা করছিল কেউ।

হাসি হাসি মুখে সামনে তাকাতেই দপ্ করে নিবে গেল গ্রেবার—ফ্রাউ লিজার দাঁড়িয়ে দরজায়, ও ভেবেছিল এলিজাবেথ। পরমুহূর্তেই পাশের দরজা খুলে বেরিয়ে এল সে। কোন কথা না বলে চলে গেল লিজার।

'তুমি একটু বসো,' পোশাক ঠিক করছে এলিজাবেথ, 'এখুনি হয়ে যাবে আমার।'

'এটাই তোমার সবচেয়ে ভাল পোশাক?' কালকের পোশাকটাই পরতে দেখে অবাক হলো গ্রেবার, একটু দুঃখও পেল। 'আজ রাতের কথাটা একেবারে ভুলে গেলে?'

'তুমি সত্যি সত্যি বলেছিলে ওসব কথা?' অবাক হয়ে ঘুরে দাঁড়াল এলিজাবেথ।

'তবে কি মিথ্যে করে বলেছিলাম? আমার পোশাক দেখে বুঝছ না? যদিও ধার করা পোশাক। জার্মেনিয়াতে ঢুকতে পারাটা অবশ্য নির্ভর করছে তোমার ওপরে।'

'ঠিক আছে, পোশাক পাল্টে নিচ্ছি আমি। কিন্তু···' ইতস্তত করল এলিজাবেথ, 'কিছু মনে কোরো না যেন, তোমার সামনে পোশাক পাল্টেছি জানলে ওই ডাইনীটা···'

'কোন চিন্তা নেই,' উঠে দাঁড়াল গ্রেবার, 'আমি নিচে অপেক্ষা করছি।'

সূক্ষ্ম পর্দার মত কুয়াশা ঝুলছে বাতাসে, কেঁপে কেঁপে উঠছে হাওয়ায়। হঠাৎ ওপর থেকে এক ঝলক আলোর আভাস পেতেই মুখ তুলল গ্রেবার—জানালার আলোকিত ফ্রেমে দাঁড়িয়ে আছে এলিজাবেথ; দু'হাতে দুটো পোশাক নিয়ে ইশারায় জানতে চাচ্ছে, কোনটা পরবে।

ইশারায় গোলাপী রঙেরটা পরতে বলল গ্রেবার। বন্ধ হয়ে গেল জানালা। চট্ করে আশপাশে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল ও। মনে হলো না কারও চোখে পড়েছে ব্যাপারটা। সময় কাটাবার জন্যে পায়চারি শুরু করল রাস্তায়। সারাদিনের ক্লান্তি, হতাশা, ব্যর্থতা এই রাতে অসম্ভব কিছু একটা পাবার আশায় অধীর হয়ে আছে।

ওর ধারণার চেয়ে অনেক আগেই নেমে এল এলিজাবেথ। দেখে প্রথমে ওকে চিনতেই পারল না গ্রেবার—নষ্ট জ্যোৎস্নায় এ কোন রহস্যময়ী—ঝলমলে গোলাপী পোশাক, অসামান্য রূপসী! একি স্বর্গ থেকে মর্ত্যে নেমে আসা কোন দেবী? চুলগুলো টেনে পেছনে বাঁধা, চোখে দুষ্টুমি, ঠোঁটের কোণে মাতাল করা হাসি।

ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে সগর্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে জার্মেনিয়া—চারপাশে কোন ময়লা নেই, নেই ধুলোবালি, ইঁট-পাথরের টুকরো। যেন কারও মনে না পড়ে, মৃত্যুর কালো হাত প্রায় ছুঁয়ে গেছে তাকে।

তীক্ষ্ণ চোখে গ্রেবারের পোশাকের দিকে তাকাল ডোরম্যান। কিন্তু মুখ খোলার আগেই চড়া গলায় জিজ্ঞেস করল গ্রেবার, 'বারটা কোনদিকে?'

'হলরুমের শেষে, ডানদিকে, স্যার। কোন অসুবিধে হলে হেড ওয়েটার ফ্রিটসকে ডাকবেন, স্যার।'

লম্বা টানা হলঘরের ভেতর দিয়ে এগোল ওরা। উল্টোদিক থেকে একজন

www.BanglaBook.org

মেজর আর দু'জন ক্যাপ্টেনকে আসতে দেখে সরে জায়গা করে দিল গ্রেবার। ওরা কাছে আসতেই স্যালুট করল।

'এখানে তো দেখছি অফিসারের ছড়াছড়ি,' মিষ্টি করে হাসল এলিজাবেথ, 'তোমাকে যদি চিনে ফেলে?'

'কি চিনতে পারবে? কর্পোরালের মত ব্যবহার করতে পারছি কি না? তুমি জানো না, এক সময় কর্পোরাল ছিলাম আমি।'

'তাই নাকি?' কিছুটা অবাক হলো এলিজাবেথ, 'আচ্ছা, ধরো, যদি চিনে ফেলেই?'

'কি আর হবে,' কথাটা উড়িয়ে দিল গ্রেবার, 'বড়জোর পনেরো দিনের জেল। তার মানে পনেরো দিনের ছুটি। মন্দ কি!'

ফ্রিটসকে সহজেই খুঁজে পাওয়া গেল, কাছাকাছিই ছিল সে। গ্রেবার ওর হাতে দুটো নোট গুঁজে দিতেই চেহারা বদলে গেল তার। তাড়াতাড়ি একটা টেবিলে জায়গা করে দিল ওদের চওড়া থামের আড়ালে, বেশ নির্জন। 'আশা করি, এখানে আপনাদের কোন অসুবিধা হবে না, স্যার,' বিনয়ে বিগলিত হয়ে জানাল সে।

সারসের মত গলা লম্বা এক বুড়ো বেয়ারা খাবার তালিকা নিয়ে এল। একবার চোখ বুলিয়েই তালিকাটা বুড়োর হাতে ফিরিয়ে দিল গ্রেবার, 'এতে লেখা নেই, এমন কিছু দরকার আমাদের, আছে?'

ফ্যালফ্যাল করে ওর মুখের দিকে তাকাল বুড়ো, যেন কি বলেছে ও, বুঝতে পারেনি। 'না, স্যার, এ ছাড়া আমাদের আর কিছু নেই।'

'ঠিক আছে,' গম্ভীর চালে বলল গ্রেবার, 'জি.এইচ. ফন মুমের স্টোর থেকে জোহানিসবার্গের কুকসবার্গ—উনিশ শো সাইত্রিশ, এক বোতল দাও তাহলে। দেখো, আবার খুব বেশি ঠাণ্ডা যেন না হয়!'

কথাটা আধাআধি শুনেই মুখচোখ চকচক করে উঠল বুড়োর, একেবারে ভক্তি গদগদ গলায় বলল, 'আচ্ছা, স্যার।' একটু ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করল সে, 'কিছু বেলজিয়ান বাছুরের জিব আছে, স্যার, চাটনি আর স্যালাড দিয়ে···'

'চমৎকার,' ওকে থামিয়ে দিল গ্রেবার, 'সাথে শুকনো কিছু।'

'সে কথা আর বলতে হবে না, স্যার,' ভক্তিতে গলার স্বর প্রায় বুজে এল বুড়োর, 'স্ট্যাসবার্গ বুনোহাঁসের রোস্টের জন্যে আমাদের নাম আছে, স্যার। যদি বলেন তো দুটো···'

'সাথে ডাচ পনির; এর সাথে ককসবার্গের স্বাদই অন্যরকম!'

'ঠিক বলেছেন, স্যার।' প্রায় উড়তে উড়তে ফিরে গেল বুড়ো।

এলিজাবেথের বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখ দেখে হেসে ফেলল গ্রেবার। 'এ সব আমার বন্ধু রয়টারের কাছ থেকে আজ সকালে শেখা।'

খিলখিল করে হেসে উঠল এলিজাবেথ। 'তাই বলো!'

মুগ্ধচোখে ওর দিকে তাকিয়ে রইল গ্রেবার। সময়ের সাথে সাথে যেন আরও সুন্দরী হয়ে উঠছে এলিজাবেথ। একসময় বলল, 'এই পোশাকে তোমাকে অপূর্ব লাগছে আজ।'

'তাই?' লাল হলো এলিজাবেথ। 'পোশাকটা মায়ের; কাল রাতে একটু ঠিকঠাক করে নিয়েছি।'

'তুমি আবার সেলাই করতে জানো নাকি?'

'জানতাম না, জেনেছি। প্রতিদিন আধ ঘন্টা সৈনিকদের পোশাক সেলাই করতে হয় আমাকে; বাধ্য শ্রম।'

প্রচণ্ড একটা ঘা খেলো গ্রেবার। কথাটা জানত না ও। একনিমেষে এলিজাবেথের জীবনের আরেকটা দুঃখময় দিক ফুটে উঠল ওর চোখের সামনে। তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ বদলাল সে।

খাবার নিয়ে এল লম্বা-গলা বুড়ো। অত্যন্ত সাবধানে নামিয়ে রাখল গ্লাস বোতল, আর খাবারগুলো চমৎকার করে সাজিয়ে দিল টেবিলে। সুগন্ধে জিভে জল এসে গেল গ্রেবারের, পেটের মধ্যে খিদের দৈত্যটা আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসল।

'এ যে রাজকীয় খানাপিনা দেখছি!'

'শুধু রাজকীয় নয়,' উদাস স্বরে বলল গ্রেবার, 'দু'বছর ভাল খাবার, ভাল মদ ছুঁইনি। এ আমার কাছে হারানো শান্তি ফিরে পাবার মতই দুর্লভ।'

গ্রেবারের কথার প্রতিটি শব্দ অন্তর দিয়ে অনুভব করল এলিজাবেথ। বুকের গভীর গহীনে টুপটুপ করে শুরু হলো বৃষ্টি।

নিঃশব্দে দুটো গ্লাসে মদ ঢালল গ্রেবার, চুমুক দিল। অন্তরের অন্তস্তল থেকে অনুভব করল, ফ্রন্টে দীর্ঘ দীর্ঘ দিন এবং রাত মৃত্যু ছুঁয়ে থাকা সৈনিকের কাছে এ শুধু একগ্লাস মদ নয়, তার ভবিষ্যতের স্বপ্নের প্রতিশ্রুতি, অন্য জীবনের অঙ্গীকার—যে জীবন মৃত্যুহীন, শিশুর সরল স্বপ্নের মত অসীম সম্ভাবনাময়।

ফিরে এল বুড়ো বেয়ারা। 'মদটা কেমন লাগল, স্যার।'

'অপূর্ব, তুলনাহীন!'

'শরতের সূর্যরশ্মি ঠিকরে পড়ে এর গা থেকে। এর স্বাদ তো প্রথম গ্লাসেই বোঝা যায়, তাই না, স্যার?'

'প্রথম গ্লাস কি,' বুড়োকে উসকে দেয়ার জন্যে বললেও সত্যি কথাটাই বলল গ্রেবার, 'প্রথম চুমুকেই বোঝা যায়। এ তো আর পেটে যায় না প্রথমে, যায় চোখের তারায়; সাথে সাথে পৃথিবীর রঙটাই যায় বদলে।'

বুড়ো টেবিলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আর কি। 'ঠিক বলেছেন, স্যার। ওপাশের টেবিলে দু'জন টুপ লীডারও এই জিনিসই নিয়েছেন, কিন্তু ওঁরা ঢকঢক করে শুধু খেয়েই যাচ্ছেন। আসল জিনিসের মর্মই বোঝেন না।' মাথা নুইয়ে চলে গেল বুড়ো।

'তোমার কেমন লাগছে,' এলিজাবেথের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসল গ্রেবার।

'মনে হচ্ছে,' চেয়ারে হেলান দিল এলিজাবেথ, 'জেলখানা থেকে পালানো কোন আসামী—মুক্ত আপাতত, কিন্তু একটু পরেই ফিরে যেতে হবে অন্ধ কুঠুরিতে, সেই বন্দী জীবনে।' মুহূর্তে হাসিটা নিবে গেল গ্রেবারের। কষ্টের সাথে অনুভব করল, যত তিক্ত অনুভূতি, যত গ্লানি তিলে তিলে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে মনে, তা

www.BanglaBook.org

এত সহজে যাবার নয়।

অনেকক্ষণ পরে নীরবতা ভাঙল এলিজাবেথ। 'কি ভাবছ?'

'ভাবছি,' হঠাৎ প্রশ্নে চমকে উঠল গ্রেবার, 'সারা জীবনের তুলনায় এই সাতটা দিন কত তুচ্ছ, কত সামান্য; অথচ এ সময়টুকুই হয়তো আমার জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া।'

'কবে ফিরে যেতে হবে তোমাকে?'

এলিজাবেথের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ওরা। বাতাস থমকে গেছে, গাঢ় হয়ে পাক খেয়ে অলস ভঙ্গিতে নিচে নামছে কুয়াশা।

'দিন পনেরো পরে,' জানাল গ্রেবার।

'আর ক'টা দিন মাত্র।'

'আসলেই তাই,' বিষণ্ণ, ক্লান্তভাবে হাসল গ্রেবার, 'আজকের সন্ধে থেকে সত্যিকারের ছুটি শুরু হয়েছে আমার।'

কোন কথা নেই, কোন শব্দ নেই, শুধু একজোড়া অতল গভীর চোখ—মায়াময়, রহস্যভরা, তাকিয়ে আছে গ্রেবারের দিকে; ঝিনুকের মত পাপড়ি, থেমে থেমে কাঁপছে, নরম মমতায় কুয়াশা ঘিরে রেখেছে চুল। ঝিরঝির করে কষ্ট ঝরছে গ্রেবারের বুকের ভেতরে; এই নির্জনতা, ক্ষণিকের পাওয়া অবিস্মরণীয় উষ্ণতা, মুক্তি, ভালবাসার কোমল-তপ্ত উচ্ছ্বাস, সব ছেড়ে ওকে যেতে হবে ক্যাম্পে, সান্ত্বনাবিহীন তাঁবুতে।

'কাল আমরা কোথায় যাব?' নরম গলায় জানতে চাইল এলিজাবেথ।

'জার্মেনিয়াতেই।'

'আবার?'

'হ্যাঁ। এ দিনগুলো আমার স্বপ্ন হয়ে বেঁচে থাক। কাল আটটায় আসব; তুমি যাবে তো?'

'যাব।'

কী আশ্চর্য অবলীলায় ওকে হৃদয়ের কাছাকাছি টেনে নিল গ্রেবার, ঠোঁট রাখল ওর নরম চুলে, আস্তে আস্তে নেমে এল ভুরু পল্লবে, চিবুকে, তপ্ত একজোড়া ঠোঁটে। অনুভব করল, ওর বুকের ভেতরে গলে গলে যাচ্ছে এলিজাবেথ।

ফেরার পথে কি মনে করে আঠারো নম্বর হাকেনস্ট্রাসের দিকে পা বাড়াল গ্রেবার। কুয়াশামাখা পাথর দুটো একটু সরানো। বুকের ভেতরে যেন হাতুড়ির বাড়ি পড়ল ওর। পাগলের মত ছুটে গেল পাথরের কাছে, শাদা কিছু একটা দেখতে পেয়েই তুলে নিল সেটা। টর্চ জ্বেলে দেখল, পেন্সিলে মোটা করে লেখা—'প্রধান পোস্ট অফিসের পনেরো নম্বর জানালায় খোঁজ করুন।'

মাথার ভেতরটা দপদপ করছে গ্রেবারের। অসহায় ক্রোধে নিজের হাতই কামড়াতে ইচ্ছে করল ওর। কাল সকাল আটটার আগে জানার উপায় নেই কিছু।

তেরো

এখনও কিছুটা টিকে আছে পোস্ট অফিস ভবন। চারদিকে পঙ্গপালের মত গিজগিজ করছে লোকজন। পনেরো নম্বর জানালা খুঁজে নিয়ে লাইনে দাঁড়াল গ্রেবার, বেশ কিছুক্ষণ পরে পৌঁছুল জানালায়।

ফোকর দিয়ে চিরকুটটা বাড়িয়ে দিল ও।

'আপনার আইডেন্টিটি কার্ড?'

সামরিক পরিচয়পত্র আর ছুটির কাগজটা এগিয়ে দিল গ্রেবার। সেটা পরীক্ষা করে পেছনের ঘর থেকে ছোট্ট একটা কাগজের মোড়ক নিয়ে এল লোকটা। মোড়কের ওপরে লেখা ঠিকানাটা ভাল করে মিলিয়ে দেখল ছুটির কাগজের সঙ্গে। সন্তুষ্ট হয়ে জানালা দিয়ে বের করে দিল সে। 'এখানে সই করুন।'

মায়ের হাতের লেখা চিনতে এক মুহূর্তও লাগল না গ্রেবারের, চোখদুটো ছলছল করে উঠল ওর সাথে সাথে। 'মা, তুমি কোথায় মা?' নিঃশব্দ আর্তচিৎকারে পুড়ে পুড়ে গেল ওর অন্তরটা।

মোড়কটা ওর ঠিকানায় পোস্ট করা, ওকে না পেয়ে ফ্রন্ট থেকে ফেরত এসেছে প্রেরকের কাছে, আঠারো নম্বর হাকেনস্ট্রাসে।

দেখানো জায়গায় সই করল গ্রেবার। জিজ্ঞেস করল, 'প্রেরকের বর্তমান ঠিকানা বলতে পারবেন?'

'দোতলায় চিঠি-বিলি বিভাগে খোঁজ করে দেখতে পারেন।'

অর্ধেক ছাদ নেই দোতলার, তবু কাজ চলছে। ওখানে কাজ করছে এক মহিলা, জানাল নতুন কোন ঠিকানা জানা নেই তার, থাকলে প্যাকেটটা সেখানেই পাঠানো হত।

নিচে নেমে এল গ্রেবার। প্যাকেটের গায়ে লেখা তারিখটা দেখল, প্রায় তিন হপ্তার পুরানো। ফ্রন্টে যেতেই সময় লেগেছে বেশি, ফিরেছে অল্পদিনে।

নিরিবিলিতে এসে প্যাকেটটা খুলল ও। ভেতরে একটা শুকনো কেক, একজোড়া পশমের মোজা, আর ছোট্ট একটা চিঠি। নতুন কোন ঠিকানা নেই, নেই বিমান আক্রমণের উল্লেখ কিংবা অন্য কিছু।

ছুটির এক উজ্জ্বল সকালে, অসীম শূন্যতা বুকে নিয়ে খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে রইল গ্রেবার—ওর চোখের সামনে ঝাপসা হয়ে উঠল সমস্ত দৃশ্য, হাতের জিনিসগুলো থেকে মায়ের স্পর্শ আশ্চর্য মমতায় সিক্ত করে ফেলল ওকে।

'আরে এসো, এসো,' উৎফুল্ল গলায় চেঁচিয়ে উঠল বিনডিং, 'সেই কখন থেকে চেষ্টা করছি বোতলটা খালি করতে। তুমিও হাত লাগাও দেখি!'

হাসল গ্রেবার। পাশের সোফায় আরেকজন কাত হয়ে আছে—রোগা চেহারা,

www.BanglaBook.org

কটা চুল, চট করে দেখলে মনে হয়, ভুরু, চোখের পাপড়ি কিচ্ছু নেই। পরিচয় করিয়ে দিল বিনডিং, 'হাইনি, আমার বন্ধু, আর এ আর্নস্ট, আমার স্কুলজীবনের বন্ধু, ছুটিতে এসেছে রাশিয়া থেকে।'

'রাশিয়া?' কোনরকমে চোখ তুলল হাইনি। 'খুব ভাল জায়গা; এখানকার চেয়ে ভাল।' পুরোপুরি জড়ানো গলা ওর।

বিনডিংয়ের দিকে চোখ ফেরাতেই হাসল সে। 'আমার চেয়ে এক বোতলে এগিয়ে। বেচারার মন খুব খারাপ, বোমায় ওদের বাড়িটা একেবারে ধুলো হয়ে গেছে; অবশ্য মারা যায়নি কেউ। ওর সাধের পিয়ানোটার জন্যে এখন শোক পালন করছে ও। এবার বলো, কি খাবে—ভদকা, কনিয়্যাক, নাকি অন্যকিছু?'

'কিছু না। কোন খবর আছে আমার জন্যে?'

'এখনও পাইনি কিছু। সম্ভবত কাউকে কিছু না জানিয়ে চলে গেছেন ওঁরা। যাতায়াতব্যবস্থা ভাল না হওয়া পর্যন্ত খবর পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। তুমি মিছিমিছি মন খারাপ না করে এক গ্লাস গলায় ঢালো দেখি।'

'ও রাশিয়াতে কোথায় ছিল?' হাইনিকে দেখাল গ্রেবার।

'জানি না। এস. ডি-তে ছিল, এটুকু জানি; এখন বন্দীশিবিরের কমাণ্ডার,' গ্লাসে চুমুক দিল বিনডিং।

একটু যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল গ্রেবার। আড়চোখে তাকাল হাইনির দিকে; আশ্চর্য লাগল ওর, এ রকম দুর্বল, হাড্ডিসার লোকেরাই কিনা কোন কারণে কিংবা কারণ ছাড়াই অনায়াসে হত্যা করছে সাধারণ জার্মানিবাসীকে, ভেঙে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে যা কিছু ওদের স্বার্থের প্রতিকূলে। কত শতসহস্র লোক ঢলে পড়েছে মৃত্যুর হিমশীতল কোলে অথবা দিন গুনছে তিলে তিলে মৃত্যুর। বন্দীশিবির, গ্যাস চেম্বার, মানুষকে কষ্ট দিয়ে মেরে ফেলার যতরকম ব্যবস্থা, সব এদেরই আবিষ্কার।

নেশার ঘোরে চেঁচিয়ে উঠল হাইনি—মৃত্যুশকুনের কণ্ঠে।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে ওরা, ও আর বিনডিং। সামনে বাগান—হাওয়ায় হাওয়ায় উচ্ছল কোমল ফুল, প্রজাপতির উল্লসিত ছুটোছুটি ফুল থেকে ফুলে, আকাশের গভীর নীলে পেঁজা তুলোর মত মেঘ, বার্চের শাখায় দুলছে দোয়েলের মিষ্টি শিস, হলুদ রঙের পাখি উড়ছে ডাল থেকে ডালে।

গ্রেবারকে একটা সিগারেট দিয়ে নিজে একটা ধরাল বিনডিং। বাথরুম থেকে ভেসে আসছে একটু পরপরই ওয়াক ওয়াক শব্দ—বমি করছে হাইনি।

'ও তো একটা পাগল,' হেসে বাথরুমের দিকে ইশারা করল বিনডিং।

গলগল করে ধোঁয়া ছাড়ল গ্রেবার। 'হ্যাঁ, আমিও তাই ভাবতে পারতাম, যদি ওর তরফ থেকে কোন বিপদের আশঙ্কা না থাকত।'

'আসলে ব্যাপারটা কি জানো,' অনেকটা সাফাই গাইবার মত শোনাল কথাটা, 'বত্রিশ সালে কমিউনিস্টদের থেকে আলাদা হবার পর থেকেই বদলে গেছে ও। কমিউনিস্টদের যম ও এখন—ক্ষিপ্ত, বন্যহিংস্র সারাক্ষণ। আর···' হাসল বিনডিং, 'মেয়েদের নিয়ে ও যা করে, কল্পনাও করতে পারবে না।'

'তুমিও থাকো নাকি তখন?' একটু বাঁকা সুরেই প্রশ্নটা করল গ্রেবার।

'মাঝে মাঝে। তবে বন্দীশিবিরে ওসব ভাল লাগে না আমার।'

'আর বন্দীদেরকে যখন লাইন ধরে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মারা হয়, তখন?' গ্রেবারের তীক্ষ্ণ স্বরে চমকে উঠল বিনডিং। ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল সে। 'না আর্নস্ট, যা ভাবছ আমাকে, আমি তা নই। একবার মাত্র দেখেছি ওসব, আর দেখব না।'

দরজায় দেখা গেল হাইনিকে—ফ্যাকাসে মুখ, ভেজা, চোখ টকটকে লাল।

'দুঃখিত, দেরি হয়ে গেল। চলি।' মাথা নুইয়ে বকের মত সরু সরু পা ফেলে বেরিয়ে গেল সে।

'আমিও ওকে তোয়াজ করে চলি, আর্নস্ট,' একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল বিনডিংয়ের, 'ওর কু-নজরে পড়তে চাই না বলে।'

এটাই ভেবেছিল গ্রেবার, তবু জিজ্ঞেস করল, 'তাই?'

'হ্যাঁ, ওদের প্রতিটি রক্তকণিকায় বিশ্বাসঘাতকতা আর শঠতার বীজ।'

'কিন্তু আমাদের অঙ্কের শিক্ষক হের বারমেসটার, তিনি নিশ্চয়ই বিশ্বাসঘাতক নন, প্রবঞ্চক নন?'

চমকে উঠল বিনডিং। 'তুমি জানলে কি করে?'

'আমি জানি, আর এও জানি, তুমিও তাকে ঠেলে দিয়েছ বন্দীশিবিরে।'

হাসল বিনডিং, 'ওটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

'দুর্ভাগ্য স্যারের,' হাসল না গ্রেবার।

'আজকের দিনে দুর্ভাগ্য কার নয়? সারা শহরে পাঁচ হাজার লোক—মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই—তাদের দুর্ভাগ্য নয়? বরঞ্চ বন্দীশিবিরে যারা আছে, মাথার ওপরে ছাত অন্তত আছে তাদের। তাছাড়া এসবের জন্যে শুধু তুমি বা আমি দায়ী নই!'

দুটো চড়ুই উড়ে এসে বসল ফোয়ারার পাশে; ভীরু চোখে দেখল ওদের, সতর্ক পায়ে এগোল জলের দিকে, ভেজাল কোমল পালক। গ্রেবার দেখল, অপলক চোখে সেদিকে চেয়ে আছে বিনডিং—নিরুদ্বিগ্ন মুখ, শান্ত, দুঃখের লেশমাত্র নেই চেহারায়, নেই মানুষের জন্যে সহানুভূতি কিংবা ভালবাসার চিহ্ন। আর ঠিক তখনও, সেই মাহেন্দ্রক্ষণে, এক গভীর গভীরতর অনুভূতি জেগে উঠল ওর সত্তায়—চারপাশে জীবনের এই সীমাহীন অপচয়, মানবতার, মনুষ্যত্বের, মূল্যবোধের এত অবক্ষয়, আতঙ্ক, অহঙ্কার, বিচ্ছিন্নতা—এসবের একটুও দায় কি নেই ওর? নিজের আত্মার কাছে কি বলতে পারবে সে, কঠিন প্রতিবাদে কোনদিন আকাশে উঠেছিল ওর মুষ্ঠিবদ্ধ হাত, বিদ্রোহে দাঁড়িয়েছিল মাথা তুলে? না। তাহলে বিনডিংয়ের সাথে নিজের পার্থক্য কি করে করবে ও? তবু, গভীর দীর্ঘশ্বাসের সাথে বেরিয়ে এল ওর নিবিড় অনুভব, 'কেন নই? এ দায়িত্বের ভার কম নয় আমাদের।'

'কেন হবে?' প্রতিবাদ করল বিনডিং, 'দায়ী তখনই হতাম, যখন নিজে থেকে করতাম কাজটা।'

'তাহলে,' ধারাল হয়ে উঠল গ্রেবারের কণ্ঠস্বর, 'বন্দীদের কুকুরের মত গুলি করে মারার সময় কেন ভাব, সব দোষ তাদের একার, অন্যের বিন্দুমাত্র-দায় নেই

www.BanglaBook.org

তাতে?'

'ওদের কথা আলাদা।'

'ঠিকই বলেছ,' বিদ্রূপ ঝরে পড়ল গ্রেবারের কণ্ঠে, 'আমরা ওদের শহরে বোমা ফেললে সেটা হয় রণকৌশল, একই কাজ ওরা করলে হয় চরম বর্বরতা!'

গ্রেবারের মুখের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগল বিনডিং, যেন পুরো ব্যাপারটা অত্যন্ত উপভোগ করেছে সে। 'এটাই, বুঝলে হে, আধুনিক রাজনীতি। এবং জার্মান জনগণের স্বার্থেই সেটাকে গ্রহণ করেছি আমরা।'

দ্রুত হাঁটছে গ্রেবার। নির্জন প্রান্তরের মাঝ দিয়ে বালি আর নুড়ি কণ্টকিত পথ গিয়ে শেষ হয়েছে শহরের বাঁধানো রাস্তায়। বড় একটা প্রজাপতি—বিশাল ডানাওয়ালা, রাস্তার ঠিক মাঝখানে একেবারে নিচু দিয়ে উড়ছে। আরেকটু সামনে, দু'ভাগ হয়ে গেছে রাস্তাটা। এখানে পৌঁছেই হাইনিকে দেখতে পেল গ্রেবার।

খাঁ খাঁ রোদ্দুরে পুড়ছে জনশূন্য পথ। ওপরে স্তব্ধ নীল আকাশ, বাতাস থেমে গেছে, হাইনিকে খুন করতে চাইলে এটাই সময়। বালির ওপর দিয়ে নিঃশব্দে হেঁটে গেলে টেরও পাবে না সে। অনায়াসে পেছন থেকে ছুরি মারা যাবে, গলা টিপে ধরলেও টের পাবে না কেউ। একজনের পক্ষেই কাজটা সম্ভব।

খুব দ্রুত হাঁটছে ও, মনে হলো গ্রেবারের। মনে মনে সম্ভাবনাটা খতিয়ে দেখছে। বিনডিং ওকে সন্দেহ করতে পারবে না; মাত্র একটি ঘণ্টায় যে লোকটি শতসহস্র অসহায় মানুষকে হাসতে হাসতে খুন করতে পারে, তার ওপর বদলা নেয়ার লোকের অভাব হয় না।

হাতদুটো ঘামে ভিজে একাকার, কান দিয়ে যেন ধোঁয়া বেরোচ্ছে, চোখে ঈগলের দৃষ্টি, শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে গ্রেবারের। দেখল, দু'জনের মাঝখানের দূরত্ব কমে এসেছে অনেক; ইচ্ছে করলেই এখন ছুটে গিয়ে গলা টিপে ধরতে পারে হাইনির। কথাটা মনে হতেই বুকের খাঁচায় বাড়ি মারতে শুরু করল হৃৎপিণ্ড। দ্রুত বেড়ে গেল ওর হার্টবিট, গা দিয়ে যেন তাপ-প্রবাহ বইতে শুরু করল।

কেন এমন হচ্ছে? ভোঁতা হয়ে যাওয়া অনুভূতি নিয়ে ভাবল গ্রেবার, ও তো কোনদিন এভাবে খুন করতে চায়নি কাউকে? এ কি মনের কোণে জমে ওঠা পাহাড়প্রমাণ গ্লানি, যা থেকে মুক্তি পেতে চায় ও, নাকি প্রতিহিংসা? কিন্তু প্রতিহিংসাই বা হবে কি করে, হাইনিকে তো আজই প্রথম দেখল ও। আসলে, অন্তরের অন্তস্তল থেকে অনুভব করল গ্রেবার, হাইনি নয়, ও লোকটা একদল হিংস্র পশুর একজন, যারা এলিজাবেথের বাবার মত অসংখ্য নিরপরাধ মানুষকে ঠেলে দিয়েছে বন্দীশিবিরে, হত্যা করছে সহস্র মানুষকে, আর্যরক্তের অহঙ্কারে স্ফীত-গর্বিত হয়ে নির্মূল করছে ইহুদিদের, যাদের আবিষ্কার অসংখ্য নির্যাতন-যন্ত্র আর গ্যাস চেম্বার; ওর প্রতিহিংসা তাদেরই বিরুদ্ধে।

গ্রেবারের গলা শুকিয়ে কাঠ। জিব দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করল ও। এখনও দেখা যাচ্ছে হাইনিকে—হাঁটছে ক্লান্ত পায়ে। হঠাৎ রাস্তার বাঁকে ফুটে

উঠল উজ্জ্বল কমলা রঙ—হাতে ঝুড়ি নিয়ে একটা মেয়ে আসছে এদিকে।

থমকে দাঁড়াল গ্রেবার। ঘোর কাটল ওর। আস্তে আস্তে এগোল এবার। হাইনিকে ছাড়িয়ে ওর কাছাকাছি পৌঁছুল মেয়েটা—অদ্ভুত সুন্দরী। ঠোঁটের কোণে মিষ্টি হাসিটি লেগেই আছে সারাক্ষণ। মেয়েটার চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হলো ওর, জীবনের প্রাচুর্য যেন উপচে পড়ছে ও চোখে, আর জীবনের বেদনা যদি থাকেও—নিঃশব্দে গোপন করে রেখেছে কাজল-কালো চোখের অতলে, মিষ্টি হাসির আড়ালে।

সামনাসামনি এল মেয়েটা। 'সুপ্রভাত, হের,' আন্তরিক স্বরে বলল সে।

মাথা নোয়াল গ্রেবার। শুধু মুগ্ধ চোখে তাকাল, কোন কথা বেরোল না গলা দিয়ে।

সামনের দিকে চোখ ফেরাল ও। কেউ নেই, শুধু ধু ধু শূন্যতা বুকে নিয়ে শুয়ে আছে দীর্ঘ পথ।

এখনও ছুটে গেলে ধরা যায়, ভাবল গ্রেবার; কিন্তু একই সাথে বুঝল, ওর পক্ষে এখন আর সম্ভব নয় সেটা; শুধু এখন কেন, হয়তো কোনদিনও নয়। আমি তো জানতাম, আমি শান্ত, আমি স্থির, বুকের গভীরে কেমন যেন অস্থিরতা গ্রেবারের—এখন বুঝতে পারছি, আমি তা নই, বিভ্রান্ত হয়তো বা। মনের ব্যাপারে অনেক সতর্ক থাকতে হবে এখন থেকে।

পত্রিকার স্টল দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল ও। ছুটিতে আসার পর থেকে পত্রিকার কথা ভুলেই গিয়েছিল। হেডলাইনগুলোর ওপরে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিল একবার. দেখল, এখনও চলছে পিছু হটা। ওঅর ডিপার্টমেন্টের দেয়া খবরে বিন্দুমাত্র আস্থা না থাকলেও ছাপানো ম্যাপে ওদের বাহিনীর অবস্থানটা বের করার চেষ্টা করল গ্রেবার, পেল না। অনুমান করল, আগের অবস্থান থেকে কমপক্ষে একশো কিলোমিটার পিছিয়ে এসেছে ওরা।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকল গ্রেবার। নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে ওর। ফ্রন্ট থেকে ফেরার পর একবারও মনে পড়েনি বন্ধুদের কথা, যেন শীতের শুকনো পাতার মত মৃদু বাতাসে ঝরে পড়েছিল সেসব স্মৃতি। আর এখন, এই উজ্জ্বল সোনালি দিনে, খোলা রাজপথে মাটি থেকে বুকের ভেতরে উঠে এল এক ধূসর নির্জনতা, আকাশের রঙ বদলে গেল, মাটি হলো ভেজা, স্যাঁতসেঁতে—তুমুল যুদ্ধ চলছে ফ্রন্টে, দেখছে যেন ও, অথচ কী আশ্চর্য, কোন শব্দ নেই, গোলার গর্জন নেই, রক্তের গন্ধ নেই, সারা আকাশ জুড়ে শুধু কালো কালো সিন্ধু-শকুন, সূর্যকে ঢেকে ফেলছে দ্রুত, অন্ধকারে ঢাকছে পৃথিবী; ক্রমাগত যেন বেড়েই চলেছে শকুনের সংখ্যা; আর সেই অব্যক্ত অন্ধকারে, নিঃসঙ্গ রাজপথে দাঁড়িয়ে চোখ মুদে দেখল গ্রেবার, ওর সঙ্গীদের অনন্ত সংগ্রাম—দুঃখ, ঘৃণা, ভয়, ভালবাসা সব নিবে যাচ্ছে দ্রুত এগিয়ে আসা অমোঘ নিয়তির কালো থাবায়।

ইয়ান প্লাটসের একপাশ পুরোপুরি বিধ্বস্ত, অন্যপাশটা মোটামুটি অক্ষত; ভাঙা জানালার ফাঁকফোকর দিয়ে চোখে পড়ে লোকজন।

www.BanglaBook.org

সহজেই ছ'নম্বর বাড়ি খুঁজে পেল গ্রেবার। হতাশ হলো ও। বাড়ির ওপরতলাটা হুমড়ি খেয়ে পড়েছে সামনে; বোঝাই যায়, বসবাসের অযোগ্য বাড়িটা। ফিরে আসবে, হঠাৎ চোখে পড়ল ধ্বংসস্তূপের পাশ দিয়ে পায়ে চলা পথ—বাঁক নিয়ে চলে গেছে ধ্বংসস্তূপের পেছনে। ঢুকে পড়ল গ্রেবার, পৌঁছুল একটা বন্ধ দরজার সামনে।

কড়া নেড়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল ও, সাড়া না পেয়ে ফের ঝাঁকুনি দিল কড়ায়, এবার আগের চেয়ে জোরে। একটু পরেই শুনল এগিয়ে আসা পদশব্দ, থামল দরজার ওপাশে। সামান্য ফাঁক হলো দরজা। 'কে?'

'হের পোলমান আছেন?'

'কি দরকার?' বাইরে বেরিয়ে এলেন বৃদ্ধ পোলমান।

'আমি আর্নস্ট গ্রেবার, আপনার ছাত্র।'

'কিন্তু,' ম্লান হাসলেন পোলমান, 'আমাকে তো স্কুল থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। কাউকে পড়ানোর অধিকার এখন আর নেই আমার।'

'জানি, স্যার,' বলল গ্রেবার, 'আমি এখন সৈনিক, ছুটিতে এসেছি রাশিয়া থেকে। ফ্রেজেনবুর্গ আপনাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে।'

করুণ হয়ে উঠল পোলমানের চোখজোড়া। অনেকক্ষণ পর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। 'ও এখনও বেঁচে আছে?'

'দশদিন আগেও ছিল,' শুধরে দিল গ্রেবার, 'এটা বলতে পারি।'

চকিতে এদিক ওদিক দেখে নিয়ে নিচু স্বরে ওকে ভেতরে ঢুকতে বললেন পোলমান।

রান্নাঘরের পাশ দিয়ে বারান্দা, বারান্দা পেরিয়ে একটা দরজার সামনে পৌঁছুল ওরা। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন পোলমান। ঘুরে দাঁড়িয়ে বেশ জোরের সাথে বললেন, 'এসো, ভেতরে এসো, আর্নস্ট। প্রথমে ভেবেছিলাম, পুলিস বোধহয়।'

ভুরু দুটো কুঁচকে উঠল গ্রেবারের, পরমুহূর্তেই আসল ব্যাপাটা বুঝতে পারল—কাউকে আশ্বস্ত করলেন পোলমান। কিন্তু তাঁর তো তিনকুলে কেউ ছিল না বলেই জানত ও। কাঁধ ঝাঁকিয়ে মৃদু হাসল।

টেবিলে সবুজ ঢাকনা দেয়া আলো, বাইরের ইঁট-পাথরের স্তূপে প্রায় ঢেকে যাওয়া জানালা।

দরজা বন্ধ করে ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় গ্রেবারকে টেনে নিয়ে গেলেন পোলমান। 'এবারে ভালমত চিনেছি তোমাকে। আজকাল চোখে ধাঁধা দেখছি। বাইরেও বেশি বেরোই না। ইলেকট্রিসিটি না থাকায় এরকম অন্ধকারেই দিন কাটাচ্ছি এখন।'

ঘরে দৃষ্টি বোলাল গ্রেবার—সারা দেয়াল জুড়ে শুধু বই আর বই, এককোণে ছোট্ট একটা টেবিল—ওপরে আলোটা রাখা। আর এ সবকিছুর মাঝে বন্দী পোলমান—এককালের শিক্ষক, এখন বৃদ্ধ, পক্বকেশ, এবং বলিরেখাকুঞ্চিত।

গ্রেবারের দৃষ্টি অনুসরণ করে হাসলেন পোলমান, 'শুধু এই বইগুলোই টিকে আছে কোনরকমে।'

তাক থেকে একটা বই হাতে নিল গ্রেবার। পাতা ওলটাতে ওলটাতে উদাস

স্বরে বলল, 'কত বছর যে কোন বই ছুঁয়ে দেখিনি!'

'দরকারী জিনিসেই তো তোমাদের ব্যাগ ভরে থাকে, বই রাখার জায়গা কোথায়?'

কোন উত্তর দিল না গ্রেবার। মনের ভেতরে ওর অনেক কষ্টের আনাগোনা; বাইরে ধ্বংস আর মৃত্যু, ভেতরে ম্লান সবুজ আলোয় ও আর বৃদ্ধ পোলমান। মৃদু স্বরে, প্রায় নিজেকে শোনানোর মত করেই কথাগুলো বলল গ্রেবার, 'ফ্রেজেনবুর্গই আমার একমাত্র অন্তরঙ্গ বন্ধু, ওর মধ্যেই মানবিকতা বোধ টিকে আছে এখনও। ও বলেছিল, আমার অনেক প্রশ্নের উত্তর আপনি দিতে পারবেন।'

'প্রশ্ন?' অবাক হলেন পোলম্যান।

'হ্যাঁ,' কষ্টে কুঞ্চিত হলো গ্রেবারের মুখ, 'আমি জানতে চাই, বুঝতে চাই, গত দশ বছরের এই জঘন্য অপরাধের কতটা দায় আমার; আমার কি করা উচিত?'

থমকে গেলেন পোলম্যান—শান্ত, সৌম্য নিরহঙ্কার মানুষটি, নিয়তি যাঁর নির্ধারিত, জীবনের শেষ পরীক্ষায় যেন দাঁড়িয়েছেন কোন উদ্ধতযৌবন পরীক্ষকের মুখোমুখি—চোখ নামিয়ে নিলেন তিনি, কিছুক্ষণ পায়চারি করলেন ঘরের এ-মাথা থেকে ও-মাথা, অস্বস্তি কাটাতে তাক থেকে বই নামালেন একটা। 'জানো, কি প্রশ্ন করেছ তুমি?'

'জানি।'

'আজকের দিনে এর চেয়ে অনেক তুচ্ছ কারণেও গুলি করে মারা হচ্ছে মানুষকে, জানো?'

'জানি।'

চুপচাপ কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলেন পোলম্যান, তারপর মুখ ফেরালেন ওর দিকে। 'তুমি কি যুদ্ধের কথা বলছ, আর্নস্ট?'

'যুদ্ধ, মিথ্যা, অন্যায়, বর্বরতা, রক্ত, মৃত্যু,' অনুভব করছে গ্রেবার, বুকের ভেতরে দাউদাউ করে কি যেন জ্বলছে ওর, একসাথে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে সব কথা, 'এই যুদ্ধের সাথে যা কিছু জড়িয়ে আছে—বন্দীশিবির, শাস্তিশিবির, গণহত্যা, সব, সবকিছুর কথাই বলছি আমি।' একটু বিরতি দিল ও, 'আমি নিজের চোখে যা দেখেছি, শুনেছি তার চেয়ে বেশি। জানি, এ যুদ্ধে হেরে গেছি আমরা, তবু লড়ছি, লড়তে হবে; শুধু লোভ আর ক্ষমতার কাছে সমর্পিত কিছু লোককে আরও কিছুদিন টিকিয়ে রাখতে।'

'তোমাকে তো আবার ফিরতে হবে ফ্রন্টে, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন পোলম্যান। মাথা নিচু করে অনেকটা আত্মগতভাবেই বললেন, 'এর চেয়ে কষ্টের আর কি হতে পারে।'

'যুদ্ধে হেরে গেছি বলে যত না দুঃখ, যত না কষ্ট, তার চেয়ে বেশি দুঃখ, বেশি কষ্ট, যখন ভাবি, আমাকে ফ্রন্টে ফিরে গিয়ে আবার যুদ্ধ করতে হবে অন্যায়ের পক্ষে, লোভ-লালসার পক্ষে, তাকে টিকিয়ে রাখতে—তখন নিজেকে নর্দমার কীটের চেয়েও হীন মনে হয়।'

www.BanglaBook.org

বিবর্ণ হয়ে উঠল পোলমানের চেহারা, শুধু জ্বলজ্বল করে উঠল ওঁর সাগর-নীল চোখদুটো। এরকম চোখ কোথায় যেন দেখেছে, স্মৃতি হাতড়াল গ্রেবার, মনে করতে পারল না এ মুহূর্তে, শুধু কষ্ট বাড়ল বুকে।

'তোমাকে কি ফিরে যেতেই হবে?'

'না ফিরলে গুলি করে মারবে ওরা। পালাতে পারি, কিন্তু মাত্র কয়েক ঘণ্টা লাগবে ওদের আমাকে খুঁজে বের করতে; তখন শুধু আমাকে নয়, আশ্রয়দাতাকেও সবংশে নির্মূল করবে ওরা। আর যদি না পায়, আমার বাবা-মাকে খুন করবে।'

ভাসা ভাসা তন্ময় দুটো চোখ—সাগর-নীল, সুদূরে বিসারিত; ঘরে নিটোল সবুজ নীরবতা, ওদেরকে চমকে দিয়ে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজাল পুরানো দেয়াল ঘড়ি।

'তাহলে,' আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'ফ্রন্টে ফেরা ছাড়া কোন উপায় নেই তোমার?'

'আছে, আত্মহত্যা করা।'

'এদিকে কোথাও বদলি হয়ে আসতে পারো না?'

'সম্ভব নয়। পারলেও সমস্যাকে এড়ানো যাবে শুধু, সমাধান হবে না। আর তাতেও কি দায়ভার বিন্দুমাত্র কমে আমার!'

'না, কমে না,' বইয়ের তাকের দিকে স্থির হয়ে আছে পোলমানের দৃষ্টি। 'প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে ভাবি, আমাদের কিশোরেরা—ঈশ্বরের সন্তান, যুক্তি দিয়ে বিচার করার মত বয়স হয়নি যাদের এখনও, তাদের নিষ্পাপ মনকে বিষাক্ত করে দিচ্ছে ওরা। এই দুঃখ, বেদনা, হতাশা, এই বিচ্ছিন্ন আত্মকেন্দ্রিকতা, সে তো তারই ফসল। একবারও কি ভাবছে না, কাদের ধ্বংস করছে ওরা?'

কথা বলতে বলতে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠলেন অশীতিপর বৃদ্ধ—সম্মানের আসন থেকে বিচ্যুত যিনি, গ্রেপ্তার এড়ানো, অন্ধকারে নির্বাসিত।

হঠাৎ কথা বলে উঠল গ্রেবারের স্মৃতি—পেয়েছে ও, এই রঙ, এই উজ্জ্বলতা সেই রাশিয়ান বৃদ্ধের চোখে দেখেছিল, যে বৃদ্ধকে নিজ হাতে গুলি করে মেরেছিল ও। কিন্তু সেই চোখ—মৃত্যুহীন, দেশকাল অতিক্রম করে আবার দেখা দিয়েছে ওকে।

হৃদয়ের মাঝে ঝাঁপিয়ে নামল মেঘ, হয়তো বৃষ্টি ঝরাবে একটু পরেই।

উঠে দাঁড়াল গ্রেবার, 'আজকে যাই।'

'তাহলে কি ঠিক করলে?' উঠে ওর পিঠে সস্নেহে হাত রাখলেন পোলমান।

'জানি না। দু'হপ্তা সময় আছে এখনও।'

'আবার এসো।' দরজার বাইরে এল ওরা। 'যাবার আগে দেখা করো। আর চিঠি লিখলে ফ্রেজেনবুর্গকে আমার শুভেচ্ছা জানিও।'

'আচ্ছা।'

ইতস্তত করলেন পোলমান। 'তোমার কোন প্রশ্নেরই জবাব দিতে পারলাম না, আর্নস্ট; কিছু বললেও হয়তো এড়িয়ে যাওয়াই হত সেটা। শুধু বলছি, নিজের ওপর বিশ্বাস হারিও না কখনও।'

ম্লানভাবে হাসল শুধু গ্রেবার।

'তুমি হাসছ,' আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল পোলমানের চোখজোড়া, 'আমি হলে প্রতিবাদ করতাম এর।'

'করছি তো প্রতিবাদ, চিৎকার করে, শরীরের সমস্ত অণু-পরমাণু দিয়ে প্রতিবাদ করছি; কিন্তু কেউ শুনতে পাচ্ছে না।'

চোদ্দ

'আজ আমাদের মেন্যুতে চমৎকার একটা জিনিস আছে, স্যার,' খুশি খুশি গলায় জানাল গলা-লম্বা বুড়ো।

'তাই নাকি?' হাসল গ্রেবার, 'আজ তাহলে আমাদের ভার তোমার ওপরে।'

খুশি মনে চলে গেল বুড়ো। টেবিলের নিচ দিয়ে পা-টা টানটান করে দিল গ্রেবার, হেলান দিল চেয়ারে। জীবনটাকে বড় ভাল লাগছে ওর এখন, বড় প্রিয়। মনে হচ্ছে যুদ্ধ থেমে গেছে, শান্তি ফিরে এসেছে, ও ফিরেছে মায়ের বুকে; সূর্য ডুবছে, সমস্ত পত্রপল্লব মেলে দিয়েছে বনভূমি—দিনের শেষ আলোর রাঙা পরশটুকু প্রাণ ভরে উপভোগ করতে। ভাবল গ্রেবার, জীবনের এই দুটো হপ্তাকে ভরে তুলব জীবনের প্রাচুর্যে।

এলিজাবেথকে দেখল ও, আজ ও উল্টোদিকের চেয়ারে বসেছে—খুশিতে উচ্ছল দু'চোখ। জিজ্ঞেস করল সে, 'আজকে অন্য পোশাক কেন?'

হাসল গ্রেবার, 'আসলে পোশাক পাল্টানোর মত জায়গা কিংবা সময়—কোনটাই পেলাম না।'

সকালে ভেবেছিল ও, বিনডিংয়ের ওখান থেকে বদলে নেবে, কিন্তু পোলমানের সাথে কথা বলার পরে ওখানে যেতে একেবারেই ইচ্ছে করল না ওর।

'তুমি ইচ্ছে করলে আমার ঘরেই বদলাতে পারতে,' বলল এলিজাবেথ।

'তোমার ঘরে?' অবাক হলো গ্রেবার। 'ফ্রাউ লিজার···।'

'চুলোয় যাক ফ্রাউ লিজার।'

মদের বোতল নিয়ে ফিরল বুড়ো বেয়ারা। 'আপনাদের জন্যে জোহানিসবার্গের ককসবার্গই নিয়ে এলাম, স্যার। একমাত্র আপনারাই এর মর্ম বোঝেন।' বোতলটা খুলে টেবিলে রাখল সে।

গ্লাস হাতে নিল এলিজাবেথ।

রাতের নিস্তব্ধতাকে খানখান করে দিয়ে আর্তনাদ করে উঠল সাইরেন। রক্ত হিম করা শব্দে মুহূর্তের জন্যে জমে গেল সবাই, তারপরই লাফ দিয়ে উঠল পুরো হলঘর। ঝনঝন করে গ্লাস ভাঙল এলিজাবেথের।

'সবচেয়ে কাছের শেল্টারটা কোথায়?' বুড়ো বেয়ারাকে জিজ্ঞেস করল গ্রেবার।

www.BanglaBook.org

'এই রেস্তোরাঁতেই আছে, স্যার।'

'শুধু মেম্বারদের জন্যে নয়তো সেটা?'

'আপনারাও মেম্বার, স্যার। আমাদের শেল্টারটা যে কোন জায়গার চেয়ে মজবুত। বড়ো বড়ো অফিসাররা আসেন তো এখানে, সেজন্যেই।'

'ধন্যবাদ,' বুড়োকে বলল গ্রেবার, 'আরেকটা গ্লাস নিয়ে এসো।' নিজের গ্লাসে ককসবার্গ ঢেলে এগিয়ে দিল এলিজাবেথের দিকে। 'নাও, পুরোটা খেয়ে ফেলো।' বুঝতে পারছে, এলিজাবেথের দরকার হবে মদটা।

'সেলারে যাবে না?' কাঁপা কাঁপা গলায় জানতে চাইল এলিজাবেথ।

'অনেক সময় আছে এখনও,' ওকে আশ্বস্ত করল গ্রেবার, 'এটা প্রথম সঙ্কেত। হয়তো দেখবে, কিছুই হবে না, গতবার যেমন হয়েছিল।'

টেবিলে গ্লাস দিয়ে গেল বুড়ো। বোতল থেকে ককসবার্গ ঢালল গ্রেবার, লম্বা লম্বা চুমুকে নিঃশেষ করল মদটুকু।

নিশিতে পাওয়া মানুষের মত ঠোঁটে গ্লাস ছোঁয়াল এলিজাবেথ—ওর পলকহীন দৃষ্টি টেবিলে স্থির, হাতটা কাঁপছে থরথর করে; আস্তে আস্তে কোনরকমে মদটুকু শেষ করল। আবার গ্লাস ভরে দিল গ্রেবার।

'আমার ছোট মেয়েটা খুব অসুস্থ, স্যার,' পাশেই দাঁড়িয়েছিল বুড়ো বেয়ারা, হাত কচলে জানাল সে, হয়তো ওদের অনেক কাছের মানুষ মনে হয়েছে তার, তাই দুঃখের কথা বলে বুকটা হালকা করতে চাইছে। 'সবে এগারোয় পা রেখেছে। ফুটফুটে সুন্দর, স্যার, চমৎকার স্বাস্থ্য। ওর মা-টা অবশ্য অনেকদিন থেকে বিছানায়, ডাক্তার বলেছে টিবি। আমাদের সেলারটা, স্যার, ভাল নয়—অনেকদিনের পুরানো। আমি কাছে থাকলে হয়তো সাহায্য করতে পারতাম ওদের, কিন্তু ডিউটি আমার এখানে, এখানেই থাকতে হবে এখন।'

আশপাশের টেবিল ফাঁকা। প্রায় সবাই ছুটেছে সেলারে। চট্ করে পাশের টেবিল থেকে একটা গ্লাস নিয়ে এল গ্রেবার। মদ ঢেলে গ্লাসটা বাড়িয়ে দিল বুড়োর দিকে। 'নাও, আমাদের সাথে খাও একবার।'

'কিন্তু···,' ইতস্তত করছে বুড়ো, 'ডিউটির সময় মদ খাবার নিয়ম নেই, স্যার, আমাদের।'

'ওসব বাদ দাও এখন। আমাদের, সৈনিকদের কথা হলো: যখন করার কিছু নেই, মদ খাও।'

'ধন্যবাদ, স্যার,' কৃতজ্ঞতা জানাল বুড়ো, 'প্রার্থনা করি, আপনার পদোন্নতি হোক, স্যার।'

'মানে?' অবাক হলো গ্রেবার।

'মানে, কর্পোরাল পদে আপনার পদোন্নতি হোক, এটাই কামনা করি, স্যার।'

'ধন্যবাদ,' একটু আড়ষ্টভাবে হাসল গ্রেবার। মনে মনে তারিফ করল বুড়োর, ঠিক ধরেছে ব্যাটা।

'এ রকম দামী মদ এক ঢোকে খেতে চাই না, স্যার।'

'ঠিক আছে, নিয়ে যাও সাথে করে।'

ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেল বুড়ো। আবার গ্লাসদুটোতে মদ ঢালল গ্রেবার।

'ও জানল কি করে?' নিখাদ বিস্ময় এলিজাবেথের চোখে।

'ওদের,' মিটিমিটি হাসল গ্রেবার, 'একেবারে শকুনের চোখ, ঠিক চিনতে পারে সবকিছু। হেড ওয়েটার ফ্রিটস্‌ও দেখার সাথে সাথেই চিনেছিল আমাকে। সেজন্যেই তো দুটো নোট ধরিয়ে দিলাম ওর হাতে। ব্যস, ঝামেলা চুকে গেল।'

'শেল্টারের অফিসাররা যদি চিনতে পারে তোমাকে, তখন?'

'চিনবে না।'

'কেন?'

'কারণ ওরা এখন নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত।' এলিজাবেথের কাঁধে হাত রাখল গ্রেবার।

বারের পাশ দিয়েই নামতে হয় এয়ার-রেইড শেল্টারে। শেল্টারটা নতুন এবং মজবুত—শাদা দেয়াল, মেঝেতে কার্পেট পাতা; চেয়ার, নিচু টেবিল আর সোফা দিয়ে চমৎকার করে সাজানো। একপাশের দেয়ালে র‍্যাক, মদের বোতল আর গ্লাস রাখা তাতে। দেখলে মনেই হয় না, কোন এয়ার-রেইড শেল্টারে এসেছে ওরা।

মনে মনে হাসল গ্রেবার; বড় বড় অফিসারদের উপযুক্ত শেল্টারই বটে!

লোকজন বাড়ছে শেল্টারে। এককোণে সরে এল ওরা। ওদের সামনে বসে আছে অসামান্য সুন্দরী এক মেয়ে—পরনে বকের পালকের চেয়েও শাদা পোশাক, হাতের মুক্তো বসানো বালা থেকে ঝিলিক দিয়ে উঠছে আলো। তার সঙ্গী, টাক মাথা কদাকার এক লেফটেন্যান্ট। সিঁড়ি দিয়ে উগ্র প্রসাধনচর্চিত এক বৃদ্ধা নেমে এল, সাথে আর কয়েকজন অফিসার। বেয়ারারা মদের গ্লাস এগিয়ে দিচ্ছে লোকজনকে।

পেছন থেকে গলা শোনা গেল একজনের, 'দ্বিতীয়বার সাইরেন বেজেছে, তার মানে আসছে ওরা।'

'আমার ভয় করছে,' কেঁপে উঠল এলিজাবেথ।

চেয়ারটা ওর কাছাকাছি নিয়ে এল গ্রেবার। শক্ত করে জড়িয়ে ধরল ওকে। ওর হাতের ভেতরে ভয় পাওয়া চড়ুইয়ের মত থরথর করে কাঁপছে এলিজাবেথ। বুঝেছে, দ্বিতীয় সংকেতের সাথে সাথে এগিয়ে আসছে মৃত্যুর কালো থাবা।

আরও নিবিড় করে ওকে জড়িয়ে ধরল গ্রেবার, ভালবাসার উষ্ণ স্রোত বয়ে গেল ওর শিরায় শিরায়।

ভূমিকম্পের মত মৃদু কাঁপুনি জানান দিল প্রথম বোমার। পরক্ষণেই কলজের ভেতরে ছুরি গাঁথল বিস্ফোরণের অস্পষ্ট আওয়াজ। ঘরের ভেতরে বেড়ে উঠল গুঞ্জন।

হঠাৎ, একেবারে কাছে, পর পর তিনটে বিস্ফোরণে প্রচণ্ডভাবে কেঁপে উঠল পুরো শেল্টার। কে যেন সাহস দিতে চাইল সবাইকে, 'ভয়ের কোন কারণ নেই, ওগুলো অনেক দূরে...'

www.BanglaBook.org

কথা শেষ হয়নি তার, শব্দও শোনেনি ওরা, চোখের পল্লকে দেয়ালের এ মাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত শত সহস্র শাখা প্রশাখা নিয়ে ছুটে গেল ফাটল, একই সাথে কমে গেল আলোটা, ঠিক যেন ফিল্ম কেটে গেছে সিনেমার। কাছেই কোথাও হুড়মুড় করে ধসে পড়ল দেয়াল।

পুরো দৃশ্যটা মনে হলো মন্থরগতির একটা সিনেমা—স্থির হয়ে বসে সেই শ্বেতশুভ্র সুন্দরী, হঠাৎ লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল; দৃশ্যান্তর, ছুটছে মেয়েটা, আর্তনাদ করছে, লোকজন চেষ্টা করছে ওকে ধরতে; আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে আলো, নিবে গেল একসময়, সাথে সাথে অন্ধকারে হাজারগুণ বেড়ে উঠল যেন আর্তনাদ—সৃষ্টির মরণ আর্তনাদ—মনে হলো, সমস্ত শেল্টারটা যেন ডুবছে, ডুবছে সাগরের অতল অন্ধকারে।

হৃদয়ের একেবারে কাছাকাছি রাখল গ্রেবার এলিজাবেথকে। ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'ভয় পেয়ো না, সোনামণি।'

ওর গলা জড়িয়ে ধরল এলিজাবেথ, গ্রেবার মুখ রাখল ওর নরম চুলে।

'আলো,' একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'আলো আনো একটা। মোমবাতি, টর্চ কিচ্ছু নেই কারও কাছে?'

অন্ধকারকে গাঢ় করে দিয়ে জ্বলে উঠল কয়েকটা ম্যাচের কাঠি—গভীর জঙ্গলে লুটেরার উন্মসিত হিংস্র মশালের মত; থিরথির করে কাঁপল সে মশাল, দৃশ্যমান হলো লোকগুলোর আঙুল, মুখের অংশবিশেষ, যেন ওটুকু ছাড়া শরীরের আর কিছু নেই ওদের।

টাইফুনের প্রচণ্ডতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ধ্বংস, বিস্ফোরণের তাণ্ডবে মাটি ফুঁড়ে শূন্যে উঠে গেল শেল্টারটা, নাকি মাটির নিচেই থাকল, জানে না গ্রেবার। বোমার আওয়াজ, চিৎকার, আর্তনাদ, দেয়াল ভেঙে পড়ার শব্দ—এই কি মহাপ্রলয়? ঝনঝন শব্দে গ্লাস ভাঙল কোথাও; গ্রেবারের মনে হলো, ওর ধমনী থেকে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে লাল যৌবন, চোখের সামনে একে একে ভেসে গেল ছোটবেলার স্মৃতি। আমি কি মারা যাচ্ছি?—ভাবল ও।

শাদা আলো দেখা গেল দূরে, টর্চ হাতে নেমে আসছে কেউ। বিস্ফোরণের শব্দ থেমে গেছে, শুধু থামেনি সেই শ্বেতবসনা মেয়েটার আর্তনাদ—দু'জন লোক ধরে আছে তাকে, সে উন্মাদের মত আঁচড়ে খামচে ছাড়ানোর চেষ্টা করছে নিজেকে, সেইসাথে একনাগাড়ে চলছে তার চিৎকার।

বুকের মধ্যে এলিজাবেথকে চেপে ধরে আছে গ্রেবার, কানে হাত চাপা দিয়ে রেখেছে এলিজাবেথের, যেন চিৎকারটা শুনতে না পায় সে। রক্ত আর পোড়া গন্ধে ভরা বাতাসে শ্বাস নিচ্ছে ওরা।

মেয়েটার চিৎকার থেমে গেছে, জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে সে। শেল্টারে কবরের নিস্তব্ধতা, বাইরে বিমানবিধ্বংসী কামানের অবিশ্রান্ত আর্তনাদ।

'এখনই বাইরে যাবেন না,' সতর্ক করল একজন।

ওপর থেকে গড়িয়ে এল টর্চের আলো।

'আগুন, আগুন,' জ্ঞান ফিরে পেয়েই আবার চিৎকার শুরু করল মেয়েটা,

পুরোপুরি অপ্রকৃতিস্থ সে এখন।

দেয়াল বেয়ে ছাতে উঠল আলো।

'কে ওখানে?'

'আমি ফ্রিটস্, হেড ওয়েটার,' জবাব এল ওপর থেকে, 'ঘরগুলোর অবস্থা দেখছি, খাবার ঘরটা একেবারে গেছে, স্যার।'

'ওসব বাদ দিয়ে এসো শিগগির,' ধমকে উঠল একজন অফিসার, 'এখানে অজ্ঞান হয়ে গেছে একজন!'

এলিজাবেথের ওপর দিয়ে হেঁটে গেল আলো, স্থির হলো মেঝেতে পড়ে থাকা দেহের ওপরে। চমকে উঠল ওরা, সেই উগ্র সাজপোশাক পরা বৃদ্ধা—শুয়ে আছে থই থই সমুদ্রে স্থির হয়ে।

এলিজাবেথের মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে রাখল গ্রেবার। ওর কানের কাছে গভীর আবেগে ফিসফিস করল, 'তোমাকে গ্রামের দিকে নিয়ে যাব আমি, সেখানে এসব কিছু নেই।' গ্রেবারের বুকে মুখ ঘষল এলিজাবেথ।

'তোমাদের কাছে স্ট্রেচার আছে?' জিজ্ঞেস করল একজন মেজর।

'আছে, স্যার,' জানাল ফ্রিটস্। ঢোক গিলল সে।

'চলো আমার সাথে।'

ওরা চলে যেতেই সমস্ত আতঙ্ক নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল অন্ধকার। বদ্ধ বাতাসে দম বন্ধ হয়ে যেতে চাইছে সবার।

একটু পরে আবার আলো দেখা গেল সিঁড়ির মাথায়—লণ্ঠন হাতে নামছে মেজর, পেছনে স্ট্রেচার নিয়ে দু'জন বেয়ারা।

'আগুন, আগুন,' মেয়েটার সহসা চিৎকারে কলজেটা ধড়াস করে উঠল গ্রেবারের, মেয়েটার কথা মনে ছিল না কারও।

'মরফিয়া দিতে হবে বোধ হয়,' লেফটেন্যান্টের বিব্রত গলা শোনা গেল। 'কোন ডাক্তার···'

'এখানে নিয়ে এসো স্ট্রেচার,' লেফটেন্যান্টকে পাত্তাই দিল না মেজর। 'সাবধানে তোলো ওঁকে, মাথা আগে! ফ্রিটস, তুমি দেখো বাইরে অ্যাম্বুলেন্স পাও কিনা, শিগগির!'

'জ্বী, স্যার।' ছুটতে ছুটতে চলে গেল ফ্রিটস্। ওর পেছনে পেছনে স্ট্রেচার বয়ে নিয়ে গেল বেয়ারা দু'জন।

'ও কি মারা গেছে?' গ্রেবারের বুক থেকে মুখ তুলল এলিজাবেথ, চোখদুটো ভেজা ওর।

'না,' সস্নেহে ওর মাথায় হাত বোলাল গ্রেবার, 'দেয়ালে ধাক্কা খেয়েছে, সম্ভবত, নয়তো ভাঙা কাচে এই অবস্থা। চলো, যাই এবার।'

সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল দু'জন। হঠাৎ খেয়াল হলো এলিজাবেথের, মাথায় হ্যাটটা নেই ওর।

স্ট্রেচারবাহক বেয়ারা দু'জন দাঁড়িয়ে আছে বাইরে, স্ট্রেচারটা পায়ের কাছে রাখা। আশপাশে কেউ নেই।

www.BanglaBook.org

চলে যেতে যেতে কি মনে করে হঠাৎ পিছু ফিরল গ্রেবার, হাত রাখল একজনের কাঁধে। চমকে ঘুরে দাঁড়াল ছেলেটা।

'বুড়ো বেয়ারাকে কোথায় পাওয়া যাবে?' জিজ্ঞেস করল গ্রেবার।

'কে, অটো না কার্ল?'

'ওই যে রোগামত, লম্বা-গলা।'

'বুঝেছি,' ছলছল করে উঠল ছেলেটার চোখদুটো, 'অটো; ও মারা গেছে, স্যার।'

বুকের ভেতরে যেন তপ্ত শিক ঢুকিয়ে কেউ মোচড় দিল গ্রেবারের; কয়েক মুহূর্ত কোন কথা সরল না ওর। কথাটা যেন শোনেইনি, অতি কষ্টে আবার জিজ্ঞেস করল, 'কি বললে?'

'মারা গেছে, স্যার। বারে ডিউটি ছিল ওর, বড় একটা ঝাড়বাতি সোজা ওর মাথায় ছিঁড়ে পড়েছে।'

চুপচাপ দাঁড়িয়ে কষ্টটা পুরোপুরি জমতে দিল গ্রেবার, বুকের গহীনে জ্বলন্ত পেরেক নিয়ে বলল, 'ও এক বোতল মদের দাম পেত আমার কাছে।'

'ইচ্ছে করলে,' জানাল বেয়ারা, 'আমার কাছেও দিতে পারেন, স্যার। কি মদ?'

'জোহানিসবার্গের ককসবার্গ।'

পকেট থেকে মূল্যতালিকা বের করল বেয়ারা, দেখে নিয়ে জানাল, 'চার মার্ক, সার্ভিস চার্জ ধরে চার-চল্লিশ, স্যার।'

মানিব্যাগ থেকে টাকা বের করল গ্রেবার। জানে, পুরোটাই বেয়ারার পকেটে যাবে, তবুও বিল চুকিয়ে দিয়ে অনেকটা শান্তি পেল ও। মনের কাছে এটুকু অন্তত সান্ত্বনা থাকল, বুড়ো বেয়ারাকে ফাঁকি দেয়নি ও।

আগুনে পুড়ছে জার্মানি, সেইসাথে পুড়ছে সুখ, শান্তি, ভবিষ্যৎ, মূল্যবোধ; বাকি সে রক্ত, মৃত্যু আর বারুদের গন্ধ, গন্ধ হিংস্রতা আর পাশবিকতার।

'তোমাদের বাড়িটা দেখে আসি, চলো,' নরম গলায় প্রস্তাব করল গ্রেবার।

'তার জন্যে অনেক সময় পড়ে আছে,' বলল এলিজাবেথ, 'চলো, বসি কোথাও।'

পার্কে এসে বসল ওরা। তেমন ঠাণ্ডা নেই। ওভারকোটটা খুলে রাখল গ্রেবার। ভাঁজ করতে গিয়ে টুংটাং শব্দ হতেই অবাক হলো ও। কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনল দুটো কনিয়্যাকের বোতল। 'নিশ্চয়ই রয়টারের কাজ,' হাসল গ্রেবার। 'একেই বলে কপাল!'

'কপাল না ছাই,' দুষ্টুমি করল এলিজাবেথ, একটু আগের বীভৎস স্মৃতি যেন মুছে গেছে ওর মন থেকে। 'কোত্থেকে না কোত্থেকে চুরি করে এনেছ!'

'দেখো,' চোখ পাকাল গ্রেবার, 'চোর বলবে না। খাঁটি সৈনিক কখনও চুরি করে না; দরকার পড়লে অবশ্য ছিনিয়ে নেয়।'

হাসতে হাসতে ওর বুকে লুটিয়ে পড়ল এলিজাবেথ। 'দাও, তোমার

কনিয়্যাক।'

দুটো বোতলেরই ছিপি খুলল গ্রেবার। বলল, 'এই তো চমৎকার কথা, যখন করার কিছু নেই, তখন মদ খাও।'

থরথর করে কেঁপে উঠল এলিজাবেথ, ছিটকে সরে এল গ্রেবারের বুক থেকে। হাহাকার প্রতিধ্বনিত হলো ওর কণ্ঠে, 'আবার কেন বুড়ো বেয়ারার কথা মনে করিয়ে দিলে!'

গভীরতর দুঃখ নিয়ে গাঢ় হলো রাত।

গ্রেবারের কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে এলিজাবেথ। অবারিত রূপের ভাণ্ডার নিয়ে বিশাল চাঁদ উঠেছে আকাশে, জ্যোৎস্নায় অপরূপা পার্ক যেন রূপকথার মায়াবী বন, একপাশে হেলে পড়া গাছ, পত্র-পল্লবে, ফুলে ফুলে মঞ্জরিত—প্রকৃতির অকৃপণ হাতে সাজানো।

ছোট্ট একটু কথা, 'এই, দেখো!'

'দেখেছি।'

উঠল এলিজাবেথ, হেঁটে গেল গাছটার কাছে। গ্রেবারের মুগ্ধ চোখের সামনে, অপার্থিব জ্যোৎস্না-ধোয়া ঘাসে ঘাসে পা ফেলে এগিয়ে গেল স্বর্গলোক থেকে নেমে আসা এক রহস্যময়ী। অপলকে শুধু দেখল গ্রেবার, জ্যোৎস্নায় ভেসে তার যাওয়া-আসা!

হাতে একগুচ্ছ ফুল এলিজাবেথের। মায়াবী জ্যোৎস্নায় গাঢ় সঙ্গীত বেজে উঠল ওর কণ্ঠে, 'এটা কোন্ ঋতু, জানো? বসন্ত। দেখো, ফুলগুলো কী সুন্দর!'

'সুন্দর,' বিষণ্ণ ভেজা কণ্ঠ গ্রেবারের। 'যতই দেখি গাছদের, মুগ্ধ হই; কত কিছুই যে শেখাতে পারে ওরা আমাদের! কতদিন দেখেছি, তুষার পড়ছে, পাতা ঝরে গেছে—রুক্ষ, জীর্ণ, হয়তো মুখ থুবড়ে পড়েছে মাটিতে, তবুও চিরসহিষ্ণু সে; যখনই সুযোগ পেয়েছে, একটা শেকড় অন্তত নামিয়ে দিয়েছে মাটির গভীরে, জীবনের গভীরে; আর কিছু নয়, শুধু ফুল ফোটাবে বলে।'

মুগ্ধ বিস্ময়ে এলিজাবেথ তাকিয়ে রইল গ্রেবারের চোখে। আর গ্রেবার দেখল, রুপোলি জ্যোৎস্না, জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত অতলান্ত দুটি চোখ, কপাল, গড়িয়ে নামা জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ মাধুরী। কুঁড়ির রহস্য নিয়ে প্রতীক্ষায় থাকা একটি মুখ।

আস্তে আস্তে কাছাকাছি এল হৃদয়, গাছটা সরে গেল উঁচুতে, আকাশের গায়ে ফুলভারাবনতা শাখার মিলন-বাসর, ওদের চারপাশে কচি সবুজ পল্লবের স্নিগ্ধ পরশ; আর গ্রেবারের হৃদয়ের সাথে ধীরে ধীরে এক হয়ে গেল আরেকটি হৃদয়।

পনেরো

লঙ্কাকাণ্ড বেধে গেছে আটচল্লিশ নম্বর তাঁবুতে। হৈচৈ, চেঁচামেচিতে কান পাতা দায়। ব্যাপারটা কিছুই নয়, ছুটি শেষে তিনজনকে ফিরতে হচ্ছে ফ্রন্টে, ফলে ওদের

www.BanglaBook.org

মনের যত ঝাল ঝাড়ছে অন্যদের ওপরে। যতবার দেখছে শুয়ে থাকা রয়টার কিংবা ফেল্ডমানকে, ততবারই মেজাজটা খিঁচড়ে যাচ্ছে ওদের। ওদের ভেতরে একজন খেপে একেবারে টং। শেষ পর্যন্ত অন্য দু'জন টানতে টানতে বের করে নিয়ে গেল তাকে।

'বেচারার অবস্থা আসলেই কাহিল,' ওরা চলে যেতেই মন্তব্য করল ফেল্ডমান, 'আমাকে শুয়ে থাকতে দেখলেই খেপে যেত ও।'

'সেজন্যে নয়।' রুমেলের কণ্ঠস্বরে স্তব্ধ হয়ে গেল চারপাশটা। এখানে আসার পরে এই প্রথম কোন কথা বলল সে। 'আসলে এ পর্যন্ত তেইশ মার্ক হেরেছে ও। নিজে খেলেনি, কিন্তু বাজি ধরে প্রত্যেকবার হেরেছে। আমার উচিত, ওকে টাকাটা ফিরিয়ে দেয়া। তেইশ মার্ক, আজকালকার বাজারে অনেক টাকা।'

'বেশ তো,' বাক্যস্ফূর্তি হলো রয়টারের, 'গাড়ি ছাড়েনি এখনও। ওকে দিয়ে আসতে পারো টাকাটা।'

কোন কথা না বলে ব্যস্ত পায়ে বেরিয়ে গেল রুমেল।

'কোন লাভ নেই ফেরত দিয়ে,' ঠোঁট ওল্টাল গ্রেবার, 'ফ্রন্টে গিয়েই উড়িয়ে দেবে ও টাকা।'

'আমার কিন্তু ধারণা,' রহস্যপূর্ণ হাসি হাসল রয়টার, 'ও খেপেছে ওর বউয়ের জন্যে। এসেই নাকি বুঝেছে, বউটা ওর অন্তঃসত্ত্বা, তার মানে ও ফিরে যাবার সাথে সাথে...' একটা চোখ একটু টিপে, কথাটুকু শেষ না করে যোগ করল, 'ও পচে মরবে ফ্রন্টে, আর ওর বউ ফষ্টিনষ্টি করবে আর দম্পতি-ভাতা পাবে, কথাটা ভাবলেই মাথায় রক্ত চড়ে যায় ছোকরার।'

'দম্পতি-ভাতা?' অবাক হলো গ্রেবার, 'সে আবার কি?'

'তুমি আছ কোথায়?' বিছানায় উঠে বসল ফেল্ডমান, 'মাস শুরু হলেই কড়কড়ে দু'শো মার্ক। ছুটিতে আসা সৈনিকরা তো প্রায় চোখকান বুজে বিয়ে করে ফেলছে।'

'ভাল কথা,' কথার মাঝখানে হঠাৎ অন্য প্রসঙ্গ আনল রয়টার, 'বলতে ভুলে গেছি, বিনডিং এসেছিল।'

'কিছু বলেছে?'

'কি নাকি একটা উৎসব আছে, তোমাকে অবশ্যই যেতে বলেছে।

'আর কিছু?'

'না।'

হতাশ হলো গ্রেবার। বড়ো আশা করেছিল, হয়তো ওর বাবা-মার খবর পাবে।

রুমেল ফিরল।

'পেয়েছিলে?' জানতে চাইল ফেল্ডমান।

ওপর-নিচ মাথা ঝাঁকাল রুমেল। বসে পড়ে তাস উঠিয়ে নিল হাতে।

কাঁধ ঝাঁকাল রয়টার। গ্রেবারের দিকে ফিরল সে, 'তোমার ছুটি আর কতদিন?'

'এগারো দিন।'

'অনেক সময় তাহলে।'

বুক খালি করা দীর্ঘশ্বাস ফেলল গ্রেবার। 'গতকাল সকাল পর্যন্ত আমারও তাই মনে হয়েছিল।'

'বাড়িতে কিন্তু কেউ নেই, আমি ছাড়া,' দুষ্টু একটা হাসি জ্বলজ্বল করছে এলিজাবেথের চোখের কোণে।

'তাই নাকি?' খুশিতে প্রায় লাফিয়ে উঠল গ্রেবার। 'কোথায় গেছে সব?'

'ফ্রাউ লিজার তার মেয়েকে নিয়ে গ্রামে গেছে পার্টির চাঁদা আদায় করতে; কাল রাতের আগে ফিরছে না।'

'বলো কি!' আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে গোটাকয় চুমু দিয়ে ফেলল গ্রেবার এলিজাবেথকে।

'কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত সময় কিন্তু আমাদের হাতে,' দুষ্টুমিভরা হাসিটা আরও উজ্জ্বল হলো এলিজাবেথের।

'কেন, কাল কাজে যেতে হবে না?'

'না, শনিবার অর্ধেক, রোববার পুরো দিন ছুটি।'

'আগে বলবে তো। কত বছর যে দিনের আলোয় দেখি না তোমাকে!'

'তাই তো!' অবাক হলো এলিজাবেথ। 'আমারও সেই একই কথা, আসলে নিশাচর হয়ে গেছি আমরা।'

'ঠিক আছে, কাল সকালে দিনের প্রথম আলোয় তোমার সামনে এসে রাজপুত্রের মত দাঁড়াব আমি,' দুষ্টুমি করল গ্রেবার, 'তখন কেমন লাগবে?'

'সে কাল দেখা যাবে,' খিলখিল ঝর্নাধারা বইল হাসিতে, 'আজ রাতে কোথায় যাবে, সেটা বলো।'

'জার্মেনিয়ায়?'

নিমেষে কালো ছায়া নামল এলিজাবেথের চোখে। 'আমি আর কোনদিন যাচ্ছি না ওখানে।'

'তাহলে?'

'কিচ্ছু করতে হবে না। চুপচাপ বসে থাকো এখানে, তোমার জন্যে কিছু রান্না করে আনি।' একটু চুপ করে থেকে জানাল, 'অবশ্য বিশেষ কিছুই নেই। কুপন ছাড়া তো কিছুই পাওয়া যায় না আজকাল।'

'চলো, আমিও যাই।' এলিজাবেথের পিছু পিছু রান্নাঘরে এল গ্রেবার।

প্রায় ভারহীন রান্নাঘরের তাক, খাঁ খাঁ শূন্যতায় শুধু বুকে ধরে আছে একটুকরো রুটি, একটুখানি মাখন, দুটো ডিম আর গোটাকয় পচা আপেল।

করুণ চোখে গ্রেবারের দিকে চাইল এলিজাবেথ। 'নিজেই তো দেখছ অবস্থাটা! কয়েকটা কুপন আছে, দেখি...'

কথা শেষ করতে না দিয়ে ওকে টেনে বাইরে নিয়ে এল গ্রেবার। 'তোমার কিছু ভাবতে হবে না! আমি দেখছি কি করা যায়।'

www.BanglaBook.org

'তুমি আবার কোথায় দেখবে?'

হাসল গ্রেবার। কৌতুকে চকচক করে উঠল চোখজোড়া। যাদুকরের ভঙ্গিতে হাতদুটো বাতাসে নাড়ল ও, 'সৈনিকের হাত, দেখো কি করতে পারে।'

'আরে, এসো এসো,' দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এল বিনডিং। 'তোমার কথাই ভাবছিলাম। জানো না তো, আজ আমার জন্মদিন। আরও ক'জনকে আসতে বলেছিলাম, সবাই প্রায় এসে গেছে।'

চট করে বাইরের ঘরে উঁকি দিল গ্রেবার—ধোঁয়ায় প্রায় অন্ধকার; ঘুরে বিনডিংয়ের মুখোমুখি হলো ও, 'আজ কিন্তু থাকতে পারছি না, দুঃখিত। অত্যন্ত জরুরী কাজ আছে একটা। আমি এসেছি শুধু তোমাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে।'

'ওসব শুনছি না আমি।' এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ল বিনডিং।

'বিশ্বাস করো,' প্রাণপণে পাশ কাটাবার চেষ্টা করছে গ্রেবার, 'এক্ষুণি যেতে হবে আমাকে। তোমার খবর পাবার আগে কথা দিয়ে ফেলেছি আমি।'

'দিয়েছ, ফিরিয়ে নাও,' সহজ সমাধান বিনডিংয়ের, 'বলবে জরুরী মীটিং ছিল, কিংবা গেস্টাপোতে যেতে হয়েছিল বিশেষ কাজে। ভেতরে দু'জন গেস্টাপোর অফিসারও আছে, চলো, আলাপ করিয়ে দিই। চাইলে তোমার সে লোককেও নিয়ে আসতে পারো এখানে।'

'তা হয় না।'

'খুব হয়। চলো, চলো।'

প্রমাদ গুণল গ্রেবার। বুঝল, সত্যি কথা বলা ছাড়া উপায় নেই। বলল, 'একেবারে সত্যি কথা বলছি তোমাকে, আজ যে তোমার জন্মদিন, জানতাম না। আমি এসেছি তোমার কাছে কিছু খাবার চাইতে, এবং সেটা পেলে এখুনি ফিরে যেতে হবে আমাকে।'

ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল বিনডিং। 'নাহ্, তোমার আশা বহু আগেই ছাড়া উচিত ছিল আমার।' হাসল সে। 'কিন্তু,' চোখ টিপল বিনডিং, 'একজোড়া স্বর্গের অপ্সরী আছে ভেতরে, ওদের একজন বন্দীশিবিরে মেয়েদের ওয়ার্ডেন: সে নাকি আবার যুদ্ধ ফেরতা সৈনিকদের দারুণ পছন্দ করে, চলবে নাকি?'

'নাহ্,' হাসল গ্রেবার।

'তাহলে অন্যজন?'

'তা-ও নয়।'

'ব্যস, ব্যস, আর বলতে হবে না,' ওর কাঁধে জোরে চাপড় মারল বিনডিং, 'তার মানে আরও সুন্দরী কাউকে জুটিয়েছ। ঠিক আছে, চলো রান্নাঘরে, দেখি তোমার ভাগ্যে কি জোটে।'

ফ্রাউ ক্লাইনার্টকে পাওয়া গেল ওখানে। তাকে খাবারের একটা বড়োসড়ো প্যাকেট করতে বলে স্টোররুমে এল ওরা। ভেতরের অবস্থা দেখে চোখ কপালে উঠল গ্রেবারের—থরে থরে সাজানো খাবার: ফ্রান্স থেকে আনা কাছিমের ডিম,

হল্যাণ্ডের তরতাজা শাকসবজি, চেকোশ্লোভাকিয়ার মটরশুঁটি, পোল্যাণ্ডের হ্যাম, ডেনমার্কের মাখন আর পনির, নানা ধরনের ফলের রস, আরও যে কত কি গুণে শেষ করতে পারল না ও। কোন খাবারের দোকানেও এতসব থাকে না বোধ হয়। এলিজাবেথের রান্নাঘরের খাঁ খাঁ শূন্য তাক মানসপটে একবার ভেসে উঠল ওর।

প্রত্যেকটা জিনিস দুটো করে নামাল বিনডিং। স্ট্রবেরির একটা টিন ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে অর্থপূর্ণ হাসি হাসল সে, 'বিশেষ সময়ে মেয়েরা আবার এই জিনিসটা বিশেষভাবে পছন্দ করে।'

একপাশে অসংখ্য মদের বোতল, বেছে বেছে কয়েকটা বোতল আলাদা করে রান্নাঘরে নিয়ে এল বিনডিং। 'ফ্রাউ ক্লাইনার্ট, এগুলো আর স্টোররুমে রাখা জিনিসগুলো আলাদা আলাদা প্যাকেটে দেবেন, সাথে আধ পাউণ্ড ভাল বীন কফি। সাবধানে প্যাকেট করবেন।' গ্রেবারের দিকে ফিরল সে, 'আর কিছু?'

'আরে না, না,' তাড়াতাড়ি বলল গ্রেবার, 'এগুলোই বয়ে নিতে পারলে হয়!'

'ভুলে যেয়ো না, তুমি আমার ছোটবেলার বন্ধু। সে হিসেবে এটুকু তো সামান্যই; তাছাড়া আজকে আমার জন্মদিন।' একটু বিরতি দিয়ে আবার চোখ টিপল সে, 'কফিটা কাল সকালের জন্যে! আর কাল রাতের আগে তাঁবুতে ফিরবে না কিন্তু! এখন চলো, আজকের দিন উপলক্ষে এক গ্লাস হয়ে যাক।' গ্রেবারের হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলল বিনডিং।

জিনিসপত্র দেখে এলিজাবেথের চোখ ঠিকরে পড়ার যোগাড়। ওদিকে মিটিমিটি হাসছে গ্রেবার, এলিজাবেথের বিস্ময়টুকু খুব উপভোগ করছে।

'অসম্ভব,' অনেকক্ষণ পরে বাক্যস্ফূর্তি হলো এলিজাবেথের, 'এতসব রান্নাঘরে রাখাই যাবে না। ফ্রাউ লিজার দেখলেই হয়েছে, কালোবাজারীর তালিকায় নাম উঠে যাবে আমার।'

'তাই তো,' মাথা চুলকালো গ্রেবার, 'এক কাজ করি। প্রায় দু'দিন সময় তো আছে হাতে, যেটুকু পারি প্রাণভরে খাই, বাকিটুকু ওই ডাইনীকে দিয়ে দিলেই হবে।'

'হবে না। সে নিজের কুপনে যা পায় সেটুকু নিয়েই খুশি, এবং তার জন্যে গর্বও অনুভব করে।'

'কর, না খেয়ে কত গর্ব করবি, কর,' বিদ্রূপ করল গ্রেবার, 'তোমার বইয়ের তাকের পেছনে, যেখান থেকে সেদিন গ্লাস বের করেছিলে, লুকিয়ে রাখো না কেন?'

'চমৎকার বুদ্ধি,' খুশি হয়ে উঠল এলিজাবেথ।

'কিন্তু,' নিজের যুক্তিতেই ফাঁক বের করল গ্রেবার, 'যদি গন্ধ পায়?'

'বাইরে যাবার সময় ঘর বন্ধ করে যাব।'

'যদি ডুপ্লিকেট চাবি থাকে?'

'তাই তো!' মুষড়ে পড়ল এলিজাবেথ।

'ধুৎ, বাদ দাও ওসব,' পরিবেশটা হালকা করার চেষ্টা করল গ্রেবার,

www.BanglaBook.org

'তখনকার কথা তখন ভাবা যাবে। এখন চোয়ালের ব্যায়াম শুরু করো দেখি। বোতলগুলো সারি দিয়ে সাজিয়ে রাখো, দেখে যেন মনে হয় বন্ধুর দেয়া জন্মদিনের উপহার।'

'কার জন্মদিন?' খিলখিল করে হাসল এলিজাবেথ।

'ধরো, এই মুহূর্তের জন্মদিন, এই মহালগ্নের, যে লগ্নে শুধু তুমি আর আমি আছি, সুখ আছে, শান্তি আছে!'

গ্লাসে শ্যাম্পেন ঢালল এলিজাবেথ। আজকে যেন ওকে আরও সুন্দর লাগছে গ্রেবারের। শ্যাম্পেনটুকু শেষ করে উঠে দাঁড়াল ও। কাছে গিয়ে এলিজাবেথকে টেনে নিল বুকে; আর সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে অনুভব করল অতল প্রশান্তিতে, ওর উষ্ণ আলিঙ্গনের আড়ালে, বুকের মাঝখানে নিবিড় হয়ে প্রবেশ করল এলিজাবেথ। দ্বিতীয় একটি জীবন উন্মুক্ত হলো ওর হৃদয়ের মাঝখানে—নিজের জীবনের চেয়ে রঙিন, সহজ, প্রগাঢ় শান্তিতে ছাপানো দু'কূল; যেখানে যুদ্ধ নেই, গোলার গর্জন নেই, অপরাধবোধ নেই, নেই অতীত, নেই অনাগত, আছে শুধু বর্তমান—নিটোল, পরিপূর্ণ, স্বপ্নের মত।

জানালাগুলো হাট করে খোলা। গতরাতের আক্রমণে গোটাকয়েক কাচ ভেঙেছিল, এলিজাবেথ কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে দিয়েছে সে ফাঁকগুলো। জানালায় রঙিন, উজ্জ্বল পর্দা, পালের মত ফুলে উঠছে বসন্তের মাতাল বাতাসে।

আলোটা নেবানো; রাস্তা থেকে ভেসে আসছে ভারী বুটের আওয়াজ, দূরে কোথাও রেডিও বাজছে, দড়াম করে দরজা বন্ধ করল কেউ, ট্যাঁ ট্যাঁ করে চিৎকার জুড়ল একটা বাচ্চা।

'সারা শহর ঘুমোতে যাচ্ছে,' ফিস্‌ফিস্ করল এলিজাবেথ।

বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে আছে ওরা, পাশের টেবিলে আধখালি কনিয়্যাকের বোতল।

হাতের গ্লাসটা নামিয়ে রাখল গ্রেবার। নিজেকে অসম্ভব সুখী লাগছে ওর, মনে হচ্ছে, ও শুয়ে আছে ছোট্ট কোন উপত্যকায়, সবুজ কোমল ঘাসের গালিচায়; ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে উপত্যকা—বসন্তের মাতাল হাওয়ায় উচ্ছল, প্রজাপতির তুমুল হুটোপুটি ফুল থেকে ফুলে, কোথাও গান গাইছে পাহাড়ী ঝর্না।

'একটু পরে চাঁদ উঠবে, দেখো।'

চাঁদ উঠবে, ভাবল গ্রেবার, সে আলো বাজবে আমার প্রাণের তন্ত্রীতে।

আবছা আলোর আভা পড়ল জানালায়, সরে গেল কাঁপতে কাঁপতে।

'কি ব্যাপার?' উঠে জানালার কাছে গেল এলিজাবেথ। চাঁদের আলো নেমে এসেছে ওর নগ্ন সৌন্দর্যে, জড়িয়ে ধরেছে কোমল মায়ায়।

'জানো,' ঘুরে দাঁড়াল এলিজাবেথ, গভীর বিষাদখিন্ন কণ্ঠস্বর ভেসে এল আলোয় ঘেরা গাঢ় অন্ধকারে, 'প্রতিবার বিমান আক্রমণের পরে মনে হয়, ফিরে গিয়ে দেখব, পুড়ে ছাই হয়ে গেছে এই বাড়ি এই ঘর, এই আসবাবপত্র, পুরানো স্মৃতি—সব, সবকিছু—যা কিছু ভয়ের, বিষণ্ণতার, ঘৃণার। শুধু রয়ে গেছে বাবার স্মৃতি। আমার

মনে হয়, যদি ধ্বংস হয়ে যেত বাড়িটা, নতুন করে আমি শুরু করতে পারতাম সব।'

শ্যাম্পেনের বোতলদুটো নিয়ে এসে বিছানায় বসল ও। 'গ্লাস লাগবে নাকি?'

'লাগবে না মানে?' হাসল গ্রেবার, 'গ্লাস ছাড়া শ্যাম্পেন চলে নাকি? রীতিমত প্যারিস থেকে শিখে এসেছি।'

'সত্যি?' অবাক হলো এলিজাবেথ, 'তুমি প্যারিসে গিয়েছিলে? কতদিন ছিলে ওখানে?'

'গিয়েছিলাম যুদ্ধের প্রথম দিকে; দিন পনেরো ছিলাম!'

'ওরা তোমাদের খুব ঘৃণা করত, তাই না?'

'হয়তো।'

আলোর দিকে গ্লাসটা তুলে ধরল এলিজাবেথ। মোহিনী আলোয় ঝিঁক্ করে উঠল স্ফটিকের পানপাত্র। 'মনে হয়,' গ্লাসে চুমুক দিল ও, 'সেদিন আমিও তোমার সাথে প্যারিসে ছিলাম।'

হাসল গ্রেবার। 'যুদ্ধের পরে হয়তো ওখানে যাব আমরা।'

'ঢুকতে দেবে ওরা?'

'কেন নয়? আমরা তো তেমন ক্ষতি করিনি ওদের, অন্তত অন্যান্য দেশের তুলনায় তো কিছুই করিনি প্রায়।'

'তবু যতটুকু করেছ, তার জন্যে বহু বহুদিন ওরা ঘৃণা করবে আমাদের।'

বুক খালি করা দীর্ঘশ্বাস ফেলল গ্রেবার। 'রক্তের দাগ কি শুকায়? এক, দুই, তিন—ক'টা প্রজন্ম যে লাগবে মানুষের এই যুদ্ধের স্মৃতি ভুলতে, ক'টা সভ্যতা যে লাগবে মানুষের যুদ্ধ ভুলতে?' আর্ত হাহাকার ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হলো ওর কণ্ঠে।

'অন্য কোন দেশে যেতে পারি না আমরা, যে দেশের কোন ক্ষতি হয়নি?'

'তেমন দেশ হয়তো পৃথিবীতে নেই।' গ্লাসটা নিঃশেষ করে আবার ভরে নিল গ্রেবার।

'তুমি অন্য কোথাও গিয়েছ?' নরম গলায় জানতে চাইল এলিজাবেথ।

'আফ্রিকায়।'

'ওখানে অনেক কিছু দেখেছ, তাই না?'

'দেখেছি, তবে সে আমার স্বপ্নের আফ্রিকা নয়।'

বাইরে জ্যোৎস্না ঢালছে চাঁদ, ভেতরে আধো অন্ধকার, অন্ধকারে ও আর এলিজাবেথ, হাতে স্ফটিকের পাত্র, রূপালি মদিরা—যেন অবাস্তব সবকিছু; ঘরের ভেতরে যেন গোধূলির আলো, ঝর্নার মত বয়ে যাচ্ছে শব্দের মালা, বদলে গেছে তাদের রঙ, অর্থহীন শব্দ হয়ে উঠেছে গভীর অর্থবহ, অর্থপূর্ণগুলো অর্থহীন।

'আর কোথায় গিয়েছ তুমি?'

'হল্যাণ্ডে। হ্রদের জলে নৌকোতে ভেসেছি আমরা, গোধূলি-আলোয় সোনার জলে। কত রঙের প্রজাপতি...'

'যুদ্ধ শেষ হলে ওখানে যাব আমরা।'

'হবে না এলিজাবেথ,' কান্না ঝরল গ্রেবারের কণ্ঠে, 'ওখানে কি করিনি আমরা! চোখের পলকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শ্মশান করে দিয়েছি হল্যাণ্ডকে, মিশিয়ে দিয়েছি মাটির সাথে; একটা অক্ষত বাড়িও চোখে পড়েনি আমার, মানুষের এত কষ্ট, এত দৈন্য কোনদিন দেখিনি আমি; খোলা আকাশের নিচে পড়ে আছে তিরিশ হাজার মৃতদেহ।'

থমকে গেল সময়। হাতের গ্লাসটা ছুঁড়ে দিয়ে হাহাকার করে কেঁদে উঠল এলিজাবেথ, 'আমরা কোথাও যেতে পারি না, কোথাও যেতে পারব না, অথচ শুধুই স্বপ্ন দেখি। ঈশ্বরের এতবড় পৃথিবী, অথচ আমাদের জন্যে একটু জায়গাও কি নেই?'

আকাশে রক্তাক্ত ক্ষত নিয়ে ঘোলাটে চাঁদ। এলিজাবেথকে কাছে টানল গ্রেবার, নদীর মত বুক পেতে গ্রহণ করল ওকে, ওর দুঃখকে, এক হৃদয় থেকে দুঃখগুলো চুঁইয়ে চুঁইয়ে জমল অন্য হৃদয়ে।

www.BanglaBook.org

ষোলো

পরদিন ভোর। আঠারো নম্বরে এসেই চমকে উঠল গ্রেবার, অনেক খানি বদলে গেছে জায়গাটা—সিঁড়িগুলো পরিষ্কার, ভাঙা গামলাটা নেই, দেয়ালের পাশ দিয়ে ভেতরের দিকে চলে গেছে একফালি পরিচ্ছন্ন রাস্তা। অবাক হয়ে গেল ও। কার কাজ এসব?

সরু পথ ধরে কোনরকমে প্রায় ধসে পড়া একটা ঘরে ঢুকল গ্রেবার। ঘরটা অন্ধকার। দেশলাই জ্বালতেই চিনতে পারল জায়গাটা—ওদের স্টোররুম, কিন্তু ভেতরে যাবার রাস্তা খুঁজে পেল না ও।

'কে ওখানে?' হঠাৎ গমগমে কণ্ঠস্বরে আঁতকে উঠল গ্রেবার। তাড়াতাড়ি অন্ধকার ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

ক্রাচে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা, পরনে ময়লা শার্টের ওপরে শতচ্ছিন্ন কোট; তীক্ষ্ণ চোখে আপাদমস্তক যাচাই করল গ্রেবারের। 'এখানে কি করছ?'

'এটা আমাদের বাড়ি।'

'প্রমাণ আছে?'

'কি ব্যাপার, অটো?' শাবল হাতে বাগানের দিক থেকে ষণ্ডামার্কা একজন এগিয়ে এলো, পেছনে বয়স্কা একজন মহিলা, সাথে বাচ্চা।

'ব্যাটা নিশ্চয়ই চুরির মতলবে এসেছিল,' ষণ্ডামার্কাকে দেখে বুকে বল পেল খোঁড়া লোকটা, 'ধরা পড়তেই বলছে, এটা নাকি ওদের বাড়ি। ব্যাটাকে কষে দু'ঘা লাগাও তো!'

'দেখুন,' কড়া গলায় বলল গ্রেবার, 'এটা আমাদের বাড়ি। আমি সৈনিক, ছুটিতে এসেছি। বাইরে চিঠি ছিল একটা, দেখেননি?'

'ওটা আপনার লেখা?' অবাক হলো অটো। গলার স্বর পুরোপুরি বদলে গেছে তার।

'হ্যাঁ।'

'কিছু মনে করবেন না, কমরেড,' বিনয়ে অটো গলে পড়ে আর কি! 'একটু সমস্যা আছে আমাদের, মানে পুলিস, মানে···বুঝতেই তো পারছেন, তাই ক'টা দিনের জন্যে আশ্রয় নিয়েছি আপনাদের জায়গাটাতে।'

এবার গ্রেবারই অবাক হলো। কথাটা মনে পড়তেই কৌতূহলী গলায় জানতে চাইল, 'আপনারা নিজেরাই পরিষ্কার করেছেন জায়গাটা।'

'হ্যাঁ।'

'কোন মৃতদেহ খুঁজে পাননি?'

'না।'

'আপনি,' গলা কাঁপছে গ্রেবারের, 'ঠিক জানেন?'

'খুব ভালমতই জানি। নতুন, পুরানো, কোন লাশই ছিল না এর নিচে।'

বুক থেকে পাষাণভার নেমে গেল গ্রেবারের। পালকের মত হালকা মনে হলো নিজেকে, ইচ্ছে হলো এক লাফে আকাশ ফুঁড়ে আরও ওপরে উঠে যেতে।

রাস্তায় নামল ও। চোখ পড়ল বাগানের কোণে; সামান্য যা সম্বল পরিবারটির, পড়ে আছে সেখানে। ধ্বংসস্তূপে শুরু হয়ে গেছে নতুন জীবনের স্পন্দন, রাতে পালিয়ে আসা বন্দীশিবিরের কোন পরিবার ওরা, হয়তো শেকড় নামাতে পারবে জীবনের মাটিতে, প্রস্ফুটিত হবে পত্র-পল্লবে—পুষ্পে, নয়তো শুকিয়ে যাবে যে কোন দিন, যে কোন মুহূর্তে।

ফিরে আসার আগে শেষবারের মত তাকাল গ্রেবার, দেখল, সেই শিশুটি টলমল পায়ে এগোচ্ছে বেড়ালটার দিকে, তাকে ধরবে বলে; আর মৃত্যুকে অতিক্রম করে আসা সেই নিরুদ্বিগ্ন, তন্ময়, হাস্যোজ্জ্বল শিশুটিকে দেখে কেন যেন ক্রুশবিদ্ধ যিশুর কথা মনে পড়ল ওর।

'আর্নস্ট।'

আনমনে হাঁটছিল গ্রেবার, ডাক শুনে চমকে উঠল। যে ডেকেছে, ক্রাচে ভর দিয়ে তাকে আসতে দেখে ভাবল, অটো। কিন্তু কাছে আসতেই চিনতে পারল—মুটসিগ, ওর স্কুলজীবনের বন্ধু।

'তুমি?' বিস্ময়ে হতবাক গ্রেবার, 'এখানে, কোত্থেকে?'

'এখানেই তো আছি মাস ছ'য়েক হলো।' গ্রেবারের দৃষ্টি অনুসরণ করে কান্নার মত হাসল সে, 'তোমার অবাক লাগছে, তাই না?'

বিষণ্ন দৃষ্টিতে শুধু ওর দিকে তাকিয়ে রইল গ্রেবার, কিছু বলল না।

'তোমার ছুটি আর কতদিন আছে?' জানতে চাইল মুটসিগ।

'আছে আরও কয়েকদিন।'

'তাহলে আমার ওখানে চলে এসো একদিন। বার্গমানও আছে, হাতদুটো পুরোপুরি কাটা পড়েছে বেচারার।'

'উঠেছ কোথায় তুমি?'

'সিটি হসপিটালে, ঢুকেই বাঁ-দিকে। বেশ ক'জন আছি একসাথে। গেলে

www.BanglaBook.org

ভালই লাগবে তোমার।'

'যাব একসময়।'

হাত বাড়িয়ে দিল মুটসিগ, 'সিয়েবার্ট মারা গেছে, জানো?'

'না তো!' দুঃখ পেল গ্রেবার।

'মাস দেড়েক আগের ঘটনা ওটা। লেনের আর লিনগেনও মারা গেছে, একই সাথে। ব্রুয়েনিং পাগল হয়ে গেছে। বার্গমানের কাছে শুনলাম, হলমানও নাকি মারা গেছে। যাই হোক,' গ্রেবারের হাতে চাপ দিল মুটসিগ, 'এসো কিন্তু!'

'অবশ্যই।'

অপলক চোখে মুটসিগের চলে যাওয়া দেখল গ্রেবার। তার কথাগুলো মনের ভেতরে তোলপাড় করছে ওর; অনেকের মৃত্যুর কথা বলে সে যে বেঁচে আছে, তা যেভাবেই হোক, এই সান্ত্বনাই কি দিল নিজেকে?

ক্রাচে ভর দিয়ে, একপায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে আস্তে আস্তে দূরে সরে যাচ্ছে মুটসিগ। স্কুলে প্রতিবছর দৌড়ে প্রথম হত ও।

দিগন্তে নেমে আসা ধূসর নির্জন আকাশ, জনহীন পথপ্রান্তর। জানালায় দাঁড়িয়ে আছে গ্রেবার, ভেতরে অন্তর্লীন অস্থিরতা।

অস্থিরতা বুকের ভেতরটা কুরে কুরে খাচ্ছে ওর, এমনি করেই কি ভেসে যাবে জীবনের স্রোতে, কোথাও শেকড় নামবে না! দীর্ঘ যাত্রার শেষে ফিরে তাকিয়ে একটি ফুলও কি দেখবে না, যেটি ফুটিয়েছে ও নিজে! শেকড় চাই, নোঙর চাই, একটা অবলম্বন চাই আঁকড়ে ধরার, জীবনের সাথে একাত্ম হবার, নইলে হারিয়ে যাবে সব—এ জীবন, এ স্মৃতি।

কিন্তু কোথায় সেই অবলম্বন? সে কি এলিজাবেথ? সে কি সঞ্চিত রাখবে আজকের দিনের মাধুর্য তার রক্তে, ওর অনুপস্থিতিতে অনুভব করবে শিরায়, ধমনীতে?

'এলিজাবেথ,' ঘুরে দাঁড়াল গ্রেবার, 'আমাদের বিয়ে হওয়া দরকার।'

'বিয়ে?' কয়েক মুহূর্ত অবাক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রইল এলিজাবেথ, তারপর ভেঙে পড়ল খিলখিল হাসিতে। 'কেন?'

'হয়তো এভাবেই ধরে রাখতে চাই আমাদের ভালবাসা, আমাদের সান্নিধ্য, পরম মুহূর্তগুলো, আমাদের শান্তি, সুখময় স্মৃতি, স্বপ্ন, ভবিষ্যৎ।'

'অর্থাৎ আমরা এতই নিঃসঙ্গ, এতই রিক্ত যে বিয়ে ছাড়া আর কোনকিছুই ধরে রাখতে পারে না আমাদের?'

'না,' বুকের মধ্যে কী যে গভীর বিপন্ন বিষাদ গ্রেবারের, কি করে বোঝাবে ও সব কথা; বললেই কি শব্দগুলো বয়ে নেবে ওর আর্তি! শব্দ কি এতই শক্তিমান! 'তা নয়, এলিজাবেথ। হয়তো আরও কিছু থাকবে আমাদের, বিয়ে হলে আমাদের কোন সঙ্কোচ থাকবে না, ফ্রাউ লিজারকে ভয় করতে হবে না। তাছাড়া,' যোগ করল ও, 'একজন সৈনিকের স্ত্রী হিসেবে তোমার দায়িত্ব সরকার নিজ হাতে তুলে নেবে।'

'তাই নাকি?' ছুরির ফলার মত তীক্ষ্ণ আর ঝকঝকে হলো এলিজাবেথের দৃষ্টি।

অস্বস্তি বোধ করল গ্রেবার। বলল, 'এ ছাড়া অন্য অনেক সুবিধা হবে।'

'এটা কোন যুক্তি হলো না, আর্নস্ট। তাছাড়া বিয়ের জন্যে যে সময় দরকার, সেটাও আমাদের নেই।'

'মানে?'

'বিয়ের জন্যে অনুমতিপত্র লাগবে, মেডিক্যাল টেস্ট লাগবে, আর্য রক্ত প্রমাণ করতে হবে, এ ছাড়াও আরও অনেক কিছুর দরকার পড়বে।'

'না, না,' ডুবন্ত মানুষের খড়কুটো আঁকড়ে ধরার মত মরিয়া গ্রেবার; মনে ক্ষীণ আশা, সৈনিকদের অত কিছু লাগবে না, দিন দু'য়েক সময়ই যথেষ্ট এজন্যে। তাছাড়া বিয়ে হলে প্রতি মাসে দু'শো মার্ক পাবে তুমি। তোমাকে তখন আর পোশাকের কারখানায় কাজ করতে হবে না।'

'কারখানায় না গেলে সারাদিন একা একা করব কি?'

নিজেকে এতটা অসহায় আগে কখনও মনে হয়নি গ্রেবারের। অসীম সম্ভাবনাময় যৌবন বয়ে যাচ্ছে ধমনীতে, অথচ কিছুই করার নেই ওদের, সব সমর্পিত ব্যর্থতার কাছে, হতাশার কাছে—নেই শান্তির নীড় কিংবা স্বপ্নময় ভবিষ্যতের ইশারা।

ঠেলে আসা দীর্ঘশ্বাসটা লুকোনোর চেষ্টা করল না গ্রেবার। শুধু বলল, 'আমরা রিক্ত, নিঃস্ব, আমরা নিঃসঙ্গ, তবু বিয়ের পরে এ থেকে কিছুটা তো মুক্তি পেতাম! আর,' একটু থামল ও, 'ইচ্ছে করলে যে কোন মুহূর্তেই তো বাঁধন ছিঁড়তে পারি আমরা।'

'তাহলে আর দরকারটা কি বিয়ের?' উঠে দাঁড়াল এলিজাবেথ, 'দোহাই তোমার, আর কিছু বলো না আমাকে।' গিয়ে জানালার সামনে দাঁড়াল।

মেঘ করেছে, ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। যে কোন মুহূর্তে পৃথিবীর কোলে নেমে আসবে আকাশ।

'তাহলে বিয়ে হবে না আমাদের?'

'কি দরকার? আমরা একসাথে আছি, হয়তো সে-ই আমার অনেক সাধনায় পাওয়া।'

জানালা দিয়ে হাত বাড়াল এলিজাবেথ। বুকের ভেতর ঝরছে বর্ষার অঝোর ধারা।

বাতাসে বৃষ্টির মাতাল সঙ্গীত, প্রকৃতির অশ্রুভরা হৃদয়-হাওয়াও চঞ্চল; আকাশ পৃথিবীর মাঝখানের বিরহ চোখের জলের গান দিয়ে ভরা।

ওরা দু'জন শুয়ে আছে বিছানায়। জানালাটা খোলা, চারকোণা ফ্রেমে রূপালি বর্শার অবিশ্রান্ত পতন। গ্রেবারের মনে পড়ল রাশিয়ার কথা—মাঠ-ঘাট প্রান্তর ডুবে গেছে কাদায়; ও যখন ফিরে যাবে, তখনও হয়তো দেখবে, স্যাঁতসেঁতে, কাদা থইথই দিগন্তবিসারী ভূমি। হৃদয়ে কান্না জমে উঠেছে গ্রেবারের। বাইরে অন্ধকার, বৃষ্টির ছন্দোময় সঙ্গীত, বুকের মাঝে মিশে আছে এলিজাবেথ।

'তুমি আমাকে বিয়ে করতে চাইছ কেন, আর্নস্ট?' বাতাসে ফিসফিসে

www.BanglaBook.org

দুঃখভরা জিজ্ঞাসা, 'তুমি তো আমার সম্পর্কে কিছুই জানো না।'

'কে বলেছে জানি না?' আবেগমথিত কণ্ঠ গ্রেবারের, 'গত দুটো বছর—ফ্রন্টে, ক্যাম্পে, সবসময় অনুভব করেছি, আমার আপন সত্তায় বেড়ে উঠেছে কেউ, রক্তে অনুভব করেছি তার স্পন্দন, তার সাথে আমার সম্পর্ক তো শুধু, এজন্মের নয়, জন্মজন্মান্তরের; তাকে দেখেছি আমার হৃদয়ে, আমার ভাষায়, আমার ভাবনায়। সে তুমি, এলিজাবেথ। তবে,' নিথর অন্ধকারে শুধু বৃষ্টির কান্না, 'বিয়ের কথা ভেবেছি আজ সকালে। তুমি ঘুমিয়ে ছিলে তখন, বাইরে অন্ধকার, বৃষ্টি, বুকের মধ্যে কী যে অস্থিরতা! মনে হচ্ছিল, এই রুক্ষ হাতে শুধু রাইফেল নয়, আরও সুন্দর কিছু আঁকড়ে ধরতে পারি, আরও সুন্দর কিছু সৃষ্টি করতে পারি, পারি কাউকে গভীর ভালোবাসায় বুকের গভীরে টেনে নিতে।'

'দুপুরে তো এসব কথা বলোনি তুমি?'

'এ কথা বলার সময়,' যেন অন্যলোক থেকে ভেসে আসছে গ্রেবারের কণ্ঠস্বর, 'দুপুর নয়, এলিজাবেথ। তার জন্যে চাই এমনি অন্ধকার, বৃষ্টির এমনি ভীরু সমর্পণ।'

'কিন্তু,' ভেজা ভেজা শোনাল এলিজাবেথের গলা, 'একথাগুলো তখন বললেও সেটা দু'শো মার্ক ভাতার চেয়ে অনেক কম কষ্টের শোনাত।'

ওর কপালে ঠোঁট রাখল গ্রেবার। বালিশে ছড়ানো একরাশ এলোচুল—নরম, কোমল।

'কিন্তু তুমি তো এখনও জানো না, সত্যি সত্যি আমাকে ভালবাস কিনা।'

'সে জানা কি এতই সহজ! তার জন্যে চাই সময়, চাই কাছাকাছি থাকা, চাই বিরহ। বিয়ে ছাড়া, বলো, তোমাকে কাছে পাব কি করে, পরম নিশ্চিন্তে তোমার কাছে থাকব কি করে?' শিশুর মত অসহায় মনে হলো গ্রেবারকে।

অন্ধকারেও ঝিলিক দিয়ে উঠল দু'সারি শাদা দাঁত, দুষ্টুমি করে হাসল এলিজাবেথ। 'তাহলে এই দাঁড়াল, বিয়ের পর ভাল না বাসতে পারলে তখন সরে যাবে, এই তো?'

'না,' আর্তনাদ করে উঠল গ্রেবার। পাগলের মত বুকে জড়িয়ে ধরল এলিজাবেথকে, প্রাণপণে, যেন ছেড়ে দিলেই হারিয়ে যাবে সে। আর সেই অন্ধকারে, একটি উষ্ণ আলিঙ্গনের ভেতরে, মোমের মত গলে গলে গেল এলিজাবেথ।

বাইরে প্রথম সমর্পণের বিহ্বলতা নিয়ে অঝোরে ঝরছে বৃষ্টি।

সতেরো

'যা দরকার, ইচ্ছেমত ব্যবহার করো,' দরজার ওপাশ থেকে চিৎকার করে জানাল বিনডিং।

'আচ্ছা,' একইভাবে উত্তর দিল গ্রেবার। বিনডিংয়ের গোসলখানায় বাথটাবে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে ও। বাথরুমের মেঝে আর দেয়ালে ঝকঝকে সবুজ টাইল, শাওয়ারে গরম-ঠাণ্ডা পানির ব্যবস্থা, র‍্যাকে ফরাসী সাবান, সুগন্ধী ঠাসা—ওর কাছে একেবারে রাজসিক।

জলে একমুঠো বাথ-সল্ট মেশাল গ্রেবার। ওর সৈনিকের পোশাকগুলো এক কোণে চেয়ারের ওপরে রাখা; বার বার চোখে পড়ছে বলে মাথার দিকে সরিয়ে রাখল চেয়ারটা।

অনেকক্ষণ ধরে স্নান করল গ্রেবার। শরীরটা একেবারে ঝরঝরে করে উঠে এল বাথটাব থেকে। তোয়ালে দিয়ে গা মুছে বিনডিংয়ের দেয়া পোশাকগুলো পরল। এতদিন পরে সাধারণ পোশাক অসম্ভব হালকা লাগল ওর কাছে, মনেই হচ্ছে না অন্তর্বাস ছাড়া আর কিছু পরেছে ও। আয়নার সামনে দাঁড়িয়েই থমকে গেল গ্রেবার, অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল প্রতিবিম্বের দিকে। আয়নার বুকে ও কার ছবি? ওর নিজের? অসম্ভব, ওই প্রতিবিম্বের মালিককে ও কোনদিন দেখেনি, সীমান্তে তো নয়ই।

'কি হে,' গ্রেবার বেরোতেই মিটিমিটি হেসে প্রশ্ন করল বিনডিং, 'বিয়ে করতে যাচ্ছ নাকি?'

থতমত খেয়ে গেল গ্রেবার, 'তুমি জানলে কি করে?'

'তোমাকে দেখে আন্দাজ করলাম। তা সবদিক ভাল করে ভেবে দেখেছ আশা করি?'

'সত্যি বলতে কি, গত দুটো বছর যুদ্ধ করা ছাড়া আর কিছু ভাবার কোন অবকাশই পাইনি।'

'বাদ দাও ওসব।' কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বলল বিনডিং, 'তার চেয়ে চলো এক গ্লাস হয়ে যাক তোমার বিয়ে উপলক্ষে। এই,' নাক কুঁচকে ফেলল সে, 'ল্যাভেণ্ডারের শিশিটা একেবারে খালি করে ফেলেছ, তোমার পছন্দ আছে দেখছি!'

হাসল গ্রেবার।

দুটো গ্লাসে কনিয়্যাক ঢেলে একটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিল বিনডিং। নিজের গ্লাসটা উঁচু করল, 'প্রস্ত, আর্নস্ট।'

'প্রস্ত, আলফনস।'

গ্লাসে চুমুক দিল ওরা।

'তোমার বউয়ের কথা কিছু বলবে না আমাকে?' ঠোঁট থেকে গ্লাস সরিয়ে জিজ্ঞেস করল বিনডিং।

'না।' এক চুমুকে বাকি কনিয়্যাকটুকু শেষ করল গ্রেবার। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঝাঁঝাল হয়ে গেল ওর কণ্ঠস্বর।

'ঠিক আছে,' গ্লাসটা নামিয়ে রাখল বিনডিং। হাসিখুশি ভাবটা চলে যাচ্ছে ওর, কেমন যেন নিঃস্ব, পরিত্যক্ত লাগছে ওর নিজেকে। 'কোন দরকার পড়লে জানিও।'

'আমার মনে হয়,' নিজের ওপরই অসম্ভব রাগ হচ্ছে গ্রেবারের এসব আলোচনায়, 'কোন দরকারই পড়বে না।'

www.BanglaBook.org

'জানি, সৈনিক হিসেবে তোমার ঝামেলা হবার কথা নয়, তবু কোন কারণে অসুবিধে হলে জানিও আমাকে; আমার গেস্টাপোর বন্ধুরা সাহায্য করতে পারবে।'

'গেস্টাপো?' হিমশীতল কণ্ঠস্বর গ্রেবারের, 'এর ভেতরে গেস্টাপো আসছে কোত্থেকে?'

রহস্যময় একটুকরো হাসি উপহার দিল বিনডিং। 'তোমার অবশ্য জানার কথা নয়, এমন কিছু নেই যা নিয়ে গেস্টাপো মাথা ঘামায় না। তুমি চিন্তা করো না, তুমি তো আর ইহুদি কিংবা কমিউনিস্ট বিয়ে করতে যাচ্ছ না! নিয়মরক্ষার জন্যে মামুলি কিছু ব্যাপারে শুধু খোঁজ নেবে ওরা।'

কলজের মধ্যে দুরমুশ পেটা শুরু হয়ে গেল গ্রেবারের। কি করে যে স্বাভাবিক রাখল চেহারা, তা ও-ই জানে—গেস্টাপো খোঁজ নিলেই জানতে পারবে, এলিজাবেথের বাবা বন্দীশিবিরে। তারপর যে কি হবে···, আর ভাবতে পারল না গ্রেবার।

গ্লাস দুটোতে আবার কনিয়্যাক ঢালল বিনডিং। হাতে গ্লাস নিয়ে জানালা দিয়ে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল গ্রেবার—ভোরবেলাতেই এলিজাবেথকে পাঠিয়েছে ও কাগজপত্র যোগাড় করতে। এখন মনে হচ্ছে, কাজটা শুধু ভুলই নয়, অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে গেছে। গেস্টাপো জানতে পারলে এলিজাবেথকে সোজা নিয়ে যাবে বন্দীশিবিরে; কে জানে, হয়তো এর মধ্যেই সে ব্যবস্থা করে ফেলেছে ফ্রাউ লিজার। উঠে পড়ল ও।

'কি ব্যাপার,' ওর পথ আগলে দাঁড়াল বিনডিং, 'যাচ্ছ কোথায়? গ্লাসটা খালি করো আগে, একেবারে খাঁটি নেপোলিয়ন কনিয়্যাক।'

বিনডিংয়ের চোখে তাকিয়ে বিপদ খুঁজল গ্রেবার, হালকা আভাস পেতেই সতর্ক হয়ে উঠল। আস্তে করে গ্লাসটা তুলে নিয়ে চুমুক দিল গ্লাসে।

'শোনো,' বলল বিনডিং, 'বিয়ের উৎসব কিন্তু আমার বাড়িতে হবে। সব দায়িত্ব আমার।'

ঝড়ের গতিতে অনেকক'টা চিন্তা খেলে গেল গ্রেবারের মাথায়। 'উৎসবের কোন দরকার আছে বলে কিন্তু মনে হয় না আমার।'

'দরকার আছে কি নেই, সে আমি বুঝব,' আন্তরিক গলায় ধমকে উঠল বিনডিং, 'আজ রাতে আমার এখানে থাকবে। চাবি দিয়ে দেব একটা, একেবারে নিজের বাড়ি মনে করবে এটাকে।'

হেসে ফেলল গ্রেবার। 'ঠিক আছে।'

'এই তো বন্ধুর মত কথা,' খুশিতে ঝিকমিক করে উঠল বিনডিং। ফের কনিয়্যাক ঢালল গ্লাসে। 'তোমার বউয়ের কথা তো বললে না কিছুই? বুঝতে পারছি, ভয়ঙ্কর সুন্দরী, সেজন্যেই লুকোচ্ছ আমার কাছে।' হো হো করে ঘর ফাটিয়ে হেসে উঠল সে।

হাসল গ্রেবারও। বিনডিংকে গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখল। এ রকম মুখ কোথায় যেন দেখেছে—শিশুর মত নিষ্পাপ, সরল, সহজ, অথচ কোথাও লুকিয়ে আছে কালকেউটের ক্রূরতা—ঠিক মেলানো যায় না। হঠাৎ মনে পড়ল ওর

সাদৃশ্যটা—স্টেইনব্রেনারের ঘুমন্ত মুখের সাথে আশ্চর্য মিল এখন বিনডিংয়ের। জবাব দিল ওর কথার, 'বলার মত কিছুই নেই, আলফনস, একদিন সব জানতে পারবে।'

আনমনে হাঁটছে গ্রেবার, মনটা বড্ড বিক্ষিপ্ত। ফ্রাউ লিজারের সঙ্গে দেখা করে আসছে ও। বিনডিংয়ের কাছ থেকে নেয়া এক প্যাকেট চিনি ঘুষ হিসেবে দিয়েছে তাকে, তখনই লোভ আর লালসার ক্লেদাক্ত মুখোশ পরা ফ্রাউ লিজারকে আরও ভালভাবে চিনেছে। কিন্তু এ মুখোশ কি তার একার? সমাজের সর্বত্রই কি ছড়িয়ে নেই সেটা? তাই যদি হয়, তবে আজ নতুন করে জানতে চাওয়ার দরকারটা কি ছিল ওর, আর জেনেই বা নতুন করে দুঃখ পাওয়া কেন?

হঠাৎ এলিজাবেথের জন্যে রাজ্যের দুশ্চিন্তা এসে ভর করল ওর মনে; ভোরবেলা গেছে মেয়েটা, ও নিজেই পাঠিয়েছে, ফিরতে ফিরতে সেই সন্ধ্যা—অবশ্য যদি ফিরতে পারে। অস্থির হয়ে উঠল গ্রেবার। কেন যেন হঠাৎ হির্শলাণ্ডের কথা মনে পড়ল ওর—সে তার পরিবারকে নিরাপদ রাখার জন্যেই শুধু নাম লিখিয়েছিল সেনাবাহিনীতে।

থমকে দাঁড়াল গ্রেবার। ভুলেই গিয়েছিল, হির্শলাণ্ডের বাড়িতে যাবার কথা। নোটবুক হাতড়ে ঠিকানাটা বের করল ও।

ছোটখাট তিনতলা বাড়ি। দোতলায় উঠে ঘণ্টা বাজাল গ্রেবার। একটু পরেই দরজা খুলল মাঝবয়েসী এক মহিলা—কপালে বলিরেখা, শুকনো চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ।

'ফ্রাউ হির্শলাণ্ডের সাথে দেখা করতে এসেছি আমি,' বলল গ্রেবার।

অবাক হলো মহিলা, 'বলুন।' চোখে তাড়া খাওয়া খরগোশের দৃষ্টি।

'ও, আচ্ছা,' লাজুকভাবে হাসল গ্রেবার। 'আমি আপনার ছেলের বন্ধু, একই সাথে যুদ্ধ করছি। ও আপনার সাথে দেখা করতে বলেছিল আমাকে।' একটু থেমে আবার বলল, 'ছুটিতে এসেছি বলে সাধারণ পোশাক পরেছি।'

'ভেতরে এসো,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন হির্শলাণ্ডের মা।

ভেতরে ঢুকে চারপাশে দৃষ্টি বোলাল গ্রেবার—একেবারে শাদামাঠা ঘর, একপাশে চেয়ার-টেবিল, অন্যপাশে বিছানা, দেয়ালে একটা ছবি টাঙানো। বাইরে একফালি বারান্দার আভাস।

ভদ্রমহিলা ওকে বসতে বললেন। বসল গ্রেবার; অপেক্ষা করছে হির্শলাণ্ডের কথা জিজ্ঞেস করবেন ওর মা, কিন্তু দেয়ালে হেলান দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলেন তিনি—বিষণ্ন শূন্য দৃষ্টি ভেসে গেল সুদূরে।

চুপচাপ কাটল কিছুক্ষণ। অস্বস্তি বোধ করছে গ্রেবার, অগত্যা নিজেই কথা শুরু করল, 'দু'হপ্তা হলো এসেছি আমি, আসার আগে একসাথেই ছিলাম আমরা।'

'তুমি কি কিছু খাবে?' গ্রেবারের কথাগুলো যেন কানেই যায়নি ভদ্রমহিলার।

'হ্যাঁ,' অবাক হলো গ্রেবার। 'একগ্লাস পানি।' গলাটা হঠাৎ করে যেন শুকিয়ে গেছে ওর।

'তুমি বসো, আনছি আমি।' ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন হির্শলাণ্ডের মা।

পুরো ব্যাপারটা অত্যন্ত অস্বাভাবিক লাগল গ্রেবারের: ভদ্রমহিলা শুধু ভয়ই

www.BanglaBook.org

পাননি, সেই সাথে অস্বাভাবিক আচরণও করছেন। ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে কাঁধ ঝাঁকাল ও, উঠে দেয়ালে টাঙানো ছবির কাছে গেল। বিখ্যাত কোন শিল্পীর আঁকা ছবিটা—ফুলে ফুলে ভরে থাকা গাছ, নিচে জলের পাত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক কিশোরী। ছবিটা আগেই যেন কোথাও দেখেছে গ্রেবার, কিন্তু মনে করতে পারল না। সরে আসার জন্যে ঘুরতেই টেবিলের নিচে নরম কিছুতে পা লাগল ওর। তাড়াতাড়ি নিচু হয়ে মেঝে পর্যন্ত ঝুলে থাকা চাদর সরাল ও, ভীষণভাবে চমকে উঠল সাথে সাথে, একটা বাচ্চা—শীর্ণ, হাড্ডিসার চেহারা, চোখেমুখে আতঙ্ক, হয়তো ওর সাড়া পেয়ে ভয়ে লুকিয়েছে এখানে। হাসল গ্রেবার, কষ্ট ঝরে পড়ল সে হাসিতে। চাদরটা আগের মতই রেখে ফিরে এসে বসল আবার।

হাতে ট্রে নিয়ে ফ্রাউ হির্শলাণ্ড ফিরলেন, ট্রে-তে দু'টুকরো রুটি আর লাল মদ।

'ধন্যবাদ,' গ্লাসটা তুলে নিয়ে চুমুক দিল গ্রেবার। 'আপনার ছেলে ভালই আছে। আমি আসার সময় নিরাপদ জায়গাতেই ছিলাম আমরা।'

শূন্য দৃষ্টিতে বাইরে তাকিয়ে থাকলেন ফ্রাউ হির্শলাণ্ড, সম্পূর্ণ অভিব্যক্তিহীন চেহারায়। এবারে বিস্মিত হলো গ্রেবার, এ কেমনতরো মা! একবারও জিজ্ঞেস করলেন না—ছেলে কেমন আছে, কোথায় আছে, খাওয়া-দাওয়া ঠিকমত করছে কিনা, যুদ্ধের কি অবস্থা, এসব!

অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর ভদ্রমহিলা নীরবতা ভাঙলেন ম্লান, ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে, 'ও তাহলে ভালই আছে?'

'ভাল বলতে ফ্রন্টে যতটা ভাল থাকা যায়। অনেকটা এখানকার মতই অবস্থা।' আরও প্রশ্নের জন্যে অপেক্ষা করছে গ্রেবার। কিন্তু অন্যপক্ষ নিশ্চুপ একেবারে, হতে পারে লুকোনো বাচ্চাটার জন্যে।

উঠে দাঁড়াল গ্রেবার। 'হির্শলাণ্ড আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, কোন খবর থাকলে কিংবা কিছু পাঠাতে চাইলে নিশ্চিন্তে আমার কাছে দিতে পারেন, সপ্তাহখানেক পরেই ফিরব আমি। আপনি বললে যাবার আগে দেখা করে যাব।'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়লেন হির্শলাণ্ডের মা, 'না, দরকার নেই।'

স্তব্ধ হয়ে গেল গ্রেবার, যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না কথাটা। হঠাৎ ওর মনে হলো, ভদ্রমহিলা বোধ হয় অবিশ্বাস করছেন ওকে। পকেট থেকে কাগজপত্র বের করল ও। 'আপনি সম্ভবত বিশ্বাস করতে পারছেন না আমাকে। এটা দেখলেই,' আইডেনটিটি কার্ডটা সামনে বাড়াল সে, 'সন্দেহ যাবে আপনার।'

কার্ডটা ছুঁয়েও দেখলেন না হির্শলাণ্ডের মা। মাথাটা নুয়ে পড়ল তাঁর। প্রায় শোনাই যায় না গভীর বেদনায় উচ্চারিত ফিসফিসে শব্দগুলো, 'ও মারা গেছে।'

'তা কি করে হয়?' মাথায় কিছু ঢুকছে না গ্রেবারের, ভেতরটা একেবারে শূন্য হয়ে গেছে, একটিমাত্র কথায়। মুখ ফসকে আপনিই বেরিয়ে এল, 'ও মারা যেতে পারে না।'

'পরশুদিন খবর এসেছে,' অশ্রুভরা চোখ তুললেন হির্শলাণ্ডের মা।

'কিন্তু···'

'কোন কথা নয়, আমাকে একটু একা থাকতে দাও।' কান্নায় ভেঙে পড়লেন

ফ্রাউ হির্শলাণ্ড।

নিজেকে অসম্ভব অপরাধী মনে হলো গ্রেবারের। পাথরের মত অনড় দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর চোরের মতো পা টিপে টিপে বেরিয়ে এল ঘর ছেড়ে। হঠাৎ হির্শলাণ্ডের দেয়া সিগারেটগুলোর কথা মনে পড়ল ওর, চরাচর ডুবে গেল সিক্ত বিষণ্ণতায়।

অনেকক্ষণ হলো কারখানার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে গ্রেবার—অস্থির, উৎকণ্ঠিত; ছুটি হয়ে গেছে, অথচ এখনও এলিজাবেথের দেখা নেই, মনে উঁকি দিচ্ছে হাজারটা অশুভ সম্ভাবনা। ফিরে আসার জন্যে ঘুরে দাঁড়াতেই খিলখিল হাসিতে চমকে উঠল ও।

'সত্যি, চিনতেই পারিনি তোমাকে।' হাসছে এলিজাবেথ। ঠোঁটের কোণে চাপা দুষ্টুমি। 'ভেবেছিলাম, গেস্টাপোর কেউ, তাই আড়াল থেকে লুকিয়ে চেনার চেষ্টা করছিলাম।' আবার মুক্তো ঝরল হাসিতে, 'তোমাকে কিন্তু দারুণ লাগছে, ঠিক যেন আমার স্বপ্নের রাজকুমার।'

'আমার কিন্তু,' হাসল গ্রেবার, 'তা মনে হচ্ছে না। নিজেকে মনে হচ্ছে একশো বছরের থুত্থুড়ে বুড়ো।'

'কেন?' অবাক হলো এলিজাবেথ।

'হয়তো এই পোশাকের জন্যে।'

'বললেই হলো!' ঠোঁট ওল্টাল এলিজাবেথ।

'বাদ দাও ওসব,' প্রসঙ্গ বদলাল গ্রেবার, 'খবর কি তোমার?'

'ভাল। দুপুরে বেরিয়েছিলাম। কাগজপত্র যা যা দরকার, সব জমা দিয়ে এসেছি।'

'কোন ঝামেলা হয়নি তো?'

'না তো, কেন?'

বিরাট একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল গ্রেবার। 'কী যে চিন্তায় ছিলাম তোমার জন্যে, যখনই শুনেছি গেস্টাপোর মাধ্যমে অনুসন্ধান হতে পারে আমাদের ব্যাপারে।'

নিমেষে চোখমুখ শুকিয়ে গেল এলিজাবেথের। 'অর্থাৎ, বাবার জন্যে আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারে?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু সে আশঙ্কা তো এখনও থাকল।'

'থাকলেও কিছু করার নেই আমাদের।'

'কাগজপত্র ফিরিয়ে নিলে হয় না?'

'না,' এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ল গ্রেবার, 'সে হয় না, তাছাড়া বিপদ এতে বাড়বে বই কমবে না।'

পাশাপাশি হাঁটছে ওরা। আস্তে আস্তে, নিঃশব্দে, কি যেন একটা, হয়তো আনন্দস্রোত কিংবা খুশির একটা ধারা বুদ্বুদ তুলল বুকে—ধীরে ধীরে ছড়িয়ে গেল সারা শরীরে, ছন্দোময় হয়ে উঠল হাঁটা।

এলিজাবেথের চোখে চোখ রাখল গ্রেবার। গভীর প্রশান্তিতে ভরে উঠল ওর

www.BanglaBook.org

বুক, সারা নিসর্গ জুড়ে শুধু একটিমাত্র সঙ্গীত; আমার, শুধুই আমার।

'কি দেখছ অমন করে?' ঝিকমিক করে হাসল এলিজাবেথ।

'তোমাকে।' গাঢ় স্বরে বলল গ্রেবার, 'আর তোমার জন্যেই শুধু চিন্তা হচ্ছে।'

'অত ভাবছ কেন?' কপট রাগে ধমক দিল এলিজাবেথ, 'আমাদের তো নতুন করে ভয় পাবার কিছু নেই!'

'আছে, অনেক আছে; তোমাকে ভালবাসার আগে জানতাম না, পৃথিবীতে ভয় পাবার এত কিছু আছে।'

বাঁধভাঙা বন্যার মত হাসির ঢল নামল এলিজাবেথের, গড়িয়ে প্রায় পড়ে যায় আর কি।

বিস্মিত চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রইল গ্রেবার, হঠাৎ করেই অদ্ভুত একটা সত্যি আবিষ্কার করে ফেলেছে ও—ওদের প্রথম দিকে ভয় পেত শুধু এলিজাবেথ, এবার দেখা হবার পরে আর এলিজাবেথকে ভালবেসে ভয় বেড়েছে ওর নিজের। কী অদ্ভুত!

হিটলার প্লাটস ছাড়িয়ে এল ওরা। সামনে বিশাল লাল আকাশ, গির্জার ঝিকমিক সোনালি চূড়া, দীর্ঘ পাইনবীথির আড়ালে আধখানা ডুবে যাওয়া রক্তিম সূর্য—কী মায়াময়, কী অসহ্য সুন্দর!

গ্রেবারের কাঁধে মাথা রাখল এলিজাবেথ। 'এত সুন্দর সূর্যাস্ত দেখিনি কোনদিন!'

ওকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরল গ্রেবার। 'আমিও না।'

গাছের আড়ালে মুখ লুকিয়েছে সূর্য, আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে দিনের শেষ আলো। সেই রক্তিম সোনালি আলোয়, আশ্চর্য লাগছে গ্রেবারের, প্রতিটা মুখই যেন পরম পরিচিত, যেন ওর জন্মজন্মান্তরের আত্মীয়তা তাদের সাথে। সে কি, সবাই ওরা এই কালবেলার অসহায় পথিক বলেই, একই দুর্ভাগ্যের অংশীদার বলেই? হয়তো তা-ই। মানুষকে সত্যিকারভাবে কেউ চিনতে পারে, যখন সে নিঃস্ব, রিক্ত; দুঃসাহসীও সে হতে পারে তখনই।

আঁধারের মত গভীর কষ্ট নামছে গ্রেবারের বুকে। অন্তহীন দুঃস্বপ্নের শেষে এসেছে নিজের দেশের মাটিতে—যেখানে সে দাঁড়িয়ে আছে, সেখানেও বিন্দুমাত্র নিরাপদ নয় ও।

গভীর লাল আকাশ, যেন মানুষের বুকের রক্তের নিপুণ তুলিতে রাঙানো, বাতাস ভরা ফুলের গন্ধে—ভায়োলেট ফুটেছে কোথাও।

আঠারো

জিনিসপত্র গুছিয়ে নিচ্ছে ব্যোটশার। ওর বউকে খুঁজে পেয়েছে, এবার চলে যাবে সে। অন্যেরা ভিড় করে আছে ওর চারপাশে।

'শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেলে তাহলে!' বলল গ্রেবার। 'কোথায়?'

'রাস্তায়—কেলারস্ট্রাসে আর বিয়েরস্ট্রাসের মোড়ে।' চকচকে চোখে তাকাল ব্যোটশার, 'জানো, ওকে দেখে চিনতেই পারিনি প্রথমে। পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি, পেছন থেকে কে যেন ডাকল। চমকে ফিরে তাকালাম; দেখি, কাঠির মত একটা মেয়ে। আমাকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে ম্লান হাসল, বলল, "চিনতে পারছ না? আমি আলমা।" বুকের মধ্যে যে কেমন করে উঠল, কি করে বোঝাব তোমাকে। থরথর করে হাত-পা কাঁপছে, কোন রকমে এগিয়ে···'

'এতদিন ছিল কোথায় সে?' ওকে বাধা দিল গ্রেবার।

'এরফুর্টে। আরে শোনোই না তারপর,' বলার নেশায় পেয়েছে ব্যোটশারকে, 'কোনরকমে এগিয়ে গেলাম ওর কাছে। গিয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলাম, একেবারে এতটুকু লাগল ওকে—কঙ্কালসার শরীর, গায়ে ঢলঢল করছে জামা। তোমরাই বলো, দুশো পাউণ্ডের জায়গায় যদি ওজন কমে একশো কুড়িতে আসে, তাহলে কেমন লাগে?'

'লম্বা কত?' শুয়ে ছিল, উঠে বসল ফেল্ডমান।

'মানে?'

'মানে তোমার বউয়ের উচ্চতা কত?'

'পাঁচ ফুট তিন-টিন হবে। কেন?' অবাক হলো ব্যোটশার।

'তাহলে,' হাসল ফেল্ডমান, 'এখনই সবচেয়ে ঠিক ওজন আছে তার।'

'ঠিক ওজন?' খেপে উঠল ব্যোটশার, 'অমন ঠিক ওজন তোমার বউয়ের থাক। আমি আলমাকে আগের মত সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী হিসেবে দেখতে চাই। আমরা কি এজন্যেই যুদ্ধ করছি না?'

'আহাম্মক,' আস্তে করে বলল রয়টার যাতে ব্যোটশার শুনতে না পায়। 'তিন বছর ফ্রন্টে থেকে এই শিখলে? শোনো, আমরা যুদ্ধ করছি আমাদের প্রিয় ফুয়েরার আর পিতৃভূমির জন্যে, তোমার বউয়ের হারানো ওজনের জন্যে নয়।'

চোখ পাকাল ব্যোটশার, কিন্তু কিছু বলার আগেই ওকে থামিয়ে দিল রয়টার, 'বেশ তো, খুঁজে যখন পেয়েছ, এবার ভাল করে আদরযত্ন করো, খাওয়াও-দাওয়াও···'

'খাওয়াবটা কি?' খেঁকিয়ে উঠল ব্যোটশার, 'কুপনে যা দেয় তাতে আধপেটাও হয় না। আমার আর ছুটি আছে মাত্র তিনদিন। এ ক'দিন চর্বির মধ্যে ডুবিয়ে রাখলেও তো তিন পাউণ্ড ওজন বাড়বে না ওর।' জিনিসপত্র ঘাড়ে তুলে নিল সে।

'কোথায় থাকবে ঠিক করেছ?' আন্তরিকভাবে জিজ্ঞেস করল গ্রেবার।

'জানি না।' দুশ্চিন্তায় আরও ঝাঁঝালো হলো ব্যোটশারের কণ্ঠস্বর, 'দুটো রাত এদিক-ওদিক কোথাও কাটিয়ে দেব। তারপর আমি ফিরে যাব ফ্রন্টে, ও ক্যাম্পে। দেখি,' ম্লান হাসল সে, 'কি করা যায়!'

ও চলে যেতেই দীর্ঘশ্বাস ফেলল সবাই।

'ফ্রন্টে এখন নাকি শুধু আগুন জ্বলছে,' মিলিটারি ইনফরমেশান সার্ভিসের অল্পবয়েসী

www.BanglaBook.org

ছোকরাটা মিটিমিটি হাসছে আর সদ্য গজানো গোঁফে তা দিচ্ছে। 'মানুষ মরছে অনেক, তবে কোন্ পক্ষের সেটাই শুধু জানা যাচ্ছে না।'

'দুধের বাচ্চাও জানে কথাটা,' ঠোঁট ওল্টাল গ্রেবার। ইনফরমেশান সার্ভিসে এসেছে ও, বিয়ের জন্যে কি কি কাগজপত্র লাগবে, জানতে। 'শুধু আমরাই জানি না। সে যাকগে, কিন্তু আমার সাথে এর সম্পর্ক কি?'

'আছে, সম্পর্ক আছে।' সবজান্তার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ছোকরা। 'আপনি তো ছুটিতে, তাই না?' গ্রেবারকে সায় দিতে দেখে হাসল সে। 'নিশ্চিত জানেন?'

'কেন নয়?' প্রচণ্ড বিরক্তি বোধ করছে গ্রেবার এই সব আবোল-তাবোল কথাবার্তায়।

'আপনাকে যদি আজকেই আসা সমস্ত ছুটি বাতিলের জরুরী নির্দেশটা দেখাই?'

শিরদাঁড়া বেয়ে শিরশিরে একটা ঠাণ্ডা স্রোত নেমে গেল গ্রেবারের, এক নিমেষে গলা শুকিয়ে কাঠ। শুকনো হাসি হাসার ব্যর্থ চেষ্টা করল ও, 'সেটা অবশ্য একটা কথা।'

'খবর এসেছে,' খুব রসিয়ে রসিয়ে জানাল ছোকরা, 'রংরুট পাঠাতে হবে। এবং,' একটু বিরতি দিল সে, 'বিশেষ কারণ ছাড়া সমস্ত ছুটি বাতিল করা হয়েছে।'

পকেট থেকে আস্তে করে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করল গ্রেবার, ধীরেসুস্থে রাখল টেবিলে। 'বিশেষ কারণগুলো কি কি?'

'পরিবারের কারও মৃত্যু, গুরুতর অসুস্থতা, ছোঁয়াচে কোন রোগ হওয়া, এইসব আর কি।' প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট নিয়ে ঠোঁটে গুঁজল ছেলেটা। 'অবশ্য,' আগের কথার খেই ধরল, 'গা ঢাকা দিতে পারেন। খুঁজে পেলে তবে তো ফেরত পাঠানোর প্রশ্ন আসছে! আপাতত তাঁবুর ধারেকাছে যাবেন না।'

'বিয়ে করাটা কোন বিশেষ কারণ হতে পারে না?' দেশলাই জ্বেলে সিগারেটটা ধরিয়ে দিল গ্রেবার।

'বিয়ে?' হেসে উঠল ছেলেটার চোখজোড়া, 'এর চেয়ে বিশেষ কারণ আর হয় না কি?'

মস্তবড় একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল গ্রেবার। 'বাঁচালেন! সে ব্যাপারেই আপনার কাছে আসা, আইডেনটিটি কার্ড ছাড়া অন্য কিছু লাগবে টাগবে নাকি?'

'আরে না, না,' ভুশ করে একগাল ধোঁয়া ছাড়ল ছেলেটা, 'আপনারা হলেন খোদ ফ্রন্টের সৈনিক, আপনাদের আবার অন্য কি লাগবে! আর একান্তই যদি লাগে কিছু, সোজা আমার কাছে চলে আসবেন, ব্যবস্থা করে দেব সব।'

'ধন্যবাদ,' কৃতজ্ঞতায় মন ভরে উঠল গ্রেবারের। ভাল মানুষ পৃথিবীতে এখনও আছে তাহলে!

'তাই বলে,' ঠাট্টা করল ছেলেটা, 'এই পোশাক পরে যেন বিয়ের আসরে যাবেন না আবার! পোশাক বিভাগ থেকে বদলে নিন ওটা। গিয়ে বলবেন আমি পাঠিয়েছি। ভাল কথা, সিগারেটের প্যাকেট আছে আর?'

পকেটে হাত দিতেই গ্রেবারকে থামিয়ে দিল ছেলেটা, 'আমার জন্যে নয়,

পোশাক-বিভাগের সার্জেন্ট মেজরকে দেবেন।'

'আচ্ছা,' ভয়ে ভয়ে জানতে চাইল গ্রেবার, 'কনের কোন কাগজপত্র লাগবে?'

'ইহুদি নয় নিশ্চয়ই?'

'না।'

'তাহলে আশা করি লাগবে না।'

সার্জেন্ট মেজরকে খুঁজে পেতে কোন অসুবিধেই হলো না গ্রেবারের—লম্বা-চওড়া, ভারিক্কি চেহারা, একটা চোখ বাদামী, অন্যটা গাঢ় নীল।

গ্রেবারকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে ধমকে উঠল সে, 'পাথরের চোখ দেখেননি আগে?'

'দেখেছি,' নরম সুরে বলল গ্রেবার, 'তবে রঙের এত পার্থক্য দেখিনি কখনও।'

'নীলটা,' গম্ভীর গলায় জানাল সার্জেন্ট, 'আমার নয়, এক বন্ধুর। আমারটা পড়ে গিয়ে ভেঙে গেছে কাল।'

'আহ্ হা,' দুঃখ প্রকাশ করল গ্রেবার।

মরা চোখ দিয়ে ওর আপাদমস্তক জরিপ করে দেখল সার্জেন্ট মেজর। 'আপনি যা পরে আছেন, তার চেয়ে ভাল পোশাক কিন্তু আমাদের কাছে নেই।'

আস্তে করে সিগারেটের প্যাকেট টেবিলে রাখল গ্রেবার, কোন কথা বলল না।

এবারে বাদামী চোখে ওকে যাচাই করল সার্জেন্ট। তাক থেকে একটা শার্ট নামাল। 'এটাতে চলবে?'

শার্টটা ছুঁয়েও দেখল না গ্রেবার। আবার হাত ঢোকাল পকেটে, এমনভাবে কনিয়্যাকের বোতলটা বের করল যেন টোকা লাগলেই ভেঙে যাবে। সিগারেটের প্যাকেটের পাশে রাখল বোতলটা।

মরা চোখসুদ্ধ চকচক করে উঠল সার্জেন্ট মেজরের, এক ধাক্কায় চেয়ার সরিয়ে পাশের ঘরে ঢুকল সে। একটু পরেই ফিরে এল, হাতে নতুন শার্ট আর প্যান্টের প্যাকেট। হাসিটা এ-কান থেকে ও-কান পর্যন্ত পৌঁছল গ্রেবারের।

'আরে!' লাফিয়ে উঠল মুটসিগ, 'তুমি? এলে তাহলে?'

'হ্যাঁ,' হাসল গ্রেবার। 'দেখতেই তো পাচ্ছ।'

এক কোণে তাস পেটাচ্ছিল স্টকমান, একটা হাত নেই তার। গ্রেবারের গলা শুনে ঘুরে তাকাল, 'তুমি এখানে? কেমন আছ?'

'ভাল, ছুটিতে এসেছি।'

'সেই আফ্রিকা থেকে ফেরার পরে এই প্রথম দেখা হলো আমাদের।'

'হ্যাঁ, ওখান থেকে সোজা রাশিয়ায় পাঠিয়ে দিয়েছিল আমাকে।'

'তোমার ভাগ্য ভাল, আর্নস্ট, রাশিয়াতে বদলি হয়েছিলে বলে,' ম্লান হাসল স্টকমান, 'আমি ছাড়া আর কেউ পালাতে পারেনি আফ্রিকা থেকে।'

'খেলবে, নাকি গল্পই করবে?' খেঁকিয়ে উঠল অন্য দু'জন খেলোয়াড়ের একজন, উরু থেকে দুটো পা-ই কাটা তার। ভুরুহীন দগদগে লাল চোখ, নতুন

www.BanglaBook.org

ওঠা পাপড়ি—বীভৎস। সারাক্ষণই যেন জ্বলছে চোখ দুটো।

'আগে খেলে নাও,' তাড়াতাড়ি বলল গ্রেবার; অস্বস্তি বোধ করছে ও। 'আরও কিছুক্ষণ আছি আমি।'

'এই দানটাই শুধু,' ঘুরে বসল স্টকমান।

'আর্নল্ডের কথায়,' কানের কাছে ফিসফিস করল মুটসিগ, 'রাগ করো না। বেচারার কপালটাই খারাপ। শরীরের অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছ, তারপর সেদিন ওর মা এসেছিল, জানাল, ওর বউটা নাকি রোজ রাতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।'

ঝপাং করে মেঝেতে তাস ফেলে দিল স্টকমান, গো-হারা হেরেছে সে।

'জানো,' কেন যেন গ্রেবারকে কথাটা শোনাল মুটসিগ, 'একটা মেয়ে ভালবাসে আমাকে, আমিও; মুয়েমস্টার থেকে এখনও চিঠি লেখে। আমার পায়ের কথা অবশ্য জানে না এখনও।'

'শিগগির জানিয়ে দাও।' চমকে উঠল মুটসিগ কানের কাছে স্টকমানের গলা শুনে, কখন যে সে এসে দাঁড়িয়েছে ওর পাশে, টেরই পায়নি। 'কথাটা খারাপ লাগতে পারে, কিন্তু মেয়েরা বোধ হয় পঙ্গু লোককে বিয়ে-টিয়ে করতে চায় না, অন্তত সুযোগ থাকলে তো নয়ই।'

'তাহলে,' করুণ দু'চোখ স্থির হলো মুটসিগের, 'বলতে চাও, জীবনে প্রেম-ভালবাসা পাবার অধিকার হারিয়েছি আমরা? দেশের জন্যে আমাদের আত্মত্যাগের কোন মূল্যই নেই?'

'বাস্তব চিন্তা করলে দেখবে, আসলেই নেই। যুদ্ধ যতদিন চলবে, তোমার আমার সম্মান সব জায়গায়; যুদ্ধ শেষ হলেই তুমি আর বীর যোদ্ধা নও, একজন পঙ্গু, অথর্ব মাত্র। কেউ ফিরেও তাকাবে না তোমার দিকে।'

'আমার ধারণা,' ওপাশ থেকে মন্তব্য করল আর্নল্ড, 'ঠিক উল্টো। প্রাণ বাজি রেখে যুদ্ধ করেছি, আমাদের কর্তব্য যতটুকু সম্ভব পালন করেছি; আর কি করতে বলো! তা ছাড়া যুদ্ধে তো আমরা জয়ী হবই।'

'কিন্তু তাতেও তো শেষ হবে না সব,' বলল স্টকমান, 'যুদ্ধে জয়ী হলেও এই দুঃখ, এই কষ্ট, এই হতাশা, নিঃসঙ্গতা, ব্যর্থ যৌবন কোথায় রাখবে তুমি? তোমার দুটো হাত যদি না থাকে, কি করে প্রেমিকার হাতে হাত রাখবে, অন্ধ হয়ে গেলে চোখে চোখ? তাছাড়া,' বিদ্রূপের হাসি হাসল সে, 'যুদ্ধ জয়ের প্রশ্নই আসে না।'

'নিশ্চয়ই না,' কণ্ঠে বিষ ঝরে পড়ল আর্নল্ডের, 'ফ্রন্টের সৈনিক যখন শৌখিন পোশাক পরে ঘুরে বেড়ায়, তখন তো সে প্রশ্নই ওঠে না।'

এ ধরনের আশঙ্কা অনেক আগেই করেছিল গ্রেবার। অস্বস্তি বোধ করছিল এতক্ষণ, জোরাল হলো সেটা। কোন উত্তর না দিয়ে উঠে দাঁড়াল ও। 'আজ আসি তাহলে।'

'আর একটু বসবে না?' ছলছল করে উঠল মুটসিগের চোখ দুটো।

'আমার কয়েকটা কাজ আছে ভাই, যেতেই হবে।'

রাস্তায় নেমে এল গ্রেবার। হৃদয় আচ্ছন্ন অন্তহীন হতাশায়, আকাশে ম্লান রোদ।

পোলমানের দরজায় ঘণ্টা বাজাল গ্রেবার। ভেতরে পায়ের শব্দে বুঝল, এলেন তিনি। দরজা খুলে ওকে দেখে একটু যেন থতমত খেয়ে গেলেন পোলমান। 'ও, তুমি, এসো, ভেতরে এসো।' গলা শুনে পরিষ্কার বুঝল গ্রেবার, অন্য কাউকে আশা করেছিলেন তিনি।

ঘরের ভেতরে সবুজ আলো, বাতাসে সিগারেটের কটু গন্ধ; অথচ গ্রেবার জানে, পোলমান সিগারেট খান না, তাঁর হাতেও সিগারেট নেই এখন, কিংবা ঘরেও আর কেউ নেই। মাথামুণ্ডু কিছু বুঝল না গ্রেবার। ব্যাপারটা কি!

'আপনার কি একটাই ঘর?' জিজ্ঞেস করল গ্রেবার।

'কেন বলো তো?'

'আপনার অসুবিধে না হলে একজনকে কয়েকদিনের জন্যে লুকিয়ে রাখতে চাই এখানে।'

কপালে নদীর চড়ার মত গোটাকয়েক ভাঁজ পড়ল পোলমানের। ঠোঁট কামড়ে ধরে ভাবছেন তিনি।

'অন্য কোন কারণে নয়,' পোলমানকে আশ্বস্ত করতে চাইল গ্রেবার, 'শুধু সতর্কতার জন্যে। হয়তো দরকারই হবে না তার।'

'কার জন্যে?' মুখ তুললেন পোলমান।

'একটা মেয়ের জন্যে, তাকে বিয়ে করতে যাচ্ছি আমি। ওর বাবা বন্দীশিবিরে, তাই ভয় হচ্ছে, ওকে গ্রেপ্তার করতে পারে এ সময়।'

'অসম্ভব কিছুই নয়। আগে থেকেই সতর্ক হওয়া ভাল। তুমি এ ঘরটাই ব্যবহার করতে পারো।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ, স্যার,' কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হয়ে গেল গ্রেবার।

বইয়ের তাকগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। পোলমানকে আগের চেয়ে অনেক সতেজ লাগছে। সস্নেহে বইগুলোর ওপর হাত বোলালেন তিনি। 'ইচ্ছে করলে কয়েকটা বই সাথে রাখতে পারো, অবসর সময়টা আনন্দে কাটবে।'

'না, স্যার,' মাথা নাড়ল গ্রেবার। 'মানুষের এত নিষ্ঠুরতা, এত নির্যাতন, নিপীড়ন, দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বইয়ের কথাগুলো ঠিক মেলাতে পারি না। অবিশ্বাস্য মনে হয়, এত কিছু জানার পরেও, এত বছরের সভ্যতার পরেও, এতটা নিচে নামতে পারে মানুষ!'

গভীর বেদনায় ওর দিকে তাকিয়ে রইলেন পোলমান। 'তোমার কথার জবাব দেবার মত কোন যুক্তি আমার নেই। যখন দেখি, অধিকাংশ কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী—সবাই বন্দীশিবিরে, লজ্জায়, ক্ষোভে, দুঃখে মরে যেতে ইচ্ছে করে।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বৃদ্ধ। প্রসঙ্গ বদলালেন, 'তুমি বিয়ে করছ?'

'জী, স্যার।'

তাক থেকে একটা বই নামালেন পোলমান। বইটা বাড়িয়ে দিলেন গ্রেবারের দিকে। 'এ ছাড়া তোমাকে দেবার মত কিছুই নেই আমার। এতে বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা ছবি আছে, যখন পড়তে ভাল লাগে না, তখন বইটা দেখি আমি। যতক্ষণ

বাতিতে তেল থাকে, ছবি আর কবিতায় সময়টুকু কাটে আমার।'

বইটা নিয়ে বেরিয়ে এল গ্রেবার। হাঁটতে হাঁটতে কবরখানার সামনে পৌঁছুল।

সন্ধ্যা নেমেছে। ডানার রোদের রঙ মুছে ফেলে ঘরে ফিরছে পাখিরা। আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ, এলোমেলো ঝোড়ো বাতাসে সরে যাচ্ছে দূর থেকে দূরে।

একদল রংরুট মার্চ করতে করতে রেল স্টেশনের দিকে যাচ্ছে। আমিও তো ওদের একজন হতে পারতাম, মনে হলো গ্রেবারের। হঠাৎ ওর চোখ পড়ল শীর্ণ একটা গাছের ওপর, সব ভুলে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল ও—পত্র-পল্লবে ফুলে ফুলে হারিয়ে গেছে তার রিক্ততা, দানের প্রাচুর্যে কানায় কানায় ভরে উঠেছে সে।

শিরায় শিরায় কি যেন বয়ে গেল গ্রেবারের। পোলমানের কথা ওর মনে পড়ল হঠাৎ। তাঁকে যখনই দেখে জীবনকে যেন আরও কাছ থেকে, আরও গভীরভাবে অনুভব করে ও। কেন?

উনিশ

'এক মিনিট দাঁড়ান, দেখছি কোথায় আছে।' টেবিল থেকে চশমাটা তুলে নিয়ে পাশের ঘরে গেল লোকটা।

কাগজপত্র ঠিক আছে কিনা জানতে এসেছে গ্রেবার, সাথে এলিজাবেথ। তীক্ষ্ণ চোখে কাউন্টারের ওপাশে বসা লোকটাকে লক্ষ্য করছিল গ্রেবার, কোনরকম বেগতিক দেখলেই পালানোর মতলব। লোকটা ভেতরে যেতেই চাপা কণ্ঠে এলিজাবেথকে বলল, 'শিগগির বাইরে চলে যাও তুমি। আড়াল থেকে লক্ষ্য করবে আমাকে, মাথা থেকে হ্যাট খুলতে দেখলেই বুঝবে, গোলমাল আছে। সেক্ষেত্রে সোজা পোলমানের ওখানে চলে যাবে।'

এলিজাবেথকে ইতস্তত করতে দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠল গ্রেবার, 'দেরি করো না, লক্ষ্মীটি, যাও। কে জানে, ব্যাটা হয়তো খবর দিতে গেল কাউকে।'

'যদি জিজ্ঞেস করে আমার কথা?'

'বলব, মাথা ধরেছে তোমার, বাইরে গিয়েছ খোলা হাওয়ায় দাঁড়াতে।'

ভেতর থেকে ফিরে এল লোকটা। গ্রেবারকে একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'ফ্রয়লাইন ক্রুজে কোথায়?'

'মাথা ধরেছে বলে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। তা কাগজপত্র ঠিক আছে তো সব?'

'তা আছে। আপনারা কবে বিয়ে করতে চান?'

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

'এখনই করতে পারেন,' হাসল লোকটা।

বাইরে থেকে এলিজাবেথকে ডেকে নিয়ে এল গ্রেবার।

www.BanglaBook.org

কাগজপত্র ওদের হাতে ফিরিয়ে দিল লোকটা। 'তোমার বাবাকে আমি চিনতাম,' এলিজাবেথকে জানাল সে। 'খুব ভাল লোক উনি। তুমি কোন চিন্তা করো না, আমি সবকিছু ঠিকঠাক করে দেব; দুপুরে রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে বিয়েটা সেরে ফেলো।'

বাড়ি ফিরে গেল এলিজাবেথ; বিয়ের আগে নাকি মেয়েদের অনেক কাজ থাকে, সেসব সারতে। গ্রেবার প্রথমে গেল লণ্ড্রিতে। প্যান্ট-শার্ট ইস্ত্রি করতে দিয়ে সেলুনে ঢুকল। চুল ছাঁটিয়ে, প্যান্ট-শার্ট নিয়ে দোকানে গেল ফুল কিনতে। একগুচ্ছ ফুল কিনে ফিরতি পথ ধরল। একটু পরেই অস্বস্তি বোধ হতে লাগল ওর; মনে হচ্ছে, সবাই তাকিয়ে আছে ওর দিকে, সবাই জানে ওর ফুল নিয়ে যাবার কারণ। অস্বস্তিতে একবার উঁচু করে ধরছে, আরেকবার ঝুলিয়ে নিচ্ছে তোড়াটা, কিন্তু নিচু করলেই জড়ানো কাগজটা খুলে আসতে চাইছে বারবার। বিরক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত কাগজটা খুলে ফেলল গ্রেবার, সাথে সাথে চোখে পড়ল ছবিটা—চারজন মানুষের ছিন্নমুণ্ড, নিচে লেখা: জার্মানীর যুদ্ধজয়ে অবিশ্বাসীদের শাস্তি। হঠাৎ মনে পড়ল ওর, থার্ড রাইখে গিলোটিন নিষিদ্ধ, তার মানে কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে ধড় থেকে আলাদা করা হয়েছে মুণ্ডগুলো।

যা ভেবেছিল গ্রেবার তার চেয়ে অনেক ফাঁকা রেজিস্ট্রি অফিসটা। উঁচু মেঝেতে চেয়ার-টেবিল পাতা, দেয়ালে ঝুলছে হিটলারের আবক্ষ ছবি, ছবির নিচে ঈগল আর স্বস্তিকা চিহ্ন।

মাঝবয়েসী একজন সৈনিক আর তার ভাবী বধূ এসেছে ওদের আগে। মেয়েটা শান্ত থাকলেও উত্তেজিত দেখাচ্ছে সৈনিককে। গ্রেবার শুনল, সৈনিকটাকে প্রায় ধমকে উঠল রেজিস্ট্রার, 'সাক্ষী কোথায়?'

'আমি ভেবেছি,' মুখ শুকিয়ে গেছে সৈনিকের, 'এ অবস্থায় সাক্ষী লাগে না।'

'যে কোন অবস্থায়ই সাক্ষী লাগে,' খেঁকিয়ে উঠল রেজিস্ট্রার।

অসহায়ভাবে গ্রেবারের দিকে ফিরল সৈনিকটা। 'আপনারা যদি আমাদের সাক্ষী হতেন, কমরেড।'

'অবশ্যই,' হাসল গ্রেবার, 'আমিও পুরোপুরি ভুলে গিয়েছিলাম সাক্ষীর কথা। আপনারাও আমাদের বেলায় তাহলে সাক্ষী হবেন।'

'নিশ্চয়ই,' খুশিতে চকচক করে উঠল লোকটার মুখ।

সাক্ষীর সমস্যা এভাবে মিটে যেতে দেখে হাঁড়ির মত মুখ হলো রেজিস্ট্রারের। গম্ভীর মুখে বলল গ্রেবারকে, 'আপনার কাগজপত্র দেখি!'

কাগজগুলো এগিয়ে দিল গ্রেবার। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সেগুলো দেখল লোকটা। একটা ফর্ম বের করে বলল, 'এখানে সই করুন, চারজনই।'

সই করল ওরা। রেজিস্ট্রার হাত বাড়িয়ে দিল স্বামী-স্ত্রীর দিকে। 'মহান ফুয়েরারের নামে আপনাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।' হাত মিলিয়ে গ্রেবারের দিকে ফিরল সে, 'আপনার সাক্ষী?'

www.BanglaBook.org

'কেন?' অবাক হলো গ্রেবার, 'এঁরাই তো!'

'উঁহুঁ,' এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল রেজিস্ট্রার, 'ওঁদের থেকে শুধু একজনকে নিতে পারবেন, সাক্ষী হিসেবে দু'জন স্বনির্ভর এবং আলাদা লোক লাগবে। স্বামী স্ত্রী হলে হবে না।'

ঠাণ্ডা হয়ে গেল গ্রেবার; পাগলের মত তাকাল এদিক-ওদিক, কাউকে চোখে পড়লেই চেপে ধরবে এই আশায়।

অত্যন্ত সুদর্শন অল্পবয়েসী একটা ছেলে এগিয়ে এল ওদের কাছে। 'সাক্ষী হিসেবে আমাকে নিতে নিশ্চয়ই আপত্তি নেই?'

হাতে যেন আকাশের চাঁদ পেল গ্রেবার। আরও হাঁড়ি হয়ে গেল রেজিস্ট্রারের মুখ। 'কাগজ-পত্র আছে?'

পকেট থেকে আইডেনটিটি কার্ডটা বের করে রেজিস্ট্রারের সামনে ছুঁড়ে দিল ছেলেটা। কার্ডের ওপর চোখ বুলিয়েই একলাফে চেয়ার ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল রেজিস্ট্রার। 'হাইল হিটলার, হের।'

'হাইল হিটলার,' বলল ছেলেটা, 'কোথায় সই করতে হবে?'

'এখানে, হের।' কাঁপা কাঁপা হাতে ফর্মটা সামনে বাড়াল রেজিস্ট্রার।

'এভাবে যেন সৈনিকদের আর অসুবিধার মধ্যে ফেলতে না দেখি।' সই করে কলম বন্ধ করতে করতে বলল ছেলেটা।

'আমাকে ক্ষমা করবেন, হের লীডার,' গলাটা কেঁপে গেল রেজিস্ট্রারের।

অবাক বিস্ময়ে সবকিছু শুধু দেখেই যাচ্ছিল গ্রেবার, ছেলেটা চলে যেতেই সংবিৎ ফিরল; ফর্মটার ওপর ঝুঁকে পড়ল ও, দেখল, দ্বিতীয় সাক্ষী এস. এস. কমাণ্ডার হিলডাব্র্যান্ট, প্রথমজন এঞ্জিনিয়ার ক্লোটস্।

হিটলারের লেখা দুটো 'আমার সংগ্রাম' বই বের করল রেজিস্ট্রার। 'ফুয়েরারের উপহার।'

বইটা প্রায় জোর করেই ক্লোটস্‌কে গছাল গ্রেবার, বদলে তার কাছ থেকে উপহার হিসেবে সসেজ পেল কিছুটা। ওদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে রাস্তায় নামল দু'জন।

'জানো,' বিষণ্ণ গ্রেবারের কণ্ঠস্বর, 'বিনডিং আমার বন্ধু, তবু ওকেও আজকের দিনের কথা বলিনি, অথচ কী দুর্ভাগ্য আমাদের, সারা জীবনের জন্যে আমাদের সাথে জড়িয়ে গেল একজন এস.এস. গ্রুপ লীডারের নাম।'

করুণ দু'চোখ ওর দিকে তুলল এলিজাবেথ। বলার মত কিছুই নেই ওর।

মার্কট প্লাটস পেরিয়ে এল ওরা। এখনও সগর্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে মারীনফির্শের ভাঙা চূড়া। উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা উড়ছে, গাইছে চারপাশে—কী নিশ্চিন্ত ওরা, কী সুখী। অথচ, ভাবছে গ্রেবার, আজকের দিনে তার ওরকমই সুখী হবার কথা, তবু কই, তেমন সুখী তো মনে হচ্ছে না নিজেকে!

শহরের বাইরে, বনের মাঝে খোলা একটা জায়গায় শুয়ে আছে ওরা দু'জন। ওদের চারপাশে বাসর সাজিয়েছে প্রিমরোজ আর ভায়োলেট। গন্ধে মাতোয়ারা বনভূমি,

মৃদু বাতাস আরও ছড়িয়ে দিচ্ছে ফুলের সুরভি—স্বপ্নময় পরিবেশ।

'সারাটা বনভূমি,' ফিসফিস করল এলিজাবেথ, যেন পুরো পরিবেশটা কাচের চেয়েও ঠুনকো, একটু জোরে শব্দ হলেই ভেঙে যাবে, 'যেন রূপকথার পাতা থেকে উঠে এসেছে। গাছের পাতাগুলো কী অপরূপা—চিকচিক করছে, জ্বলছে। কেন?'

'পাতা নয় ওগুলো,' সস্নেহে হাসল গ্রেবার, 'রাংতা। সূর্যের আলো পড়ে চিকচিক করছে।'

'রাংতা? ওগুলো এল কোত্থেকে?'

'প্লেন থেকে ফেলা হয়েছে, নিশানার জন্যে। বাতাসে সারা বন জুড়ে ছড়িয়ে যাবে ওগুলো—দিনে সূর্যের আলোয় চকচক করবে, রাতে চাঁদের আলোয়; কিংবা রাডারে ওদের অবস্থান বোঝা যাবে। ব্যস, বম্বারের পক্ষে বোমা ফেলা তখন পানির মত সোজা।'

'আবার সেই যুদ্ধ,' হতাশায় ভারী শোনাল এলিজাবেথের কণ্ঠ। দু'হাতে হাঁটু জড়িয়ে ধরে চিবুক রাখল হাঁটুতে। কাঁধের ওপর গড়িয়ে নামল একরাশ কালো চুল।

বাতাসে অরণ্যের ডাক, পাখির গান, সবুজ পাতার ফাঁকে সোনালি আলোর লুকোচুরি—হাওয়ায় হাওয়ায় উচ্ছল; উজ্জ্বল বসন্তদিনে ভাসছে গ্রেবারের ছোটবেলার স্মৃতি। পরম মমতায় ও হাত বোলাল এলিজাবেথের রেশমী কোমল চুলে।

'আর যুদ্ধ নয়, অন্য স্বপ্ন দেখব আমরা। যুদ্ধের পর কোথায় যাব আমরা, বলো তো!'

'তুমি বলো।'

'সুইজারল্যাণ্ড?'

'উঁহু।'

'পোর্টোরিকো?'

'না।'

'তাহলে?'

'লোকারনোতে। কিছুদিন আগে মস্তবড় শান্তি সম্মেলন হয়ে গেল ওখানে। সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, যুদ্ধের আর দরকার নেই কোন···'

'যুদ্ধের দরকার কি ছিল কোনদিন?' বুকের ভেতর টুপটুপ করে রক্ত ঝরছে গ্রেবারের, আবার এসে গেল সেই যুদ্ধের কথা। এ থেকে কি মুক্তি নেই ওদের?

দু'হাতে ও কাছে টেনে নিল এলিজাবেথকে। ওর বুকের ভেতরে মিশে একাকার হয়ে গেল এলিজাবেথ, নিঃশব্দে আসন করে নিল হৃদয়ের মাঝখানে। উষ্ণতা এল, মাতাল হলো বসন্তের বাতাস, পাখি গান গাইল, নদী বয়ে গেল, হেসে উঠল নীল আকাশ।

সন্ধ্যা নামছে। থমকে গেছে বাতাস। হঠাৎ গুমগুম শব্দে চমকে উঠল গ্রেবার। কোথায় ও? ফ্রন্টে? ধড়মড় করে উঠে বসতেই মনে পড়ল সবকিছু; লজ্জা পেল সেই সাথে, আবার আকাশ কাঁপাল গুরুগুরু ধ্বনি।

www.BanglaBook.org

চমকে উঠে বসল এলিজাবেথ, চোখজোড়া আতঙ্কিত।

'ভয়ের কিছু নেই, মেঘ ডাকছে,' হেসে উঠল গ্রেবার।

'মেঘ? এখন?'

'তাই তো, ওকে বলে দেয়া উচিত ছিল এখন না ডাকতে,' হো হো করে হেসে উঠল গ্রেবার।

কিল তুলল এলিজাবেথ।

আকাশের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত চিরে দিল বিদ্যুতের ফলা, দেখতে দেখতে কালো মেঘে ঢেকে গেল আকাশ; ঝোড়ো বাতাস বইল, সাথে সাথেই গাছের পাতায় কাঁপন তুলল তুমুল বৃষ্টি।

পড়িমরি করে ছুটল দু'জন, হাঁপাতে হাঁপাতে পৌঁছুল একটা টিনের চালায়। এরই মধ্যে ভিজে প্রায় একশা হয়ে গেছে ওরা।

আধঘণ্টা মত লাগল বৃষ্টি থামতে। আবার আকাশে ফুটল কাঁচা সোনার রঙ।

রাস্তার মোড়ে আসতেই চোখে পড়ল দৃশ্যটা—পানির পাইপ বসাচ্ছে একদল শ্রমিক, সবার গায়ে ডোরাকাটা পোশাক, কামানো মাথা, শীর্ণ দেহ, চোখেমুখে কষ্টের ছাপ। পাশ দিয়ে রাইফেল হাতে ঘোরাফেরা করছে গার্ড; বোঝাই যায়, বন্দীশিবির থেকে আনা হয়েছে শ্রমিকগুলোকে।

চমকে উঠল এলিজাবেথ; তারপরই অসমসাহসী এক কাজ করল ও—ধীর পায়ে হাঁটতে লাগল বন্দীদের পাশ দিয়ে, যাবার সময় প্রত্যেকের মুখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে যাচ্ছে।

'এই যে,' চিৎকার করে উঠল একজন গার্ড, 'ওদিকে কোথায় যাওয়া হচ্ছে?'

হাঁটাটা একটু দ্রুত হলো এলিজাবেথের, চিৎকারটা যেন কানেই যায়নি ওর।

'কথা কানে ঢুকছে না নাকি?' ফের চেঁচিয়ে উঠল গার্ড, এবারে আগের চেয়ে জোরে।

গার্ডের চিৎকারে একজন এস.এস. অফিসারকে এগোতে দেখে মনে মনে প্রমাদ গুণল গ্রেবার। জানে, ডাকলেও এখন ফেরানো সম্ভব নয় এলিজাবেথকে, প্রত্যেকটা বন্দীকে না দেখে ছাড়বে না সে। দ্রুত এগিয়ে এস.এস. অফিসারের পথ প্রায় আগলে দাঁড়াল ও। 'আমরা একটা জিনিস খুঁজছি।' মাথায় প্রথমে যা এল, সেটাই বলল।

'কি জিনিস?'

'মুক্তো বসানো ব্রোচ একটা। এদিকেই কোথাও পড়েছে হয়তো। আপনাদের কেউ দেখেছে···'

'কাগজপত্র দেখি!' কঠোর চোখে ওর দিকে হাত বাড়াল অফিসার। বছর কুড়ি বয়েস হবে, চোখের ভাষায় স্টেইনব্রেনার কিংবা হাইনির সাথে কোন পার্থক্য নেই তার।

পকেট থেকে বিয়ের সার্টিফিকেটটা বের করল গ্রেবার। 'এস.এস. গ্রুপ লীডার হিলডাব্র্যাণ্ট আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু।'

'ফুয়েরার না?' বিদ্রূপ করল অফিসার। কিন্তু সার্টিফিকেটে হিলডাব্র্যাণ্টের সই

দেখে সাথে সাথে চেহারা বদলে গেল তার। 'দুঃখিত। কিন্তু এটা নিষিদ্ধ এলাকা, এখানে ঢুকতে পারেন না আপনারা।'

ফিরে আসছে এলিজাবেথ, চোখে বিষণ্ন দৃষ্টি—ডা. ক্রুজেকে দেখতে পায়নি কোথাও।

'আপনাদের ঠিকানাটা দিন। ব্রোচটা পেলে পাঠিয়ে দেব। কি, পেয়েছেন?' শেষের কথাটা এলিজাবেথের উদ্দেশে বলল সে।

এলিজাবেথের চোখজোড়া বড় বড় হতে দেখেই দ্রুত বলে উঠল গ্রেবার, 'কালকের হারানো ব্রোচটার কথা বলেছি ওঁকে। খুঁজে পেলে জিনিসটা হিলডাব্র্যান্টের কাছে পাঠাবেন ওঁরা।'

'ধন্যবাদ,' বলল এলিজাবেথ। ম্লানমুখে তাকিয়ে রইল বন্দীদের দিকে।

'আপনি,' ভুল বুঝল অফিসার, 'কোন চিন্তা করবেন না, ওই হারামজাদাদের কেউ নিয়ে থাকলে ঠিক বের করে ফেলব।'

'অন্য কোথাও হারাতে পারে জিনিসটা,' এতক্ষণে স্বাভাবিক কণ্ঠে কথা বলল এলিজাবেথ। অফিসারকে আবার ধন্যবাদ জানিয়ে চলে এল দু'জন।

'আচ্ছা মিথ্যুক তো তুমি!' বেশ কিছুটা সরে আসতেই চোখ পাকাল এলিজাবেথ।

'দশ বছরের অভিজ্ঞতা,' শার্টের কলারটা একটু ঝাঁকাল গ্রেবার। 'কিন্তু থাকব কোথায় রাতে! বিনডিংয়ের···'

'দরকার নেই,' বাধা দিল এলিজাবেথ। 'বাকি ক'টা দিন আমার ওখানেই থাকবে।'

'অর্থাৎ কাল তোমার কারখানায় যাবার আগ পর্যন্ত একসাথে থাকতে পারছি!'

'কালকে,' হাসি হাসি মুখে জানাল এলিজাবেথ, 'কারখানায় যাচ্ছি না। ছুটি নিয়েছি দু'দিনের।'

'বলো কি!' রাস্তার মধ্যেই এলিজাবেথকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেয়ে ফেলল গ্রেবার। 'দুষ্টু!'

বিশ

দু'দিন পর। দুপুর। আচমকা নিস্তব্ধতাকে খান খান করে দিয়ে শুরু হলো বিমান আক্রমণ। সকাল থেকে মেঘলা ছিল আকাশ; নিচু মেঘের আড়ালে কখন যে এসে গেছে মৃত্যুদূত, কেউ টেরই পায়নি। যখন পেল, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে গ্রেবার; মাথায় একটাই চিন্তা, পোশাকের কারখানা থেকে যে করেই হোক বের করে আনতে হবে এলিজাবেথকে। জানে, শত্রু-বিমানের প্রধান লক্ষ্যই কারখানাটা।

রাস্তায় প্রচণ্ড ভিড়, উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটছে আতঙ্কিত লোকজন। এয়ার-রেইড

www.BanglaBook.org

ওয়ার্ডেন সবাইকে সাহায্য করছে সেলারে ঢুকতে। কোনরকমে পাশ কাটিয়ে ছুটল গ্রেবার।

ক্লান্ত অলস ভঙ্গিতে হাল ছেড়ে দিল একটা বাড়ি, ওর চোখের সামনে আস্তে করে বসে পড়ল পুরো কাঠামো। ধুলোর পাহাড় উঠল আকাশে, তারপরই ভেসে এল বিস্ফোরণের ভোঁতা আওয়াজ।

থমকে গেল গ্রেবার। পায়ের নিচে ভূমিকম্পের মত কাঁপছে মাটি। সহসা প্রচণ্ড ধাক্কায় ছিটকে পড়ল ও। একটা পাথরের সাথে মাথাটা ঠুকে যেতেই আঁধার হয়ে এল সব, কিন্তু মনের অতলে কে যেন সতর্ক করে দিল সাথে সাথে, জ্ঞান হারালেই মৃত্যু, সাবধান!

অতিকষ্টে চোখ মেলল গ্রেবার, বারকয়েক মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েই ছুটল সামনে।

দাউদাউ করে জ্বলছে আগুনের লেলিহান শিখা, জড়িয়ে ধরতে চাইছে যেন আকাশটাকে; চারপাশে মুহুর্মুহু কেঁপে উঠছে, ছিটকে শূন্যে উঠে যাচ্ছে ইঁট কাঠ পাথর, বুকের ভেতরে কাঁপন ধরিয়ে দিচ্ছে বোমারু বিমানের তীক্ষ্ণ শিস, আকাশকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে অ্যান্টি-এয়ারক্র্যাফট গানের গোলা।

মাতালের মত টলতে টলতে এগোল গ্রেবার। লোকজন আতঙ্কিত চোখে চেয়ে আছে ওর দিকে। হঠাৎ দেখল ও, ফুটফুটে একটা বাচ্চা মেয়ে—একহাতে শখের পুতুল, মুখে আঙুল পুরে দাঁড়িয়ে আছে দেয়ালের কাছে, দু'চোখে জলের ধারা, থরথর করে কাঁপছে ভয়ে।

থমকে দাঁড়াল গ্রেবার। একজন এয়ার-রেইড ওয়ার্ডেনকে দেখতে পেয়ে ইশারায় ডাকল তাকে। মেয়েটাকে দেখিয়ে দিয়ে আবার ছুটল। পা-দুটোকে সীসার মত ভারী লাগছে ওর এখন।

হঠাৎ খকখক করে প্রচণ্ডভাবে কেশে উঠল ও, একটা বাড়ির খোলা দরজা দিয়ে প্রবল বেগে বেরিয়ে এসেছে ধোঁয়া আর আগুনের হলকা—ফুসফুসটা যেন জ্বলে গেল ওর, পটপট করে চুল পুড়ল কয়েকটা।

ধোঁয়া একটু কমতেই ভেতরে তাকাল গ্রেবার, সাথে সাথে বোঁ করে ঘুরে উঠল ওর মাথাটা; সিঁড়ির ওপর চিৎ হয়ে পড়ে আছে একটা মেয়ে—অসামান্য সুন্দরী, হাতে সোনার বালা, গলার ঠিক নিচেই রক্তের সাগর। উঠনে পড়ে আছে একটা পাখির খাঁচা, ভেতরে পাগলের মত এ-শিক থেকে ও-শিকে ছুটোছুটি করছে পাখিটা। খাঁচার দরজা খুলে পাখিটাকে ছেড়ে দিল গ্রেবার। ঘুরপথে ছুটল কারখানার দিকে। অনন্তকাল পরে যেন ও পৌঁছুল সেখানে। ভেতরে ঢুকতে যেতেই বাধা পেল গার্ডের কাছে। 'কোথায় যাচ্ছেন? নিষিদ্ধ এলাকা এটা। পেছনের পার্কে সেলার আছে, ওখানে যান শিগগির।'

আসার সময়ই দেখে এসেছে গ্রেবার, বোমার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত পার্ক। চষা খেতও বোধ হয় এর চেয়ে সুন্দর। মনের মধ্যে ক্ষীণ একটা আশা ছিল, কারখানার হয়তো কিছু হয়নি, সত্যি সত্যিই হয়নি দেখে কলজেটা লাফ দিয়ে উঠল ওর।

সহসা তীক্ষ্ণ শব্দ উঠল বাতাসে। হৃৎপিণ্ডের মধ্যে যেন ছুরি চালিয়ে দিল কেউ।

চোখের পলকে শূন্যে উঠে গেল কারখানার পেছনের অংশ, আগুনের লেলিহান শিখা গ্রাস করল আকাশটাকে।

'দেখছেন তো,' চেঁচিয়ে উঠল গার্ড, 'কি ভয়ঙ্কর অবস্থা, শিগগির সেলারে যান।'

শূন্য দৃষ্টিতে গার্ডের দিকে তাকাল গ্রেবার। 'ওভারকোট সেকশন কি কারখানার পেছনদিকে?'

'না, পাশে। কেন?'

'আমার স্ত্রী···'

'সবাই সেলারে, ওদের জন্যে চিন্তা করবেন না। সমস্যা অন্যদের।'

'মানে?'

'মানে, যারা বন্দীশিবির থেকে এসেছে তাদের সেলারে ঢোকার অনুমতি নেই।'

পা দুটো যেন পেরেক দিয়ে কেউ মাটিতে গেঁথে দিল গ্রেবারের। থরথর করে শরীরটা কাঁপিয়ে দিয়ে গেল ঠাণ্ডা একটা স্রোত। 'ঈশ্বর, তুমি এখনও আছ!'

'কতদিন হলো বিয়ে হয়েছে আপনাদের?' ওর অবস্থা দেখে বোধ হয় করুণা হলো গার্ডের।

'পাঁচদিন।'

'ঠিক আছে, আপনি দাঁড়ান এখানে।' একছুটে ভেতরে চলে গেল গার্ড। একটু পরেই ফিরে এসে জানাল, ওভারকোট সেকশন পুরোপুরি অক্ষতই আছে। সেলারও।

আচ্ছন্নের মত ফিরছে গ্রেবার। দু'পাশে হিংস্রতার নগ্ন শোভাযাত্রা, স্ট্রেচার হাতে ছুটোছুটি করছে লোকজন, তৈরি হচ্ছে রক্তাক্ত, পোড়া লাশের স্তূপ—একপাশে পড়ে আছে সোয়েটার পরা কোন বাচ্চার নরম কোমল একটা হাত, পাশে বুটসুদ্ধ কারও পা, থইথই রক্তের সমুদ্রে সোনালি চুলের শৈবাল, পাশে স্থির নিথর পুষিবেড়াল—মানুষ এবং পশু!

হাঁটছে গ্রেবার। কিছুতেই যেন আর কিছু এসে যায় না ওর। জার্মানি, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, আফ্রিকা, রাশিয়া—হয়তো পৃথিবীর সর্বত্রই এই একই দৃশ্য, মানুষের বেদনা, লাঞ্ছনার অতল সমুদ্র; যুদ্ধ থামলেও তো এ কান্না থামবে না মানুষের! কত যুগ লাগবে এ ব্যথা ভুলতে?

এলিজাবেথের বাড়ির ছাতে আগুন ধরে গেছে, কাঠামোটা অক্ষত এখনও। আশপাশের তিনটে বাড়ি মিশে গেছে মাটিতে।

রাস্তায় বিছানা, বাক্স আর জিনিসপত্রের স্তূপ, আশপাশের আগুন লাগা বাড়ি থেকে ক্রমাগত ছুঁড়ে দেয়া হচ্ছে নিচে। তিনতলার জানালায় একঝলক দেখা গেল একজনকে। ধোঁয়ার মধ্যেই ফ্রাউ লিজারকে চিনল গ্রেবার, ব্যস্ত হাতে মালপত্র গোছগাছ করছে সে।

একেক লাফে তিনটে করে সিঁড়ি টপকে ছুটল গ্রেবার। সিঁড়ির দরজাটা হাট

www.BanglaBook.org

করে খোলা। এলিজাবেথের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল ও। চেয়ারটা টেনে নিয়ে জানালার ধারে বসল। মাথার ওপরে জ্বলন্ত ছাত—যে কোন মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে, যেন ও ভুলেই গেছে সে কথা। ঘরের প্রতিটি জিনিসের দিকে পরম মমতায় তাকাচ্ছে গ্রেবার, অনুভব করছে এলিজাবেথের স্পর্শ, অথচ একটু পরেই সর্বনাশা আগুন গ্রাস করে নেবে সব, ভাবতেই বুকের মধ্যে কী যে কষ্ট!

খাটের নিচ থেকে একটা খালি সুটকেস বের করল গ্রেবার—মাথার ভেতরে চিন্তার ঝড় বইছে ওর, কি কি নেবে ঠিক করতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত এলিজাবেথের জিনিস দিয়েই শুরু করল: আলমারি থেকে পোশাক, ড্রয়ার হাতড়ে গোটা দু'য়েক পুরানো গয়না আর ড. ক্রুজের ছবিটা ভরল সুটকেসে, তারপর আবার এসে বসল চেয়ারে। দ্রুত চিন্তা করছে, আর কি নেয়া যায়! শেষে ঠিক করল বিছানাটাও নেবে—কম্বল, বালিশ, চাদর, তোষক দিয়ে বিশাল একটা পোঁটলা হলো, তিনতলা থেকে নিচে ছুঁড়ে ফেলল সেটা। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসার আগে শেষবারের মত তাকাল গ্রেবার চারপাশে। হঠাৎ চোখ পড়ল টেবিলের নিচে রাখা ওর নিজের ব্যাগটার দিকে। ওটার কথা একেবারে ভুলেই গিয়েছিল ও। ব্যাগ ধরে টান দিতেই মেঝের ওপর আছড়ে পড়ল ওর হেলমেট। স্থির চোখে কিছুক্ষণ ওটার দিকে তাকিয়ে থাকল গ্রেবার, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, তারপর এক লাথিতে খাটের নিচে পাঠিয়ে দিল হেলমেটটাকে।

আস্তে আস্তে, সময় নিয়ে, যন্ত্রণা দিয়ে পুড়ছে বাড়িগুলো। জীবন, সংসার সব নেমে এসেছে রাস্তায়, পা ফেলার জায়গা নেই কোথাও। একটা পরিবার এর ভেতরেই চেয়ার-টেবিল পেতে খেতে শুরু করেছে।

এককোণে নিজের মালপত্র পাহারা দিচ্ছে ফ্রাউ লিজার—কোলে বাচ্চা, ঘুমিয়ে পড়েছে কাঁদতে কাঁদতে। মালপত্রের পাশে ঠেস দিয়ে রাখা হিটলারের ছবিটা দেখে মুখ বেঁকিয়ে হাসল গ্রেবার।

চোখ তুলতেই এলিজাবেথকে দেখল ও। উদ্‌ভ্রান্তের মত তাকাচ্ছে এপাশ-ওপাশ, খুঁজছে কাউকে।

বুকের খাঁচার মধ্যে লাফ দিল হৃৎপিণ্ডটা। চিৎকার করে ডাকল, 'এলিজাবেথ!' জিনিসপত্র মাড়িয়ে, লোকজনের বিরক্তি উপেক্ষা করে ছুটল, কাছে গিয়ে জড়িয়ে ধরল ওকে। 'আমি তোমার কারখানায় গিয়েছিলাম, পাইনি তোমাকে।'

'আর আমি,' ওর বুকের মধ্যে কাঁপছে এলিজাবেথ, 'ভেবেছি, তুমি···'

ওকে আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরল গ্রেবার। 'তোমার কাপড়-চোপড় প্রায় সবই নামিয়ে এনেছি, বিছানাও। বাকি জিনিসগুলো···'

'কোন দরকার নেই,' বাধা দিল এলিজাবেথ।

'কেন? এখনও চেষ্টা করলে বের করা যাবে।'

'ওখানে যা আছে, যে স্মৃতি আছে, জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যাক না! কি হবে বোঝা বাড়িয়ে। কি আর আছে আমাদের বলো? সবই তো নতুন করে শুরু করতে হবে।'

বৃষ্টি নামল হঠাৎ। ব্যস্ত হয়ে উঠল লোকজন। ফ্রাউ লিজার ছাতা মেলে ধরল, আশপাশের আরও কয়েকজনও। ফুয়েরারের ছবির ওপর দিয়ে গড়িয়ে নামছে জল, যেন কাঁদছে হিটলার।

নিজের ওভারকোটটা এলিজাবেথের গায়ে জড়িয়ে দিল গ্রেবার। ক্যানভাস দিয়ে বিছানাপত্র ঢেকে চিন্তিত মুখে বলল, 'রাতে যে ঘুমোবো কোথায়, কে জানে!'

'কেন, এখানে অসুবিধা কি?' হাসছে এলিজাবেথ।

'এখানে, এই রাস্তায়?' চোখ কপালে তুলল গ্রেবার, 'তুমি পারবে?'

'কেন পারব না?'

'বিনডিংয়ের বাড়িতে গেলে হয় না?'

'না।'

'হের পোলমানের বাড়িতে অবশ্য যাওয়া যায়,' কথাটা হঠাৎ মনে পড়ায় আশার আলো দেখল গ্রেবার, 'ওঁকে আগেই জানিয়ে রেখেছি কথাটা, অবশ্য বাড়িটা যদি এখনও টিকে থাকে।'

'আরও কিছুক্ষণ দেখি, আমাদের তলাটা এখনও পুরোপুরি জ্বলেনি। হয়তো বৃষ্টিতে নিবেও যেতে পারে আগুন।'

ব্যাগ হাতড়ে একটা হুইস্কির বোতল বের করল গ্রেবার। গ্লাস খুঁজে নিয়ে হুইস্কি ঢালল, গ্লাসটা বাড়িয়ে দিল এলিজাবেথের দিকে। নিজে চুমুক দিল বোতলে।

হঠাৎ প্রচণ্ড আওয়াজে কেঁপে উঠল ওরা। চোখের সামনে আস্তে করে অদৃশ্য হয়ে গেল ওদের বাড়ির অর্ধেকটা। এলিজাবেথ নির্বাক; হাউমাউ করে কেঁদে উঠল কয়েকজন। ধোঁয়া, আগুন আর ধুলো লাফ মেরে ধরতে চাইল আকাশটাকে, বৃষ্টি হয়ে ঝরল তার কষ্ট।

কাঁদছে ফ্রাউ লিজার। দাউদাউ করে জ্বলছে বাড়িটা, সেই সাথে কাঠের যত আসবাবপত্র।

'ওপর থেকে নামার সময়,' এলিজাবেথের কানের কাছে ফিসফিস করল গ্রেবার, 'ফ্রাউ লিজারের ডেস্কের ড্রয়ারে কেরোসিনের পুরো বোতলটা খালি করে দিয়ে এসেছি।'

'তাই?' উজ্জ্বল হয়ে উঠল এলিজাবেথ, 'যাক, অনেকক'টা লোক বেঁচে গেল বন্দীশিবিরে পচে মরার হাত থেকে।'

ব্যাগ আর এলিজাবেথের সুটকেসটা তুলে নিল গ্রেবার। 'চলো, দেখি, রাতের ব্যবস্থাটা করতে পারি কি না। না হলে তো পার্কের বেঞ্চ আছেই।'

'গতকাল,' ফিসফিস করে যেন নিজেকেই শোনাচ্ছে এলিজাবেথ, 'কল্পনাতেও ছিল না, অথচ আজ কত সহজে সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে চলে যাচ্ছি।'

পোলমানের দরজায় অনেকক্ষণ কড়া নেড়েও কারও সাড়াশব্দ না পেয়ে ফিরে এল গ্রেবার। 'নাহ্, কেউ নেই।'

'হয়তো এখানে থাকেন না এখন,' সন্দেহ প্রকাশ করল এলিজাবেথ।

'কিন্তু যাবেন কোথায় তাহলে?'

'গেস্টাপোর লোকেরা ধরে নিয়ে যায়নি তো?

'উঁহুঁ, তাহলে জায়গার চেহারাই বদলে যেত।'

চুপচাপ কিছুক্ষণ ভাবল গ্রেবার। নিঝুম রাত, কালো ধোঁয়া, রক্ত আর বারুদের গন্ধ ঢেকে রেখেছে আকাশ। ঈশ্বরের এত বড় আকাশের নিচে, কোথাও কি কোন আশ্রয় নেই ওদের জন্যে?

হঠাৎ কথাটা মনে পড়তেই উল্লসিত হয়ে উঠল ও। 'চলো, পেয়েছি।' হাত ধরে টানল এলিজাবেথের।

পোলমানের বাসার কাছেই বাড়িটা। পেছনের দিকটা ধসে পড়েছে, সামনের দিকটা মোটামুটি অক্ষত।

পোর্টিকোর নিচে আস্তানা গাড়ল ওরা। ধ্বংসস্তূপ হাতড়ে একটা লোহার শিক খুঁজে আনল গ্রেবার। শিকটা পুঁতে ক্যানভাস টাঙিয়ে তাঁবুর মত বানাল। বিছানা পেতে, জিনিসপত্র গুছিয়ে এলিজাবেথকে পাঠাল মোড়ের কল থেকে জল আনতে। স্টোভ ধরিয়ে খাবারের টিনগুলো বের করল ও।

জল নিয়ে এলিজাবেথ ফিরল, মুখে মিটিমিটি হাসি।

'কি ব্যাপার, হাসছ কেন?' অবাক হলো গ্রেবার।

'তোমার সংসার দেখে।'

'দুষ্টু!'

খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ল ওরা, অল্পক্ষণের মধ্যেই তলিয়ে গেল গভীর ঘুমে।

একুশ

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল গ্রেবারের। একনিমেষে সজাগ হয়ে গেছে সমস্ত স্নায়ু; কিছু একটা হয়েছে কোথাও। এক মুহূর্ত পরেই শোনা গেল শব্দটা—ভগ্নস্তূপের ওপরে সতর্ক পায়ে চলার আওয়াজ।

আস্তে করে চাদর সরাল ও। বুকের ওপর থেকে এলিজাবেথের হাত নামিয়ে রেখে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল।

আবছা অন্ধকারে দুটো ছায়ামূর্তি দেখা যাচ্ছে সামনে, পা টিপে টিপে এগিয়ে আসছে। কারা ওরা? গেস্টাপো, চোর, নাকি পোলমান? তাহলে সঙ্গের লোকটি কে?

পিছু নিল গ্রেবার। হঠাৎ ওর পায়ে লেগে একটা ইঁটের টুকরো ছিটকে যেতেই বিকট শব্দ হলো। চট্ করে ঘুরে দাঁড়াল ছায়ামূর্তি দুটো। 'কে?'

গলার স্বরে পোলমানকে চিনল গ্রেবার। বলল, 'আমি, স্যার; আর্নস্ট।'

'তুমি?' প্রকাণ্ড একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার আওয়াজ পেল গ্রেবার। 'এত রাতে এখানে? কি ব্যাপার?'

'স্যার,' কাঁচুমাচু গলায় বলল গ্রেবার, 'আমাদের বাড়িটা পুড়ে গেছে আজকে।

www.BanglaBook.org

আমার আর আমার স্ত্রীর থাকার জায়গা নেই। আপনাকে আগে একবার বলেছিলাম থাকার ব্যাপারে, তাই…'

পোলমানকে চুপচাপ থাকতে দেখে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছে গ্রেবার। অনেকক্ষণ পরে মনস্থির করলেন বৃদ্ধ। 'এসো।'

দরজা খুললেন পোলমান। একে একে ভেতরে ঢুকল ওরা, সবার শেষে পোলমান। দরজা বন্ধ করে লণ্ঠন জ্বাললেন। 'তোমার স্ত্রী কোথায়?'

'ওখানে।' আঙুল তুলে দিকনির্দেশ করল গ্রেবার, 'একটা বাড়ির বারান্দায়। বিছানাপত্র সাথে আছে কিছু, সেটা দিয়েই কাজ চালাচ্ছি।'

'তোমাকে একটা কথা বলা দরকার; গেস্টাপো তোমাদের এখানে দেখতে পেলে ভয়ঙ্কর বিপদে পড়বে তোমরা।'

'জানি আমি।'

'তোমার স্ত্রী জানে?'

'হ্যাঁ।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন পোলমান। 'পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি,' সঙ্গীর দিকে ফিরলেন, 'আমার ছাত্র, আর্নস্ট গ্রেবার। আর এ জোসেফ, পুরো নামটা তোমার না জানাই ভাল।'

অবাক হয়ে লোকটার দিকে তাকাল গ্রেবার। জোসেফ—তার মানে ইহুদি। বছর চল্লিশেক বয়েস হবে লোকটার—রোগা, পোড়-খাওয়া চেহারা; ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল সে।

'আমার মনে হয়,' মুখ খুলল জোসেফ, আশ্চর্য ভরাট কণ্ঠস্বর তার, 'বিপদের ঝুঁকি না নিয়ে আজকের মত রাতটা বাইরেই কাটিয়ে দিন।'

'আজ রাতের জন্যে কোন অসুবিধা হবে না,' জানাল গ্রেবার।

'তাহলে তো খুব ভাল কথা! কাল ক্যাথেরীনেনকির্শের গির্জায় গিয়ে খোঁজ নেবেন; নিচের তলার ঘরগুলো এখনও অক্ষতই আছে।'

'সেই ভাল, আর্নস্ট,' উৎসাহের সাথে বললেন পোলমান, 'এসব ব্যাপারে জোসেফ আমার চেয়ে অনেক ভাল বোঝে। অবশ্য,' একটু কুণ্ঠিত হলো তাঁর কণ্ঠ, 'মনে করো না যেন, তোমাদের থাকতে দিতে চাইছি না। শুধু তোমাদের নিরাপত্তার কথা ভেবেই…'

'না না,…' তাড়াতাড়ি বাধা দিল গ্রেবার, 'যা করেছেন, সেটুকুই যথেষ্ট।'

'কোন দরকার হলে ভোরবেলায় চলে এসো। এলে প্রথমে আস্তে, তারপর জোরে দুটো করে টোকা দেবে দরজায়।'

বিদায় নিয়ে চলে এল গ্রেবার। গুটিসুটি মেরে ঘুমোচ্ছে এলিজাবেথ। আলতো করে ওকে চুমো খেলো ও, আস্তে করে শুয়ে পড়ল পাশে। পাশ ফিরে ওকে জড়িয়ে ধরল এলিজাবেথ।

আকাশে ঊষার আভা। ঘুম ভাঙল এলিজাবেথের। প্রথমে বুঝতেই পারেনি কোথায় আছে ও, আরেকটু সজাগ হতেই মনে পড়ল সব।

www.BanglaBook.org

আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসল। দেখল, ওর আগেই উঠে পড়েছে গ্রেবার, মুখ-হাত ধুয়ে একেবারে ফিটফাট।

হাসল এলিজাবেথ। 'জিপসীদের মত রাত কাটালাম। দাঁড়াও, হাত মুখ ধুয়ে আসছি।'

বিছানাপত্র গুছিয়ে স্টোভ ধরাল গ্রেবার। আর তখনই খেয়াল হলো, এলিজাবেথের ড্রেসিং-টেবিলের ড্রয়ারে রাখা রেশন কুপনের কথা, বুদ্ধু কোথাকার, নিজেকেই গাল দিল ও, এলিজাবেথ ফিরতেই কথাটা জানাল।

'ও নিয়ে ভেব না,' কোন চিন্তাই নেই এলিজাবেথের, 'লাঞ্চের সময় একফাঁকে গিয়ে নতুন কুপন নিয়ে আসব কয়েকটা।

'অর্থাৎ,' অবাক হলো গ্রেবার, 'ফ্যাক্টরিতে যাচ্ছ তুমি?'

'হ্যাঁ। উপায় নেই, যেতেই হবে। তা ছাড়া,' একটু থামল ও, 'সামরিক বাহিনীর লোক আছে কারখানায়; কাজে যাইনি টের পেলেই কঠোর শাস্তি: বাড়তি কাজ করাবে, ছুটি বন্ধ রাখবে, এমন কি বন্দীশিবিরেও পাঠাতে পারে।'

মগে কফি ঢালল গ্রেবার। মনে মনে ঠিকই বুঝতে পারছে, এ সবই এলিজাবেথ করছে তার বাবার জন্যে। বুকের ভেতরে কেন যেন একটু অভিমান দানা বাঁধল ওর, একটু শক্ত হলো মুখ।

'রাগ করো না, সোনামণি,' অভিমান হয়েছে বুঝতে পেরে ওর চুলে আঙুল বোলাল এলিজাবেথ, 'আমি জানি, তোমার ছুটি ফুরিয়ে যাচ্ছে, পুরো সময়টাই তোমার সাথে কাটানো উচিত আমার। কিন্তু কাজে না গিয়েও তো উপায় নেই।' চুমো খেলো ও, 'আসি তাহলে?'

'আচ্ছা।'

'কিন্তু,' হঠাৎ কথাটা মনে পড়ল এলিজাবেথের, 'ছুটির পরে কোথায় দেখা করব?'

'তাই তো,' মাথা নিচু করে ঠোঁট কামড়াল গ্রেবার, 'সমস্যা বটে! সবকিছুই আবার নতুন করে শুরু করতে হবে। ঠিক আছে,' মুখ তুলল ও, 'তোমার কারখানার সামনে অপেক্ষা করব।'

'কোন কারণে যদি না আসতে পারো?'

'তাহলে ক্যাথেরীনেনকির্শে খোঁজ করো।'

'আমার মনে হয়,' হাসল এলিজাবেথ, 'আরও কয়েকটা জায়গা ঠিক করে রাখা উচিত; কোন জায়গাটা যে কখন থাকবে না, কে জানে।'

হো হো করে হেসে উঠল গ্রেবার। 'ভালই বলেছ। পোলমানের ওখানে সবচেয়ে সহজ হত, কিন্তু জায়গাটা বিপজ্জনক। তার চেয়ে,' হঠাৎ মনে পড়ল ওর, 'বিনডিংয়ের বাসাতেই সবচেয়ে সুবিধা। ওখানেই যেও।'

'আচ্ছা,' চুমো দিয়ে চলে গেল এলিজাবেথ। তাকিয়ে তাকিয়ে ওর যাওয়া দেখল গ্রেবার।

ঘন নীল আকাশ—মেঘ নেই, সকালের সোনারোদে উচ্ছল; মাকড়সার জালে রুপোলি শিশিরবিন্দু; আর এই অপরূপা নিসর্গের মাঝে এগিয়ে গেল

এলিজাবেথ—আস্তে আস্তে ছোট হলো ওর কায়া, পথের বাঁকে, কোন এক ফ্রন্ট লাইনের ওপারে চলে গেল যেন ও। কবে ফিরবে, কিংবা আদৌ ফিরবে কিনা, কেউ জানে না।

আটটার দিকে পোলমান এলেন। 'তোমাদের খাওয়া-দাওয়া কিছু হয়েছে?'

'জ্বি, স্যার,' কৃতজ্ঞ বোধ করল গ্রেবার, 'হয়েছে। আপনার অসুবিধে না হলে আমার জিনিসগুলো আপনার কাছে রেখে যেতাম।'

'অবশ্যই, কোন অসুবিধে নেই আমার।'

জিনিসপত্র গুছিয়ে নিল গ্রেবার। 'এখানে এসেও যে এভাবে পথে পথে ঘুরতে হবে, ভাবতেও পারিনি।'

ম্লান হাসলেন পোলমান। 'তিন বছর এভাবেই কাটিয়েছে জোসেফ—মাসের পর মাস ট্রেনে থেকেছে ও, যখনই সুযোগ পেয়েছে, বিশ্রাম নিয়েছে। বিমান আক্রমণ শুরু হবার পর থেকে তো ঘুমোনোর সময়টুকুও পাচ্ছে না।'

পোলমানের বাসায় জিনিসগুলো নামিয়ে রেখে ব্যাগ থেকে মাংসের একটা টিন বের করল গ্রেবার। 'জোসেফকে দেবেন, স্যার।'

'কেন, তোমার লাগবে না?'

'আমার চেয়ে ওঁর দরকার বেশি, স্যার। ওঁকে বেঁচে থাকতে হবে। ওঁরা না থাকলে যুদ্ধের পরে দেশকে গড়ে তুলবে কে? আমাদেরকে তো সবকিছুই প্রথম থেকে শুরু করতে হবে।'

হাহাকার বেরোল পোলমানের বুক চিরে, 'শুধু জার্মানি নয়, গোটা পৃথিবীকেই হয়তো নতুন করে শুরু করতে হবে। আমরা দেশগুলোকে শুধু টুকরো টুকরোই করেছি, অধিকার করতে পারিনি। স্বেচ্ছাচারীর রক্তের ঋণ শোধ করা কি এতই সহজ!'

সোনালি রোদ অলস ভঙ্গিতে শুয়ে আছে বাগানে, গাছেরা ফুলভারাবনতা, ফোয়ারার জলে মুখ দেখছে নীল আকাশ, শিশিরের স্বপ্ন বুকে নিয়ে নিবিড় সবুজ ঘাস।

এদিকের একটা ছাড়া সবক'টা বাড়ি অক্ষত, বাড়িটা বিনডিংয়ের—মারা গেছে সে।

কথাটা শুনে বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে রইল গ্রেবার। পেছনের ঘরে ফ্রাউ ক্লাইনার্ট—কাঁদতে কাঁদতে চোখদুটো ফুলে গেছে তার, সে-ই জানাল সব—বিমান আক্রমণের সময় ওপরতলায় ছিল বিনডিং, সাথে মেয়েও ছিল একজন; হয়তো ভেবেছিল ওরা, এদিকে কিছু হবে না, সেলারে যায়নি তাই। বোমার আঘাতে আধখানা বাড়ি পুরোপুরি ধসে গেছে, সেইসাথে মারা গেছে বিনডিং আর তার সঙ্গিনী।

কফিনে রাখা হয়েছে বিনডিংয়ের লাশ। দেখল গ্রেবার, রক্ত-মাংসের স্তূপ একটা। সরে এল ওখান থেকে। কাল ন'টায় সমাহিত করা হবে বিনডিংকে।

'খাবারগুলো নিয়ে যান, হের গ্রেবার,' ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল ফ্রাউ

www.BanglaBook.org

ক্লাইনার্ট। বোঝাই যাচ্ছে, বিনডিংকে অসম্ভব ভালবাসত সে। 'আপনাকে খুব পছন্দ করতেন উনি। বলতেন, আপনিই ওঁর একমাত্র বন্ধু যিনি কিছু চাইতে আসেন না ওঁর কাছে।'

'এ-তো অনেক জিনিস,' বিনডিংয়ের স্টোর রুমের চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে উঠল গ্রেবারের, 'এত জিনিস নেব কি করে।'

'একবারে না পারলে কয়েকবারে নিয়ে যাবেন, না হলে অন্যেরা লুটে নেবে সব। আপনি নিলে ওঁর আত্মা শান্তি পাবে।'

টোকা দেয়ার আগেই দরজা খুলে দিল জোসেফ। গ্রেবারকে অবাক হতে দেখে হাসল সে। 'দরজার ফুটোয় চোখ লাগিয়ে বসে ছিলাম।'

গ্রেবারও হাসল। হাতের জিনিসগুলো টেবিলে রেখে বলল, 'আপনার কথামত ক্যাথেরীনেনকির্শে গিয়েছিলাম; রাতে শোবার ব্যবস্থা হবে ওখানে।'

'কার সাথে দেখা হয়েছিল?' জানতে চাইল জোসেফ, 'অল্প বয়েসী কারোর সাথে?'

'না; বুড়োমত যিনি, তার সাথে।'

'বড় বাঁচা বেঁচে গেছেন। উনি অল্পবয়েসী ছেলেটার বাবা। ছেলেটা খোদ শয়তানের সাগরেদ, সম্ভবত গেস্টাপোর গুপ্তচর। অথচ ওর বাবা আমাকে সাতদিন ওখানে লুকিয়ে রেখেছিলেন।'

টিন থেকে সার্ডিন আর হেরিং মাছ বের করে টেবিলে সাজাল গ্রেবার। 'নিন, শুরু করা যাক। আমার এক এস.এ. কমাণ্ডার বন্ধুর ভাণ্ডার থেকে পাওয়া; বন্ধুটি অবশ্য কাল মারা গেছে।'

জোসেফকে চুপচাপ থাকতে দেখে যোগ করল কথাটা, 'ও অবশ্য অন্যান্য এস.এ.অফিসারদের মত নয়।'

মুচকি হাসল জোসেফ। 'বন্দীশিবিরে অনেক গার্ডও বন্দীদের সাথে ভাল ব্যবহার করে। তাতে কিছু এসে যায় না।'

'আমি যার কথা বলছি সে কিন্তু জীবনে কোনদিন রাইফেলও ধরেনি।'

'তার দরকার হয়নি হয়তো,' গমগম করে উঠল জোসেফের কণ্ঠ, 'হয়তো মানুষকে আরও কষ্ট দিয়ে মারার অন্য উপায় বের করেছিল সে।'

তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ বদলাল গ্রেবার। 'আপনার আত্মীয়স্বজন কেউ নেই?'

'ছিল—বাবা-মা-ভাই-বোন-স্ত্রী, ছোট্ট একটা ছেলে; এখন নেই। ছেলেটার মৃত্যুই শুধু স্বাভাবিক। দু'জনকে পিটিয়ে মেরেছে বন্দীশিবিরে, অন্যদের মেরেছে গ্যাসচেম্বারে।' গভীর, বিষাদমাখা কণ্ঠস্বর জোসেফের, 'আমিই শুধু বেঁচে আছি, যেহেতু আমি পালাতে পেরেছিলাম।'

স্তব্ধ হয়ে বসে রইল গ্রেবার; কী-ই বা বলার আছে ওর। এই অপরাধের কিছুটা দায় হয়তো ওর নিজেরও।

'আপনি তো ফ্রন্টেই ফিরে যাবেন আবার?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করল জোসেফ।

'হ্যাঁ,' বিষাদমলিন কণ্ঠস্বর গ্রেবারের, 'যাতে কিছু নরপিশাচ আরও কিছুদিন

টিকে থাকতে পারে ক্ষমতায়। কিন্তু সব জেনেশুনেও যেতে হবে আমাকে, কারণ, আমি চাই না, ওরা আমাকে কিংবা আমার বাবা-মা-স্ত্রীকে গুলি করে মারুক।' উত্তেজিত হয়ে উঠেছে গ্রেবার, 'আমাকে যেতেই হবে, কারণ, কোন যুক্তি, কোন মানবিকতার মূল্য ওদের কাছে নেই।'

হেসে হাত তুলল জোসেফ। 'এ নিয়ে এত খোলাখুলি আলোচনার সময় এখনও আসেনি। মনে রাখবেন, আমাদের সবচেয়ে আগে দরকার, বেঁচে থাকা।'

'আচ্ছা,' অন্য প্রসঙ্গে গেল গ্রেবার, 'আপনাকে আমার পুরানো পোশাক আর কাগজপত্র দিলে কাজে লাগবে আপনার? আমার কোন অসুবিধে হবে না দিতে।'

'ধন্যবাদ। আপাতত ওগুলো লাগবে না। আসলে আয়রন ফ্রন্টের রুমানিয়ান মেম্বার হিসেবে পার্টির ভেতরে ঢুকে কাজ করতে হবে আমাকে। পোলমানের সাথে কথা হয়েছে, এ ব্যাপারে ওঁর চমৎকার মাথা খেলে।'

চমকে উঠল গ্রেবার। তাহলে ফ্রেজেনবুর্গও কি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য!

'আপনার বিছানা-টিছানা কি নিয়ে যাবেন এখন?' প্রশ্ন করল জোসেফ।

'না। কিছু ভাল মদ আর সিগারেট আছে আমার সেই বন্ধুর বাসায়, নিয়ে আসি গিয়ে।'

'সিগারেট?' চকচক করে উঠল জোসেফের চোখজোড়া, 'কতদিন যে ভাল সিগারেট খাইনি, ঈশ্বরই জানেন! আমি আছি,' হাসল সে, 'আপনি পা দুটোকে একটু দ্রুত খাটান।'

বাইশ

মরুভূমির মত খাঁ খাঁ করছে রাস্তা। আদিগন্ত নগ্ন পদধ্বনি—ধ্বংসের, তাণ্ডবের, পৈশাচিকতার।

এলভারস্ট্রাসে ধরে হাঁটছে গ্রেবার, অন্তহীন ধ্বংসলীলা দেখে দেখে দু'চোখ ক্লান্ত ওর। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল ও। নিজের চোখকেও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না; সামনে, ওটা কি অক্ষত কোন বাড়ি, নাকি স্বর্গোদ্যান? এখনও নিশ্চিন্ত মনে ওখানে গান গায় পাখিরা, আকাশ ছোঁয় পপলার বীথি, লুকোচুরি করে হাওয়ার সাথে; বাগানে গুচ্ছে গুচ্ছে উথলে ওঠা ফুল, রাতের মধুর জ্যোৎস্না থির হয়ে থাকে বাগানে, বসন্তের বাতাসে কী নিশ্চিন্তমনে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করে প্রজাপতি!

অবাক বিস্ময়ে শুধু তাকিয়ে রইল গ্রেবার—ছোট্ট দোতলা বাড়ি, পুরানো ধাঁচের; বাড়ির সামনের ফলক দেখে বুঝল রেস্টহাউস হিসেবে ব্যবহার হত বাড়িটা। সংবিৎ ফিরতে প্রায় ছুটেই ভেতরে ঢুকল ও।

বাড়িতে দুটোমাত্র প্রাণী, ফ্রাউ ভিটে আর তার পোষা কুকুর। ফ্রাউ ভিটের সাথে অনেক কথা হলো গ্রেবারের, ঠিক হলো, আজ রাত আটটায় এলিজাবেথকে নিয়ে আসবে ও। রাতে খাবে এখানে, আসার সময় খাবার দাবার ওরাই নিয়ে আসবে।

www.BanglaBook.org

প্রায় উড়তে উড়তে স্বর্গোদ্যান থেকে বেরিয়ে এল গ্রেবার।

হকেনস্ট্রাসের সেই ভাঙা দরজার সাথে পিন দিয়ে আটকানো একটা চিঠি; চিঠিটা গ্রেবারের, ওর মায়ের লেখা। চিঠিটা দেখেই বুকের খাঁচার ভেতর কলজেটা লাফ দিল গ্রেবারের। হাতটা অসম্ভব কাঁপছে ওর, কোনরকমে খামটা খুলে নিল। দেখল, ফ্রন্ট থেকে ফেরত এসেছে চিঠিটা।

ছোট্ট চিঠি, ওর ছুটির কয়েকদিন আগে লেখা। ওর মা জানিয়েছে: কাল শহর থেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওদের, কোথায়, জানা নেই এখনও। বিমান আক্রমণের কোন কথা লেখা নেই, হয়তো সতর্কতার জন্যে।

সহসাই বদলে গেল সবকিছু; আবার যেন ফিরে এসেছে ধরিত্রীর প্রাণস্পন্দন, নিসর্গের রঙ, আশা, ভালবাসা। পুরো হাকেনস্ট্রাসেকেই এখন অন্যরকম লাগছে গ্রেবারের। ওর বাবা-মা বেঁচে আছে!

চিঠিটা পকেটে নিয়ে কারখানার দিকে এগোল ও। ঠিক করেছে, চিঠির কথাটা এলিজাবেথকে জানাবে না, কারণ, সাথে সাথেই নিজের বাবার কথা মনে পড়বে ওর, এবং কষ্ট পাবে।

কারখানার কাছাকাছি আসতেই এলিজাবেথের দেখা পেল গ্রেবার। অসম্ভব ক্লান্ত দেখাচ্ছে ওকে, গোধূলির ম্লান আলোয় আরও পাণ্ডুর।

'তিনদিনের ছুটি পেয়েছি গো,' ওর কানের কাছে ফিসফিস করল এলিজাবেথ, 'পরশু থেকে তিনদিন, তোমার ছুটি শেষ হওয়া পর্যন্ত।'

চট করে ওর চোখে চাইল গ্রেবার, দেখল, আস্তে আস্তে তৈরি হচ্ছে মুক্তোবিন্দু। বড় হতে হতে একসময় গড়িয়ে পড়ল টুপ করে। চরাচর ডুবে যাওয়া কী অসম্ভব কষ্ট যে দু'জনের! হতাশা, শুধু হতাশা আর ব্যর্থতা; অথচ এ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে সবকিছুই করেছে ওরা। তবু শেষ পর্যন্ত জিতল হতাশাই; কিন্তু তারপরেও কথা থাকে—এই হতাশা, এই ব্যর্থতাবোধ, সবকিছুর ভেতর থেকেই তো মঞ্জরিত হলো গভীর, কোমল, উষ্ণ ভালবাসা, একটা সুগভীর বোধ। এখনও হয়তো শেষ হয়ে যায়নি সব, এখনও হয়তো সুন্দর করে তোলা যায় সব—এ জীবন, এ সভ্যতা।

'তিনটে দিন আমাদের স্বপ্নসৌধ হয়ে থাকবে,' স্থির বাতাসে স্পন্দন তুলল গ্রেবারের কণ্ঠস্বর। সূর্যের শেষ রশ্মি আলোয় আলোকময় করে দিল ওদের।

আগে থেকে এলিজাবেথকে কিছুই বলেনি গ্রেবার। ওকে চমকে দেবে বলে। বাড়িটা দেখে অনেকক্ষণ কোন কথাই বলতে পারল না এলিজাবেথ। সংবিৎ ফিরতেই উচ্ছল হয়ে উঠল ও। 'এ তো রূপকথার স্বপ্নপুরী! আমার কিন্তু বিশ্বাসই হতে চাইছে না।'

সোনালি আলোর চুমু নিয়ে সন্ধ্যা এল, জ্যোৎস্নার রহস্যমাধুরী নিয়ে রাত। আনন্দে ফুল ফোটাল বৃক্ষ, ফুলের সুবাস বুকে নিয়ে মাতাল হলো বাতাস। নিশ্চিন্ত মনে বাগানে ঘুরল ওরা—হাসল, গাইল, ভালবাসা জানাল, কীভাবে যে সময়টুকু

কেটে গেল টেরই পেল না দু'জন।

রাত এগারোটা। আকাশে নিঃসঙ্গ চাঁদ, সামনে দীর্ঘ পথের দু'পাশে বিধ্বস্ত নগরীর কঠোর বাস্তবতা। পৃথিবীর শেষ মানব-মানবীর মত পথ ধরে এগিয়ে গেল ওরা।

'অনেক দেরি করে ফেলেছেন আপনারা,' বিরক্তিমাখা গলায় বলল গির্জায় অল্পবয়েসী পাদ্রী, 'সব জায়গা ভর্তি এখন।'

ছেলেটাকে তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ করল গ্রেবার—চোখা নাক, পরিষ্কার চিবুক, চেহারায় বোঝা যায়, বৃদ্ধ পাদ্রীর ছেলে সে; এর অর্থ, এই লোকই সম্ভবত গেস্টাপোর গুপ্তচর।

সতর্ক হয়ে উঠল ও। বলল, 'ভেতরের বাগানে হলেও অসুবিধে হবে না আমাদের।'

'তা পারেন। তবে ওখানেও অনেক লোক।'

'ধন্যবাদ।' জিনিসপত্র হাতে তুলে নিল গ্রেবার।

'আচ্ছা,' হঠাৎ জিজ্ঞেস করল ছেলেটা। 'আপনারা কি স্বামী-স্ত্রী?'

'কেন?' থমকে গেল গ্রেবার।

'এটা ঈশ্বরের স্থান, এখানে নারী-পুরুষকে আলাদাভাবে থাকতে হবে।'

'বিবাহিত হলেও?'

'হ্যাঁ।'

'বাগানে থাকলেও?'

'বাগান গির্জারই অংশ। কিন্তু আপনাদের দেখে তো বিয়ে হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না?'

জিনিসপত্র নামিয়ে রাখল গ্রেবার। পকেট থেকে নিঃশব্দে বিয়ের সার্টিফিকেটটা বের করে বাড়িয়ে দিল পাদ্রীর দিকে।

'কিন্তু,' সার্টিফিকেটটা দেখে ওকে ফেরত দিতে দিতে বলল ছেলেটা, 'গির্জায় বিয়ে না হলে···'

এবারে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল গ্রেবারের। খেঁকিয়ে উঠল ও, 'আমরা খুবই ক্লান্ত, শুতে চললাম।'

'কি ব্যাপার,' হঠাৎ অন্য একটা গলা শোনা গেল, 'এত গোলমাল কিসের?'

ঘুরে দাঁড়াল ওরা। ঘুম থেকে উঠে এসেছেন বৃদ্ধ পাদ্রী। সব কথা শুনে ছেলেকে বললেন, 'ঠিক আছে, আজ রাতের মত থাকতে দাও ওদের। কালকে,' গ্রেবারের দিকে ফিরলেন তিনি, 'সাত নম্বর ডমহোফে আমার সাথে দেখা করবেন এদেরকে বাগানের পথটা দেখিয়ে দাও।' শেষের কথাটা ছেলের উদ্দেশে বললেন।

টানা বারান্দা পেরিয়ে অল্পবয়েসী পাদ্রীর পিছু পিছু বাগানে এল ওরা। 'ওইদিকটা কবরস্থান। ওখানে শোবেন না যেন। দু'জন আলাদা থাকবেন। পোশাক খুলবেন না।'

'জুতোও না?' খোঁচা দেয়ার সুযোগটা হাতছাড়া করল না গ্রেবার।

www.BanglaBook.org

'জুতোর কথা আলাদা।'

অনেক লোক বাগানে। বেড়ার ধার ঘেঁষে কম্বল বিছাল গ্রেবার, জুতো খুলে টানটান হলো। এলিজাবেথকে ডাকল, 'কই, এসো!'

'সে কি!' মিটিমিটি হাসছে এলিজাবেথ, 'দু'জনের না আলাদা শোবার কথা।'

টেনে ওকে বুকের কাছে নিয়ে এল গ্রেবার।

'এই,' ফিসফিস করল এলিজাবেথ, 'ওরা যদি জানতে পারে?'

'আগে পারুক তো, তারপর দেখা যাবে।'

'কিন্তু···' কি যেন বলতে গেল এলিজাবেথ, তার আগেই, সেই চিরনতুন চির পুরাতন স্পর্শের ভাষায় নীরব হয়ে গেল ও।

গির্জার ভাঙা চূড়ার আড়ালে ঢাকা পড়েছে বুড়ি চাঁদ, নষ্ট জ্যোৎস্নায় ক্রুশবিদ্ধ যিশু—ব্যথিত, দুঃখিত, জ্যোতির্ময়।

তেইশ

পাখির ডাকে ঘুম ভাঙল গ্রেবারের। আড়মোড়া ভাঙছে সূর্য।

উঠে গিয়ে কল থেকে হাতমুখ ধুয়ে এল ও। চারপাশের লোকজন ওঠেনি এখনও। দেখল, সত্যি সত্যি মেয়ে আর ছেলেরা আলাদা ঘুমিয়েছে রাতে।

ফিরে এসে দেখল, এলিজাবেথ উঠে পড়েছে। ওকে হাতমুখ ধুতে পাঠিয়ে দিয়ে স্টোভ জ্বালল গ্রেবার, টিন খুলে খাবার গরম করতে বসল। মনে মনে হাসল—এ সবই বিনডিংয়ের দেয়া, বিনডিং না থাকলে হয়তো না খেয়েই থাকতে হত ওদের; অথচ তাকে পছন্দই করতে পারেনি ও।

এলিজাবেথ ফিরল। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিল দু'জন।

'আমি যাই তাহলে,' উঠে দাঁড়াল এলিজাবেথ, 'কারখানার সময় হয়ে গেছে।'

'ঠিক আছে,' জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করল গ্রেবার, 'বিকেলে কারখানার সামনে থাকব। আমাকে না পেলে সোজা ফ্রাউ ভিটের ওখানে চলে যেও।'

ঘুরতে ঘুরতে কখন যে এলিজাবেথের বাড়ির সামনে এসে পৌঁছেছে গ্রেবার, নিজেও জানে না। বাড়ির গার্ড ওকে হাত নেড়ে ডাকতেই সচকিত হলো।

'আপনার চিঠি আছে একটা।'

'আমার চিঠি!' নিখাদ বিস্ময়ে কয়েকপর্দা চড়ে গেল গ্রেবারের কণ্ঠস্বর।

'ওই একই হলো,' মুচকি হাসল ছোকরা গার্ড, 'আপনার স্ত্রীর চিঠি।' খামটা এগিয়ে দিল।

চিঠিটা উল্টেপাল্টে দেখল গ্রেবার, গেস্টাপো থেকে পাঠানো হয়েছে দেখেই বুক শুকিয়ে গেল। খেয়াল করল, হাত কাঁপছে ওর। চিঠির ওপরে লেখা: ফ্রয়লাইন এলিজাবেথ ক্রুজে, নিচে ঠিকানা। খামের মুখ বন্ধ থাকলেও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, কেউ খুলেছিল সেটা।

'কবে এসেছে?' অতিকষ্টে কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখল গ্রেবার।

'কাল।'

'শুধু এটাই?'

'আর কিছুর দরকার আছে কি?' ছোকরাকে মিটিমিটি হাসতে দেখে পিলে চমকে গেল গ্রেবারের। বুঝল, এ ব্যাটাই খুলেছিল চিঠি।

'না, ঠিক আছে,' বলে চলে এল ও। আড়ালে এসে খুলল চিঠিটা। চোখের সামনে নাচানাচি করছে কালো কালো অক্ষরগুলো, অতিকষ্টে পড়ল লেখাটা—আজ সকাল এগারোটায় ওদের সাথে দেখা করতে বলা হয়েছে এলিজাবেথকে। ঘড়ি দেখল গ্রেবার, প্রায় দশটা বাজে।

চিঠিটা আরেকবার পড়ল ও। নতুন কিছু উদ্ধার করা গেল না। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল গ্রেবার কাগজটার দিকে—সাধারণ, হলদেটে কাগজ, রোঁয়া ওঠা, অথচ কী প্রচণ্ড ক্ষমতা এই কাগজের, এক নিমেষে ওর সমস্ত রক্ত যেন শুষে নিয়েছে। নাকের কাছে চিঠিটা ধরল ও, মৃত্যুর গন্ধ পেল।

ক্যাথেরীনেনকির্শের গির্জার সামনে দাঁড়িয়ে আছে গ্রেবার। হঠাৎ চমকে উঠল; অস্পষ্ট কণ্ঠস্বরে কে যেন পেছন থেকে ডাকল ওকে। ঘুরে দাঁড়াতেই জোসেফকে দেখতে পেল—লম্বা ওভারকোট পরেছে সে। গলার স্বর পরিচিত বলেই কেবল তাকে চিনতে পেরেছে ও।

সোজা গির্জায় ঢুকে পড়ল জোসেফ। চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি বোলাল গ্রেবার; মিনিটখানেক অপেক্ষা করে নিশ্চিত হয়ে নিয়ে ভেতরে ঢুকল।

প্রার্থনা বেদীর কাছে নতজানু হয়ে বসে আছে জোসেফ। ওর পাশে হাঁটু গেড়ে বসল গ্রেবার।

'পোলমান ধরা পড়েছেন,' ফিসফিস করে জানাল জোসেফ। 'আজ ভোরে।'

কলজেটা কে যেন খামচে ধরল গ্রেবারের। মনে হলো, দম বন্ধ হয়ে আসছে ওর। কোনরকমে কথা ক'টা বলতে পারল ও, 'গেস্টাপো থেকে আমার স্ত্রীর নামে চিঠি এসেছে একটা। আজ এগারোটার সময় ওদের সাথে দেখা করতে বলেছে।'

'দেখি চিঠিটা।'

খামটা দিল গ্রেবার। 'হের পোলমান কি করে ধরা পড়লেন?'

'জানি না,' চিঠিটা বের করতে করতে বলল জোসেফ, 'আমি ছিলাম না তখন। সংকেত হিসেবে আমাদের যাতায়াতের পথে, লাথি দিয়ে সরিয়ে দেয়া যায়, এমন জায়গায় একটা পাথর রাখা ছিল। পাথরটা জায়গামত নেই দেখেই বুঝলাম, গড়বড় হয়েছে কোথাও; লুকিয়ে পড়লাম সাথে সাথে। ঘণ্টাখানেক পরে দেখি, ওঁর সমস্ত বইপত্র ভ্যানে তোলা হচ্ছে।'

'ওঁকে অভিযুক্ত করার মত কিছু পাওয়া গেছে নাকি?'

'না পাবারই তো কথা। বইপত্র, টিনের খাবার-দাবার সবই সরিয়ে ফেলা হয়েছিল আগে থেকে।'

অন্ধকার থিরথির করে কাঁপছে মোমবাতির ভৌতিক শিখায়। স্থির চোখে

www.BanglaBook.org

আলোর দিকে তাকিয়ে আছে গ্রেবার, ভাবছে, এক ফুৎকারেই তো নিবে যেতে পারে সব—এই আলো, এই জীবন, এই ভালবাসা; অস্ফুট কণ্ঠে, অনেকটা আত্মগতভাবে বলল ও, 'ভাবছি, নিজে গিয়ে দেখা করব ওদের সাথে।'

'করতে পারেন,' সায় দিল জোসেফ, 'ব্যাপারটা আপনার স্ত্রীকে নিয়ে হলে আপনার ভয় নেই কোন। আচ্ছা, আপনার স্ত্রী কি ইহুদি?'

'না।'

'কিছু করেন কি?'

'বাধ্য শ্রমিক হিসেবে পোশাকের কারখানায় কাজ করছে এখন।'

'চমৎকার,' খুশি হয়ে উঠল জোসেফ, 'তাহলে গ্রেপ্তার করার জন্যে নয়, অন্য কিছুর জন্যে ডেকেছে ওঁকে। আপনি অনুমান করতে পারেন কিছু?'

'ওর বাবা বন্দীশিবিরে আছেন। তাছাড়া গেস্টাপোর এক মেয়ে গুপ্তচর থাকত ওদের বাড়িতে। আমাদের বিয়ের ব্যাপারে সে কিছু লাগাতে পারে ওখানে।'

'হতে পারে। এক কাজ করুন, আপনি একাই যান; গিয়ে বলুন, চিঠিটা আজকেই পেয়েছেন, আপনার স্ত্রীর সাথে যোগাযোগ করতে পারেননি। চোখকান খোলা রাখবেন, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করবেন। আমার মনে হয় না, কোন ঝামেলা হবে। আর,' একটু থামল জোসেফ, 'আপনার স্ত্রীকে লুকিয়ে রাখার দরকার হলে জানাবেন। বিকেলে আমি এখানেই আছি,' ফিসফিস করে বলল সে, 'প্যাস্টর বীভেনডিকের স্বীকারোক্তি মঞ্চের সামনে।'

প্রখর আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল গ্রেবারের। গির্জা থেকে বেরিয়ে বারকয়েক চোখ পিটপিট করে আলোটা সইয়ে নিয়ে এগোল গেস্টাপো অফিসের দিকে।

রাস্তায় মায়ের হাত ধরা আনন্দোচ্ছল অবুঝ শিশু, পার্কের বেঞ্চে খবরের কাগজ হাতে নিশ্চিন্ত বৃদ্ধ; অসম্ভব হিংসে হলো গ্রেবারের, সবাই যেন কত সুখী, অন্তত চোখে দেখতে তো সুখী, শুধু ওরই চারপাশে অশান্তি আর বিপদের ঘন কালো মেঘ।

গেস্টাপো অফিসে গিয়ে একজন এস.এ. অফিসারকে চিঠিটা দেখাল গ্রেবার।

'এটা তো আপনার নয়,' চিঠিটা পড়ে মুখ তুলল সে, 'ফ্রয়লাইন ক্রুজের।'

'ও আমার স্ত্রী,' বিয়ের সার্টিফিকেটটা দেখাল গ্রেবার, 'পোশাকের কারখানায় কাজ করে। আজকেই চিঠিটা পেয়েছি বলে যোগাযোগ করতে পারিনি।'

সার্টিফিকেট নিয়ে ভাল করে দেখল অফিসার। ফিরিয়ে দিতে দিতে বলল, 'ঠিক আছে, আণ্ডারগ্রাউণ্ডে চলে যান, বাহাত্তুর নম্বরে।'

কিছুটা আতঙ্কিত হয়ে উঠল গ্রেবার। জানে, গেস্টাপোর আণ্ডারগ্রাউণ্ড ঘরগুলো ভয়ঙ্কর জায়গা। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ওর মনে হলো, জেনেশুনে নরকে ঢুকছে।

ফাইলে ভর্তি বিশাল একটা হলরুম কাঠের পার্টিশন দিয়ে ছোট ছোট খুপরিতে ভাগ করা—এটাই বাহাত্তুর নম্বর ঘর। খুঁজে খুঁজে সংশ্লিষ্ট এস.এ. অফিসারকে বের করল গ্রেবার। কাগজপত্র দেখে দুটো ফর্ম বের করল অফিসার। 'এখানে সই

করুন। সইয়ের নিচে লিখবেন—এলিজাবেথ ক্রুজের স্বামী, বিয়ের তারিখ আর রেজিস্ট্রী অফিসের ঠিকানা দেবেন সাথে। একটা ফর্ম নিজের কাছে রাখবেন।'

ফর্মটা পড়ল গ্রেবার—নিরাপত্তা আইনে আটক ড. বের্নহার্ট ক্রুজের দেহভস্মের প্রাপ্তিস্বীকার। ফর্মের এক জায়গায় ডাক্তারের মন্তব্য: ড. ক্রুজে হৃদরোগে মারা গেছেন।

র‍্যাক থেকে একটা কাগজের মোড়ক এনে ওর সামনে রাখল অফিসার। 'দেহভস্ম।' পাশে চন্দন কাঠের চমৎকার একটা সিগারেট কেস। 'আপনি সৈনিক,' বলল অফিসার, 'আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, কেন ড. ক্রুজের মৃত্যু সংবাদ প্রকাশ করতে পারিনি আমরা।'

প্যাকেট আর সিগারেট-কেসটা নিয়ে মুক্ত বাতাসে, মুক্ত আলোয় ফিরে এল গ্রেবার। ঠিক করেছে, এলিজাবেথকে এ-ব কিছুই জানাবে না। স্বার্থপরের মত মনে হলেও, ছুটির আর ক'টা দিন এলিজাবেথকে দুঃখভারাক্রান্ত দেখতে চায় না ও। তাছাড়া কথাটা শুনলে ঠিকই বুঝে নেবে এলিজাবেথ, ওর বাবাকে নিষ্ঠুর অত্যাচার করে মেরে ফেলা হয়েছে।

ক্লান্ত পায়ে ক্যাথেরীনেনকির্শের দিকে ফিরছে গ্রেবার। বুকের ভেতরে শিশির ঝরছে টুপটাপ, উজ্জ্বল মধ্যাহ্নে আকাশ থেকে যেন খসে পড়ল একটা নক্ষত্র—ড. ক্রুজে।

হাতে দেহভস্ম, পকেটে চন্দন কাঠের সিগারেট-কেস, ক্রমেই যেন ভারী হয়ে উঠছে ওগুলো। ভস্মটা কি ড. ক্রুজের? সন্দেহ হলো গ্রেবারের; এমনও তো হতে পারে, একসঙ্গে অনেককে গণচিতায় তুলে দিয়েছিল ওরা, কিংবা ভুল করে অন্য কারও দেহভস্ম দিয়েছে ওকে। কিন্তু একটা জিনিস মাথায় ঢুকছে না ওর, দেহভস্ম কেন দেয়া হলো ওদের! এ কি ক্রুর প্রতিহিংসা, আদিম বর্বরতার নির্লজ্জ পৈশাচিক উল্লাস, নাকি অন্য কিছু? ভেবেই পাচ্ছে না গ্রেবার, ভস্মটুকু নিয়ে কি করবে। একবার ভাবল ফেলে দেবে, কিন্তু এলিজাবেথের কথা মনে হতেই দূর করে দিল চিন্তাটা। সমাহিত করার কথাও ভাবল, কিন্তু তার জন্যেও অনুমতি দরকার।

গির্জায় ঢুকতেই ঘোর কাটল ওর। প্যাস্টর বীভেনডিকের স্বীকারোক্তি মঞ্চের সামনে এসে থামল। কেউ নেই আশপাশে। সবুজ পর্দাটা সরিয়ে ভেতরে তাকাতেই জোসেফের সাথে চোখাচোখি হয়ে গেল ওর। সতর্ক, টানটান ভঙ্গিতে, একটু কুঁজো হয়ে বসে আছে জোসেফ, যেন দরকার হলে নিমেষেই প্রতিপক্ষকে আঘাত করে পালাতে পারে। গ্রেবারকে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। 'কি খবর?'

সিগারেট-কেস আর ভস্মের প্যাকেটটা দেখল গ্রেবার। 'ড. ক্রুজের দেহভস্ম।'

নীরব থাকল জোসেফ, একটু গম্ভীর।

'হের পোলমানের খবর জানেন কিছু?' বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর জিজ্ঞেস করল গ্রেবার।

'না।'

'এগুলোকে নিয়ে,' প্যাকেট আর সিগারেট-কেসটা দেখাল গ্রেবার, 'কি করি বলুন তো?'

www.BanglaBook.org

'পুঁতে ফেলুন।'

'কোথায়?'

'বাগানে। ওটা এখন সত্যিকার অর্থেই কবরখানা।'

উদাস চোখে সামনে তাকাল গ্রেবার, দিগন্ত ছাড়িয়ে গেল ওর দৃষ্টি; মনে পড়ছে ফ্রান্সে দেখা সেই বিখ্যাত বিজয়-তোরণের কথা—যুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ, নিচে অসংখ্য নাম না জানা সৈনিকের সমাধি, ফুলে ফুলে খুঁজে ফেরা প্রজাপতির মিছিল, সোনালি আলো—ম্লান, বিষণ্ণ। বুকের ভেতরটা ভারী হয়ে এল ওর। ক্লান্ত, মন্থর পায়ে জোসেফের সাথে এগোল বাগানের দিকে।

এলিজাবেথের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে গ্রেবার। 'আজ রাতে কোথায় থাকবে?'

'গির্জায়?'

'উঁহুঁ।'

'তাহলে?'

'অনুমান করো তো দেখি!'

'পারছি না,' কিছুক্ষণ চেষ্টার পর হাল ছেড়ে দিল এলিজাবেথ। 'তুমি বলো।'

'ফ্রাউ ভিটের দোতলায়।' এলিজাবেথের চোখ কপালে উঠতে দেখে হো হো করে হেসে উঠল গ্রেবার। 'দোতলায় বাড়তি ঘর আছে একটা। ওঁর সাথে কথা বলেছি, জিনিসপত্র দিয়ে ঘরটা সাজিয়েও ফেলেছি।'

'সত্যি?' চিৎকার করে উঠল এলিজাবেথ।

'হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। তা তোমার ছুটি ঠিক আছে তো?'

'হ্যাঁ, কাল থেকে তিনদিন।'

'তাহলে আজ আমাদের সত্যিকারের মধুচন্দ্রিমা।' আজকে চাঁদ শুধু আমাদের জন্যে উঠবে, ফুল শুধু আমাদের জন্যে ফুটবে, ভাবল গ্রেবার।

চব্বিশ

বিষণ্ণ, তারাভরা আকাশ—জানালার ফ্রেমে বন্দী, দুঃখভরা হাওয়ায় দুলছে রক্তের আঙুরলতা।

গ্রেবারের বুকের মাঝে শুয়ে আছে এলিজাবেথ—নির্বাক, নিথর—বিদায়ের শঙ্খনীল ঘণ্টা বাজছে মনে, হৃদয়ের মাঝে অবিরল জলধারা, অবিরাম দহন।

ম্লান জ্যোৎস্নায় নিথর ছায়া ঘরে, বাতাস ভারী দীর্ঘনিঃশ্বাসে, মৌনমুখর পরিবেশ; হৃদয়ে হৃদয়ে অবিশ্রান্ত কথোপকথন দু'জনার, অন্তহীন ভালবাসাবাসি। গ্রেবারের অলস হাত বিলি কাটছে এলিজাবেথের চুলে, এলিজাবেথের নরম আঙুল পরম মমতায় জড়িয়ে আছে গ্রেবারকে।

'দূরে, গ্রামের দিকে কোথাও গিয়ে থেকো তুমি,' দীর্ঘ নীরবতা ভাঙল গ্রেবারের

নরম, ভেজা কণ্ঠস্বর।

'তুমি চলে গেলে সবই আমার কাছে সমান।'

'গ্রামগুলো তবু তো অক্ষত এখনও।'

'একদিন এখানেও থেমে যাবে সব,' যেন অন্য লোক থেকে ভেসে আসছে এলিজাবেথের কণ্ঠস্বর, 'এ-শহর সেদিন হয়তো শ্মশান হয়ে যাবে; তবু, যতদিন আমি বাধ্যশ্রমিক, এখান থেকে তো কোথাও যেতে পারছি না! আমি এ বাড়িতে ঠিকই থাকব, দেখো, আমার জন্যে চিন্তা করো না।'

দু'চোখে আরও গাঢ় হয়ে নামে বিষাদের ছায়া, বাষ্পময় হয়ে ওঠে বুকের ভেতরের নিঃশব্দ হাহাকার, সুগভীর দীর্ঘশ্বাস; কষ্টই শুধু বেড়ে ওঠে, বেড়ে ওঠে এ সমাজ এ সভ্যতার রক্তাক্ত ক্ষত, মানুষের অন্তহীন লোভ আর লালসা।

জানালা থেকে জ্যোৎস্না সরে যায়, আরও ঘন হয় অন্ধকার, ঘন হয় দুঃখ, হতাশা, ব্যর্থতাবোধ।

'এই, ঘুমোবে না?' অনেক, অনেকক্ষণ পরে নৈঃশব্দে বুদ্বুদ তুলল এলিজাবেথের কণ্ঠস্বর।

'এই তো ভাল, জেগে আছি দু'জনে।'

'কাল হয়তো ঘুমোনোর সুযোগ পাবে না।'

'ভেব না তুমি। ট্রেনে পুরো সময়টুকু ঘুমিয়ে নিতে পারব।'

'কিন্তু সেখানে তো আর বিছানা পাবে না।'

'তা ঠিক। কিন্তু তার পরে, আবার মাথার নিচে থাকবে নরম, কোমল কচি কচি সবুজ ঘাস, ওপরে বিশাল নীল আকাশ—কখনও আগুনের আভায় উজ্জ্বল, কখনও তারাভরা।'

'খুব মজা, না?' মৃদু হাসল এলিজাবেথ। কথা বলতে বলতে একটু হালকা হয়েছে বুকের দুঃসহভার।

'গরমের সময়,' হাসল গ্রেবারও, 'মোটামুটি ভালই লাগে। কিন্তু শীত! ওহ্, ঈশ্বর না করুন, আরেকটা শীত যেন রাশিয়াতে কাটাতে না হয়।'

'বলা যায় না, আরেকটা শীত হয়তো রাশিয়াতে কাটাতেও হতে পারে তোমার।'

'যে বীরবিক্রমে পিছু হটছি আমরা,' বেশ জোরেই হাসল গ্রেবার, 'তাতে শীতের আগেই পোল্যাণ্ড কিংবা দেশে পৌঁছে যাব। তখন যদি ঠাণ্ডা লাগে তো সোজা বুকে জড়িয়ে ধরব তোমাকে।'

বুকের মাঝে কী যে অসহ্য কষ্ট এলিজাবেথের! জ্বলন্ত একটা পেরেক যেন কেউ গেঁথে দিয়েছে ওর হৃদয়ে। যে কথাটা এতক্ষণ ধরে প্রাণপণে ভুলে থাকার চেষ্টা করেছে ও, ঠিক সেটাই জ্বলজ্বলে ক্ষতচিহ্নের মত জ্বলছে এখন। যুদ্ধ থেকে কবে ফিরবে আর্নস্ট? সত্যি সত্যি কোনদিন ফিরবে তো?

কর্কশ সাইরেনের আওয়াজ একমুহূর্তে বদলে দিল সমস্ত পরিবেশ।

বিছানা ছাড়ল গ্রেবার। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল—সুন্দর রহস্যময় রাত, বিমান আক্রমণের জন্যে সবচেয়ে উপযুক্ত। কপাল কুঁচকে উঠল ওর।

www.BanglaBook.org

নিচে দরজা খোলার শব্দ হলো। একটু পরেই দেখা গেল ফ্রাউ ভিটে-কে।

'আপনাদের জাগাতে যাচ্ছিলাম,' ওকে দেখে চেঁচিয়ে বলল, 'শেল্টারটা লিয়েরনিজস্ট্রাসে।' দ্রুত ভেতরে চলে গেল সে।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল গ্রেবার: ফ্রাউ ভিটে-কে বেরোতে না দেখে বুঝল, বাড়িতেই থাকবে সে। সাথে সাথে সিদ্ধান্ত নিল, ওরাও যাবে না শেল্টারে। এলিজাবেথকে কথাটা বলল গ্রেবার।

দু'হাতে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরল এলিজাবেথ। থমকে গেল সময়, মুছে গেল স্মৃতি, সত্তা, ভবিষ্যৎ। মধুর ক্লান্তি নিয়ে ঘুম ভাঙল গ্রেবারের। কতক্ষণ পরে জেগেছে, সে হিসেব নেই ওর।

কানায় কানায় ভরা নিথর রাত, চারপাশ সুমসাম; মেঝেতে ছড়ানো ওদের পোশাক, দেয়ালে ধূসর আয়না, পাশে, খোলা জানালার বাইরে, স্তব্ধ নিসর্গ; বাতাসে দুলছে আঙুরলতা, ওদের ভাবনা, ভালবাসা, দুঃখ কষ্ট বেদনা।

'ওরা আসেনি?'

'এসেছিল।' অস্ফুট স্বরে জানাল এলিজাবেথ। সে-ও জেগে আছে।

'যখন ভাবি,' বেদনায় নীল গ্রেবারের কণ্ঠস্বর, 'আবার আমাকে ফিরে যেতে হবে যুদ্ধে, তখন মনে হয়, তোমার সাথে দেখা না হওয়াই বোধ হয় ভাল ছিল আমার। কিন্তু আবার যখন ভাবি, রিক্ত, শূন্য, নিঃস্ব হয়ে ফিরছি ফ্রন্টে, তখনই অন্তরের অতলে অনুভব করি, প্রেমহীন, ভালবাসাহীন সে বিদায়ের চেয়ে বিচ্ছেদের বেদনা আমার অনেক ভাল।'

বিকেলে সন্ধ্যার আয়োজন। সোনার রঙে রাঙানো আকাশ। বাগানে বসে আছে ওরা—নিশ্চুপ।

আনমনা এলিজাবেথ। অনেকক্ষণ পরে নীরবতা ভাঙল ও, 'মনে হয়, মা হতে যাচ্ছি আমি।'

হেলান দিয়ে ছিল, চমকে সোজা হয়ে বসল গ্রেবার, 'বলো কি?'

'কেন,' হাসল এলিজাবেথ, 'তোমার আপত্তি আছে?'

'না, না, আপত্তি থাকবে কেন। তবে এই যুদ্ধের ভেতরে একটা শিশু জন্ম নেবে, ভাবতেই কেমন লাগছে।'

'তার মানে, চাও না তুমি, এই তো?'

'চাই। শান্তির সময় হলে আরও বেশি করে চাইতাম। চারদিকে এত রক্ত, এত মৃত্যু, এত হাহাকার, এর ভেতরে একটা শিশু বেড়ে উঠছে, কল্পনা করতেও ভয় পাই আমি।'

'কিন্তু,' শান্ত গভীর কণ্ঠ এলিজাবেথের, 'এর অন্যদিকও তো আছে—নতুন শিশু না এলে কাকে আমরা যুদ্ধের বিরুদ্ধে শিক্ষা দেব, কে জানবে বলো, সবার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কেন এই মহাসমর! এই পৃথিবীকে নতুন করে গড়ার জন্যেও তো ওদের দরকার হবে। তাছাড়া,' একটু থামল ও, 'আমি সন্তান চাই তোমার স্মৃতিকে আপন সত্তায় অনুভব করতে, তোমার আদর্শকে কালের পটে অক্ষয় করে রাখতে।'

আকাশে মুঠো মুঠো সোনা ছড়িয়ে অস্তাচলের পথে সূর্য। ও নিজেও কি তাই? ভাবছে গ্রেবার। বাগানে বসে আছে—নির্বাক, বিষণ্ন, আনমনা।

দূর থেকে উড়ে এল দুটো শাদা প্রজাপতি; ফুলে ফুলে ঘুরল, তারপর চলে গেল আরও দূরে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল গ্রেবার। নিজেও তো ও চলে যাবে এমনি করে। বিষণ্ন, তবু কানায় কানায় ভরা মন, মনে একটিমাত্র ভাবনারই অনুরণন—পেয়েছি; সে যে কতবড় পাওয়া, নিজেই শুধু জানে।

যাত্রা না করেই সামরিক কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিয়েছে গ্রেবার, রওনা হয়ে গেছে ও। কিন্তু আর ঘণ্টাখানেক পরে রওনা হবে সে। একদিন দেরির জন্যে হয়তো কিছু হবে না।

সকালে পোস্ট অফিসে গিয়ে শেষবারের মত খোঁজ নিয়েছিল ও বাবা-মায়ের, পায়নি কিছুই। এলিজাবেথের ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত হয়েছে, ফ্রাউ ভিটের এখানেই থাকতে পারবে সে। তাছাড়া লিয়েরনিজস্ট্রাসেতে নিজে গিয়ে এয়ার-রেইড শেল্টারটা দেখে এসেছে—চমৎকার শেল্টারটা, অত্যন্ত নিরাপদ।

নির্বাক গ্রেবার, বারবার শুধু ভাবছে এলিজাবেথের শেষের কথাগুলো—সন্তান, ওর, ওদের, যুদ্ধবিরোধী সঙ্গীতে সে একদিন ডুবিয়ে দেবে চরাচর।

বাতাস বইছে মৃদুমন্দ, ফুলেরা দুলছে, উড়ছে প্রজাপতি, আলোয় আলোকময় দিগন্ত। সূর্য ডুবছে।

'তুমি স্টেশনে এসো না, এলিজাবেথ,' বিষণ্ন বিধুর কণ্ঠ গ্রেবারের, 'আমি এখান থেকেই বিদায় নিতে চাই তোমার কাছ থেকে। এই শান্ত স্মৃতি—শুধু তুমি আর আমি—এ ছবিটাই থাকুক আমার বুকে, স্টেশনের ভিড়ে সে ছবি আমি হারাতে চাই না। তাছাড়া সৈনিকের পোশাকে, মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন একটা প্রাণী হিসেবে তোমাকে দেখা দিতে চাই না আমি। তোমার কাছে যেমন আছি আমি, তেমনিভাবেই বিদায় নিতে চাই।' পকেটে হাত ঢোকাল ও, 'এই টাকাগুলো রাখো, তোমার কাজে লাগবে।'

'টাকা লাগবে না আমার,' শান্ত, নিষ্কম্প এলিজাবেথ, 'তুমি রাখো, তাতেই আমি খুশি।'

'ওখানে খরচ করার কোন সুযোগই নেই আমাদের,' নোটগুলো এলিজাবেথের হাতে গুঁজে দিল গ্রেবার, 'তুমি খুব সুন্দর একটা পোশাক কিনো, আমি খুশি হব।'

'আচ্ছা, কিনব। আমি তোমাকে কিছু পাঠাব মাঝে মাঝে।'

'কিচ্ছু পাঠাতে হবে না, সোনা।' এলিজাবেথকে বুকের মাঝে টেনে নিল গ্রেবার, 'এখানকার চেয়ে অনেক ভাল খাবার, ভাল পোশাক পাই আমরা। আমার জন্যে ভেব না তুমি।'

রেশমের মত কোমল চুলে নাক ডুবে গেল গ্রেবারের। হৃদয়ের মাঝে বিমূর্ত হাহাকার, আনন্দ, বিষাদ, চোখে মুক্তোবিন্দু, উষ্ণ ঠোঁট খুঁজল একজোড়া উষ্ণ ঠোঁট; নিঃশ্বাস গাঢ় হলো, গাঢ় হলো ভালবাসা। বিদায়ের লগ্ন এল।

অনন্ত দীর্ঘ পথ, হাঁটছে গ্রেবার, শান্ত, দৃঢ় পদক্ষেপে। রওনা হবার পর একবারের জন্যেও পেছন ফিরে তাকায়নি ও। কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ, ক্রমাগত যেন বেড়েই চলেছে তার ওজন।

একটা বাঁক নিল রাস্তাটা। এলিজাবেথের চুলের গন্ধ পেল যেন গ্রেবার। আরেকটু পরে নাকে এল বারুদের গন্ধ, মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল চুলের গন্ধের সাথে।

ছোট্ট নদী—শুকিয়ে এসেছে প্রায়—চিকচিকে বালির ওপর দিয়ে তিরতির করে বয়ে যাচ্ছে জল; নদী পেরিয়ে গাছ—পাতাগুলো ঝলসানো। আচ্ছা, ভাবল গ্রেবার, এখন যদি বিমান আক্রমণ শুরু হয়, আর ও ট্রেনটা ধরতে না পারে, তাহলে কি হবে? তাহলে ফিরে যাবে ও। তখন এলিজাবেথের চেহারাটা কেমন হবে কল্পনা করতেই হাসি পেল ওর। পরমুহূর্তেই বৃষ্টি নামল বুকের মধ্যে—বিমান আক্রমণ হলে ট্রেনও দেরিতে ছাড়বে; ওর ফিরে যাবার প্রশ্নই আসে না।

ব্রামশেস্ট্রাসে এসে পৌঁছুল গ্রেবার। স্টেশনে যাবার বাসগুলো দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি। আসার দিনের কথা ভাবল ও। কী অসম্ভব পার্থক্য সেদিনের সঙ্গে আজকের! বিষণ্ন একটুকরো হাসি ফুটল ওর ঠোঁটে।

বাসে উঠে জানালার ধারে বসল গ্রেবার। মিনিট দশেক পরে বাস ছাড়ল।

আরও দূরে সরিয়ে নেয়া হয়েছে স্টেশনটা। স্টেশনঘরের ছাত ঘাস আর লতাপাতায় ছাওয়া, দেয়ালের পাশ দিয়ে পোঁতা ডালপালা।

প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে ট্রেন। বেশির ভাগ বগিতেই কাগজ সাঁটা—সামরিক বাহিনীর জন্যে। প্রত্যেকটা কামরার সামনে একজন করে অফিসার।

কাগজপত্র অফিসারের দিকে বাড়িয়ে দিল গ্রেবার। গম্ভীর মুখে পরীক্ষা করে সেগুলো ওর হাতে ফেরত দিল সে। একদিন দেরির জন্যে কোন কৈফিয়ত চাইল না দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল গ্রেবার। উঠে মালপত্র রেখে জানালার ধারে বসে পড়ল।

আরও তিনজন যাত্রী উঠল কামরায়—একজন বেসামরিক লোক, বাকি দু'জনের একজন কর্পোরাল, অন্যজন সাধারণ সৈনিক। পরনে ইউনিফর্ম, বুকে স্বস্তিকাচিহ্ন আঁটা দু'জন মেয়ে একটা ভ্যান ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে এল প্ল্যাটফর্মে।

'কফি এসেছে মনে হচ্ছে,' মন্তব্য করল বেসামরিক লোকটা।

'আমাদের জন্যে নয়,' মুখ খুলল কর্পোরাল, 'যে সব রংরুট ফ্রন্টে প্রথমবারের মত যাচ্ছে, তাদের জন্যে। ভাষণ শেষ হবার পর দেয়া হবে।'

আরও তিনজন সৈনিক উঠল কামরায়। একজন জিনিসপত্র রেখে জানালা খুলল। বাইরে দাঁড়িয়ে তার স্ত্রী—গ্রেবার দেখল অকালবৃদ্ধা, শীর্ণ দেহ, কোলে অনাহারক্লিষ্ট ছেলে, চোখের কোণে জলের আভাস। 'শরীরের যত্ন নিও ঠিকমত,' ভেজা গলায় স্বামীকে বলল সে।

'নেব। তুমিও তোমার শরীরের দিকে খেয়াল রেখো।'

নিঃশব্দে দু'জনের দিকে তাকিয়ে রইল দু'জন; জানালার ছোট্ট ফ্রেমে বন্দী

www.BanglaBook.org

সৈনিক. হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায় তাকে, অথচ এখন কিংবা একমুহূর্ত পরেই যখন ছাড়বে ট্রেন, একনিমেষে প্রিয়জনের কাছ থেকে হাজার মাইল দূরে চলে যাবে সে . হয়তো তখনই এ জন্মের শেষ দেখা দু'জনের।

দুটো সারিতে দাঁড় করানো হয়েছে রংরুটদের। দু'জন এস.এ. অফিসার ঘুরছে প্ল্যাটফর্মে, কঠোর চোখে লক্ষ করছে সবকিছু ঠিকঠাকমত চলছে কিনা।

ভাষণ শুরু হয়েছে, আবেগে কেঁপে কেঁপে উঠছে বক্তার কণ্ঠস্বর। অসহ্য লাগল গ্রেবারের, ও কিছু বলার আগেই কথা বলে উঠল কর্পোরাল, 'জানালা বন্ধ করে দাও।'

সৈনিকটি শুনতেই পায়নি নির্দেশ, করুণ দৃষ্টিতে সে শুধু তাকিয়ে আছে তার বউ আর ছেলের দিকে।

মিনিট কুড়ি পরে ট্রেন ছাড়ল।

'তোমার শরীরের যত্ন নিও কিন্তু,' ট্রেনের গতির সাথে সাথে গলা চড়ে গেল সৈনিকের।

'তুমি সাবধানে থেকো,' ট্রেনের সাথে সাথে ছুটতে শুরু করল বউটা, 'শরীরের যত্ন নিও, আমাদের জন্যে চিন্তা করো না যেন।'

জানালার এপাশে একজন সৈনিক—অপলক দৃষ্টিতে দেখছে গ্রেবার—জীবনবিচ্ছিন্ন, সমাজবিচ্ছিন্ন; ওপাশে শোকার্ত নারী, প্রকৃতি, বিশ্বচরাচর, ছুটছে ট্রেনের পাশাপাশি, জীবন-মৃত্যুকে তুচ্ছ করে, যেন শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পেতে চায় প্রিয়জনের সান্নিধ্য, তার উষ্ণতা।

দ্রুত সরে যাচ্ছে প্ল্যাটফর্ম। সহসা থরথর করে সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল গ্রেবারের। একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে এলিজাবেথ। এক পলকের জন্যে অসম্ভব স্পষ্টভাবে ওর মুখটা দেখতে পেল গ্রেবার—স্থির, অপলক, শীতের পরিত্যক্ত ফসলের মাঠ যেন।

লাফিয়ে উঠল ও । সব কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেল; কেন ও এলিজাবেথকে আসতে দিল না স্টেশনে, কেন বিদায়ের শেষ মুহূর্তে কিছু বলল না! এখন তো মনে হচ্ছে, অনেক কথা ওর বলার ছিল এলিজাবেথকে।

সৈনিকটাকে ঠেলা দিল গ্রেবার। 'একটু সরুন, আমার স্ত্রী।'

কথাটা কানেই গেল না সৈনিকের। জানালা দিয়ে আরও গলা বাড়িয়ে চিৎকার করে বউকে এখনও বলছে কিছু।

আবার ঠেলা দিল গ্রেবার। জানালা থেকে নড়লই না সৈনিকটা। চড়াৎ করে মাথায় রক্ত চড়ে গেল গ্রেবারের, শার্টের কলার ধরে হ্যাঁচকা টান দিল পেছনে। ছিটকে কামরার মাঝখানে চলে এল সৈনিক। উল্টে যেতে যেতে কোনরকমে টাল সামলে নিল সে।

উদ্‌ভ্রান্তের মত জানালা দিয়ে মাথা বের করল গ্রেবার। বহু দূরে এলিজাবেথের ক্ষীণ আভাস। প্রাণপণে হাত নাড়ল গ্রেবার, অস্ফুট কণ্ঠ বারবার বলছে, 'এই যে আমি, এই যে আমি।'

নিশ্চল, নিথর দাঁড়িয়ে রইল এলিজাবেথ; হাত নাড়া দেখতে পাচ্ছে ও কিন্তু

জানে না, কে নাড়ছে।

বাঁক ঘুরল ট্রেন।

পঁচিশ

পুরো দুটো দিন লাগল গ্রেবারের ওর বাহিনীকে খুঁজে পেতে। জায়গাটা ওদের আগের অবস্থান থেকে একশো কুড়ি কিলোমিটার পেছনে। সার্জেন্ট মেজরের অফিসে গেল ও রিপোর্ট করতে।

ফাঁকা অফিস। চেয়ারে বসে ঝিমোচ্ছে শুধু একজন। অগত্যা তার কাছেই খোঁজখবর নিল গ্রেবার। 'কি অবস্থা এদিকের?'

'জঘন্য,' চোখ মেলল সৈনিক, 'তা আপনার ছুটি কেমন কাটল?'

'মোটামুটি। লোকজন কোথায় সব?'

'কোথায় আবার! ট্রেঞ্চ খুঁড়ছে। নয়তো কবর দিচ্ছে কাউকে; কাজ তো এই একটাই। দেদার রংরুট পাঠাচ্ছে ফ্রন্টে, মরছেও ওরা তেমনি, একেবারে মশা-মাছির মত। আমাদের,' হাই তুলল সৈনিকটা, 'নতুন সার্জেন্ট এসেছে—মাইনার্ট। তা এসেছেন যখন, নিজের চোখেই দেখবেন সব।'

অফিস ছেড়ে রাস্তায় নামল গ্রেবার। গ্রামটা ঘুরে দেখতে বেরোল।

কোন পার্থক্য নেই কোথাও, না প্রকৃতিতে, না ধ্বংসলীলায়—সেই আদিগন্ত নগ্ন হিংস্রতা, পাশবিকতার চিহ্ন গায়ে নিয়ে পড়ে আছে বিরান প্রান্তর; শুধু পথে তুষার নেই এখন, তার বদলে প্যাচপেচে কাদা, পা বসে যায় হাঁটতে গেলে।

গড়িয়ে গড়িয়ে ওপরে উঠছে সূর্য। বেশ গরম এখন। বাতাসে ভারী কামানের গুরু গুরু গর্জন, কেঁপে কেঁপে সরে যাচ্ছে দূর থেকে দূরে।

গ্রামের চারপাশে ট্রেঞ্চ, তুষার-গলা জলে টইটুম্বুর, মাঝে মাঝে পাড় ভেঙে গেছে ট্রেঞ্চগুলোর। কয়েক জায়গায় সিমেন্টের ট্রেঞ্চ, দেখে মনে হয় সারি সারি বাঁধানো কবর।

ফেরার পথে কমাণ্ডার রায়ের সাথে দেখা হয়ে গেল গ্রেবারের। তার চোখে চশমা, হাতে ছড়ি; গ্রেবারের কাছে মনে হলো, সার্কাসের ক্লাউন। ওকে দেখে খুশি হয়ে উঠল কমাণ্ডার।

'কি খবর, কখন এলে?'

'এই তো, কিছুক্ষণ আগে, স্যার।'

'তুমি খুব ভাগ্যবান। তোমার যাবার পরপরই নির্দেশ এল, সব ছুটি বাতিল করতে। তারপর, কোন অসুবিধা হয়নি তো?'

'না, স্যার।'

'খুশি হলাম শুনে। আমরা এখানে আপাতত আছি; জায়গাটা আমাদের জন্যে ঠিক নিরাপদ কিংবা সুবিধাজনক কোনটাই নয়। আর দিন দু'য়েকের মধ্যেই নিরাপদ জায়গায় চলে যাব। কংক্রিটের ট্রেঞ্চ, সেলার বানানোর কাজ প্রায় শেষ।

www.BanglaBook.org

তুমি দেখেছ জায়গাটা?'

'না, স্যার।'

'সেকি?' অবাক হলো রায়ে, 'এখান থেকে চল্লিশ কিলোমিটার মত পেছনে। ট্রেনে আসার সময় দেখোনি?'

'আমি ভোরবেলা এখানে পৌঁছেছি, স্যার,' কৈফিয়ত দিল গ্রেবার, 'সারা রাত ঘুমিয়েছি ট্রেনে।'

'আচ্ছা,' মাথা ঝাঁকাল কমাণ্ডার। একটু ইতস্তত করল কথাটা বলতে, 'তোমাদের প্লাটুন-লীডার লেফটেন্যান্ট মুয়েলার মারা গেছেন। এখন তার জায়গায় এসেছে লেফটেন্যান্ট মাস।'

জবাব দেবার মত কিছু খুঁজে না পেয়ে শুধু অস্বস্তির সাথে মাথা ঝাঁকাল গ্রেবার।

কাদার ভেতরে ছড়ি দিয়ে খোঁচাচ্ছে কমাণ্ডার, পরীক্ষা করছে, মাটি কতটা শক্ত। 'বুঝলে,' গ্রেবারের উদ্দেশে বলল সে, 'সবকিছুরই ভাল দিক, মন্দ দিক আছে। এই কাদার কথাই ধরো, অসহ্য, কিন্তু এই কাদা না শুকোনো পর্যন্ত রাশিয়ান সাঁজোয়া বাহিনী দ্রুত এগোতে পারবে না। সেই ফাঁকে নিরাপদ ঘাঁটিতে পৌঁছে যাব আমরা। তুমি আসায়,' হাঁটতে শুরু করল কমাণ্ডার, 'খুব খুশি হয়েছি আমি। রংরুটদের ট্রেনিং দেয়ার জন্যে পোড় খাওয়া লোক দরকার আমাদের। তা তোমাদের ওদিকের খবর কি?'

'এদিকের মতই। প্রতি দু'দিনে কমপক্ষে একবার করে বিমান হামলা হচ্ছিল।'

'তাই নাকি? তাহলে তো চিন্তার কথা।' বোঝা যাচ্ছে, আরও কিছু শুনতে আগ্রহী কমাণ্ডার, কিন্তু নীরব থাকল গ্রেবার।

দুপুরে ফিরল সবাই। সবার আগে ইমেরমান; গ্রেবারকে দেখেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল সে। 'এসেছ, বেঁচে আছ তা হলে? তা এই নরকে ফিরে এলে কেন, পালাতে পারলে না?'

হেসে জিজ্ঞেস করল গ্রেবার, 'কোথায়?'

'কেন, সুইজারল্যাণ্ডে?'

'তাই তো, মহা ভুল হয়ে গেছে,' কপাল চাপড়াল গ্রেবার, 'জার্মানি থেকে প্রত্যেকদিন রাজসিক একটা ট্রেন ছাড়ে, যারা পালাতে চায় সুইজারল্যাণ্ডে, তাদের পৌঁছে দিতে। ব্যাটা বুদ্ধু কোথাকার,' গলার স্বর বদলে গেল ওর, 'অতই সহজ পালানো?'

'সহজ নয় সেটা খুব ভাল করেই জানি,' ঝাঁঝিয়ে উঠল ইমেরমান, 'কিন্তু জীবন বাঁচাতে অমন অনেক ঝুঁকিই নিতে হয়। এই যে আমরা ক্রমাগত পিছু হটছি, এটা পালানো নয়? এটা কি সুইজারল্যাণ্ডে পালানোর চেয়ে কম বিপজ্জনক?'

থমকে গেল গ্রেবার। সত্যি কথাটা উপলব্ধি করে কোন ভাষা খুঁজে পেল না জবাব দেয়ার।

'মুয়েলেকে মারা গেছে, জানো?' শান্ত স্বরে খবরটা দিল ইমেরমান।

www.BanglaBook.org

'শুনেছি।'

'পেটে গুলি খেয়েছিল বেচারা! বেরনিংও মারা গেছে, একটা পা একেবারে উড়ে গিয়েছিল ওর। মেইনেকে আর শাইডার আহত, হাসপাতালে পড়ে আছে।'

মনটাকে আগে থেকেই শক্ত করে রেখেছিল গ্রেবার: জানত, এমনকিছু শুনতে হবে, তবু কষ্ট পেল, বিশেষ করে বেরনিংয়ের জন্যে। হঠাৎ মনে পড়ায় জানতে চাইল, 'হির্শলাণ্ড?'

'কেন, ঘহাল তবিয়তে বেঁচে আছে। ওই তো,' আঙুল তুলে অদূরে বসে থাকা হির্শলাণ্ডকে দেখাল সে।

ভূত দেখার মত চমকে উঠল গ্রেবার। 'আশ্চর্য! অথচ ওর মা বলল মারা গেছে ও।' দ্রুত পায়ে হির্শলাণ্ডের পাশে এসে দাঁড়াল গ্রেবার। 'তোমার মায়ের সাথে দেখা করেছিলাম।'

'সত্যি,' খুশিতে চিকচিক করে উঠল হির্শলাণ্ডের চোখ, 'আমি ভেবেছিলাম, ভুলে যাবে তুমি। তা মায়ের খবর কি? ভাল আছে তো আর সবাই? আমার কথা বলেছিলে—ভাল আছি?'

'তোমার মা জানেন,' থেমে থেমে কথাটা উচ্চারণ করল গ্রেবার, 'তুমি মারা গেছ।'

হাঁ হয়ে গেল হির্শলাণ্ড, 'অসম্ভব, হতেই পারে না। প্রতি সপ্তাহে বাড়িতে চিঠি লিখি আমি।'

'ওঁর ধারণা, চিঠিগুলো আগে লেখা। কেন এমন হলো, কিছু আন্দাজ করতে পারো?'

'সম্ভবত বদমায়েশি করে বাড়িতে ভুয়ো খবর পাঠিয়েছে কেউ।'

'উঁহুঁ,' এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল গ্রেবার, 'ইচ্ছে করে কেউ একাজ করতে পারে বলে আমার বিশ্বাস হয় না।'

'স্টেইনব্রেনারও নয়?'

চমকে উঠল গ্রেবার, 'ও বেঁচে আছে?'

'হ্যাঁ, এবং ভালমতই। আচ্ছা···,' চোখমুখ কুঁচকে উঠল হির্শলাণ্ডের, ঠোঁট কামড়াল, 'সার্জেন্ট মেজর মারা যাবার পর স্টেইনব্রেনারই তার কাজ দেখাশোনা করেছে দু'দিন। তখন অফিসের অন্য লোকটাও অসুস্থ ছিল বলে কাজে আসেনি।'

'ঠিকই ধরেছ তাহলে। ভাল কথা, কমাণ্ডার রায়ে কি তখন সব চিঠিতেই সই করতেন?'

'জানি না। তবে ওঁর স্বাক্ষরের দরকারও নেই, স্টেইনব্রেনারের স্বাক্ষরই যথেষ্ট।'

'হারামজাদা!' দাঁতে দাঁত পিষল গ্রেবার, হাইনির মুখটা মনে পড়ল হঠাৎ। 'কিন্তু কেন করল কাজটা?'

'আমরা ইহুদি,' দুঃখভেজা কণ্ঠ হির্শলাণ্ডের, 'আমাদের কষ্ট দিতে পারলেই খুশি ও।'

'আমার মনে হয়,' পরামর্শ দিল গ্রেবার, 'সব জানিয়ে তাড়াতাড়ি চিঠি লেখা

উচিত তোমার বাড়িতে।'

'কিন্তু চিঠি পেতেও তো অনেকদিন লাগবে।'

অসহায় ক্রোধে নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছে হলো গ্রেবারের; দেখল, চোখজোড়া ছলছল করছে হির্শলাণ্ডের, থিরথির করে কাঁপছে ঠোঁট। আঙুলগুলো আপনা থেকেই মুঠি পাকিয়ে গেল ওর। বলল, 'অফিসে চলো। ওখান থেকে ভুল স্বীকার করে তার পাঠানোর ব্যবস্থা করব। দরকার হলে কমাণ্ডার রায়ের কাছে যাব আমি।'

'না,' মিনতি করল হির্শলাণ্ড, 'কিছুই প্রমাণ করতে পারব না আমি। আর স্টেইনব্রেনার যদি জানে, ওর নামে নালিশ করেছি,' শিউরে উঠল হির্শলাণ্ড, 'কি যে করবে তা সে-ই জানে। তার চেয়ে বাদ দাও ওসব।'

'ঠিক আছে,' শান্ত শোনাল গ্রেবারের কণ্ঠস্বর, 'কিন্তু এ অবস্থা চিরদিন থাকবে না।'

দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে স্টেইনব্রেনারের সাথে দেখা করল গ্রেবার। রোদে পুড়ে কিছুটা তামাটে হয়েছে সে, স্বভাবে আগের মতই আছে। ঠোঁটের কোণে উচ্ছল হাসি।

'দিব্যি ছুটি কাটালে তাহলে?' হাসল স্টেইনব্রেনার, 'তা ওদিকের খবরাখবর কি?'

'বলা নিষেধ।'

'মানে?'

'মানে,' ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসল গ্রেবার, 'আসার আগে দু'জন এস.এ. কমাণ্ডার কড়া নির্দেশ দিয়ে দিয়েছে সবাইকে, শহরের অবস্থা সম্পর্কে কোনরকম কথাবার্তা, যেন না বলি কোথাও। বলার একমাত্র শাস্তি···' বাকিটুকু আর শেষ করল না ও।

'আমিও একজন এস.এস. অফিসার,' ঝিক্ করে উঠল স্টেইনব্রেনারের শাদা দাঁতের সারি, 'আমাকে বলতে বাধা নেই তোমার।'

'অত বোকা আমাকে না-ই বা ভাবলে,' হাসল গ্রেবার।

'বিয়ে করেছ তো?' প্রসঙ্গ বদলাল স্টেইনব্রেনার।

চমকে উঠল গ্রেবার। 'অর্থাৎ অফিসে আমার ব্যক্তিগত ফাইল খুলেছ?'

মিটিমিটি হাসল স্টেইনব্রেনার। হঠাৎ বলল, 'এবার ছুটিতে গিয়ে আমিও বিয়ে করব।'

'মেয়ে ঠিক করেছ?'

'হ্যাঁ। আমাদের শহরের এস.এস. কমাণ্ড্যান্টের মেয়ে, দারুণ দেখতে।'

'মিলেছে ভাল,' টিপ্পনী কাটল গ্রেবার।

গায়েই মাখল না স্টেইনব্রেনার। 'দেখো, শুধু ইহুদি খতম করলেই তো আর চলবে না, দেশ শাসন করার জন্যে চাই উপযুক্ত লোক; আর সে লোক জন্ম নেবে শুধু পবিত্র নীল রক্তের সংমিশ্রণে।'

'মনে হচ্ছে ইহুদি মেরে উজাড় করে ফেলেছ দেশটাকে?'

'বেশিদিন সে সুযোগ আর পেলাম কোথায়,' আক্ষেপ করল স্টেইনব্রেনার, 'সেনাবাহিনীতে চলে আসতে হলো। অবশ্য,' গলার স্বর খাদে নামাল সে, 'শিগগিরই এস.এস.-এ ফিরে যাচ্ছি; তারপর দেখে নেব সব শালাকে। আহ্, কি যে ইচ্ছে ওখানে! এই তো সেদিন, এক ঘণ্টায় তিনশো পোলিশ আর রাশিয়ান বন্দীকে খতম করা হলো। আর এখানে,' থুঃ থুঃ করে থুথু ফেলল স্টেইনব্রেনার, 'তুমি যাবার পর পাঁচজন মাত্র গেরিলা ধরা পড়েছে, তাও আবার বসন্তের রোগী সবক'টা।'

সূর্য হেলছে পশ্চিমে, আকাশ উজ্জ্বল। গ্রেবারের অবাক লাগছে স্টেইনব্রেনারের অকপট স্বীকারোক্তিতে, ক্লেদাক্ত মানসিকতায়। চেহারার সাথে কী বৈপরীত্য মনের।

'হির্শলাণ্ডের মায়ের কাছে,' জিজ্ঞেস করল ও, 'ওর মৃত্যু-সংবাদ তুমি পাঠিয়েছিলে, তাই না?'

'কে বলল?'

'আমি জানি। তবে কাজটা যথেষ্ট উঁচুদরের হয়েছে, সন্দেহ নেই।'

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল স্টেইনব্রেনার। হায়েনার মত হাসি থামলে বলল, 'চিঠি পাবার পর হির্শলাণ্ডের মায়ের চেহারাটা একবার কল্পনা করো তো!' ফের শুরু করল সেই পৈশাচিক হাসি।

'তোমার সাহস আছে,' রহস্যময় হাসি হাসল গ্রেবার।

'এর জন্যে আবার সাহস লাগে নাকি? একটা চুলও কেউ ছিঁড়তে পারবে না আমার। কেউ কৈফিয়ত চাইলে বলব, ভুল হয়ে গেছে। ব্যস, মিটে গেল।'

'পুরানো জার্মান প্রবাদে বলে,' ধীরেসুস্থে সময় নিয়ে কথাটা বলল গ্রেবার, 'কারও মৃত্যু নিয়ে ঠাট্টা করলে তার নিজেরই মৃত্যু ঘটে।'

'তুমি আবার ওসবেও বিশ্বাস করো নাকি?' কাষ্ঠহাসি হাসল স্টেইনব্রেনার।

'বিশ্বাস করি কিনা ঠিক বলতে পারব না, তবে দু'জনের কথা জানি, যারা এ ধরনের ঠাট্টা করার অল্পদিনের মধ্যেই মারা গেছে, এবং অত্যন্ত কষ্ট পেয়ে।'

'ফালতু কথা বলো না,' গলায় ঝাঁঝ থাকলেও চোখমুখ শুকিয়ে গেছে স্টেইনব্রেনারের। মিনিটখানেক নিঃশব্দে এটা ওটা নাড়াচাড়া করে একসময় আস্তে করে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

জোর আক্রমণ শুরু হয়েছে শত্রুপক্ষের। আকাশে থেকে থেকে শাদা ফুল ফুটছে—গোলা ফাটার চিহ্ন—থরথর করে কাঁপছে বাতাস বিস্ফোরণের ভোঁতা আওয়াজে; একঝাঁক পাখি দেখা গেল আকাশে, প্রাণপণে সরে যাচ্ছে পশ্চিমে—একনিমেষে বদলে গেছে সমস্ত পরিবেশ। হঠাৎ প্রচণ্ড হতাশায় তলিয়ে গেল গ্রেবার; মনে হলো ওর, যুদ্ধ থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন হতে পারেনি ও, এমন কি যখন ছুটিতে ছিল তখনও নয়। হয়তো কোনদিন ছুটিতেই ছিল না ও।

ধূসর, নির্জন রাত। রাইফেল হাতে পাহারা দিচ্ছে গ্রেবার।

কাঁপাকাঁপা আলোয় খাঁ খাঁ করছে শূন্য প্রান্তর, দাঁত বের করে হাসছে

www.BanglaBook.org

ধ্বংসস্তূপ; কালো আকাশকে ছিঁড়েখুঁড়ে একাকার করে দিচ্ছে জ্বলন্ত গোলা, কামানের গর্জনে ভারী বাতাস।

পায়চারি করছে গ্রেবার—এ-ধার থেকে ও-ধার, ও-ধার থেকে এ-ধার; কাদার ভেতরে বুটের আওয়াজ শোনাচ্ছে গোঙানির মত, যেন প্রচণ্ড যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে অশরীরী কোন প্রাণী, কিংবা কে জানে, এই ধরণী হয়তোবা।

বুকের মধ্যে কোথাও নিঃশব্দে কুয়াশা জমল গ্রেবারের, টুপ করে ঝরে পড়ল প্রথম শিশিরবিন্দু। সহসা, নিঃশব্দ তীক্ষ্ণ যন্ত্রণায় একাকার হয়ে গেল ওর সমস্ত হৃদয়। নেই, সে নেই! অথচ, কই, আসার সময়ও তো এমন লাগেনি ওর? তবে এখন কেন এই যন্ত্রণা?

দাঁড়িয়ে পড়ল গ্রেবার—নিথর, নিষ্কম্প—অনুভব করছে হৃৎপিণ্ডের মাঝে বিষকাঁটা; চাইল, বিষকাঁটা বদলে যাক গোলাপে, কান্তি যার রচিত নম্রতায়।

এল না, কিছুই এল না; যন্ত্রণাই বাড়ল শুধু ওর। কোথায় যেন চিরজন্মের মত হারিয়ে এসেছে ওর সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ, কোন এক মাহেন্দ্রক্ষণে যা ও পেয়েছিল। কান পেতে রইল গ্রেবার; দিগন্তে, চরাচরে নাম—শুধু একটি নাম; নামের প্রতিধ্বনি কি উঠবে না?

অণুপরমাণু দিয়ে অনুভব করছে ও, এই নামহীন, ভাষাহীন যন্ত্রণা না হলে ভালবাসা বুঝবে কি করে ও?

মনের আয়নায় ভেসে উঠল বেদনার্ত নীল একটি আকাশ, সে আকাশ বদলে গেল কুয়াশাজড়ানো মুখে—অস্পষ্ট, ঝাপসা; রুক্ষ চুলগুলো উড়ছে হাওয়ায়, অশ্রুভেজা চোখ, রেলস্টেশন···, বুকের মাঝখানে নিঃশব্দ হাহাকার গ্রেবারের। সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করল ও ছবিটাকে স্পষ্ট করতে। শব্দহীন বাঁশি বাজল শুধু, দূর সুদূরই রইল।

ঘামে ভিজে চপচপ করছে গ্রেবারের শার্ট; বুঝল, পাশে এসে দাঁড়িয়েছে কেউ। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ও; দেখল অবাক চোখে জাউয়ের দাঁড়িয়ে, গ্রেবারের শূন্য দৃষ্টি ছাড়িয়ে গেল তাকে।

ছাব্বিশ

অবশেষে নরক ভেঙে পড়েছে।

কাউকে আলাদা করে চেনার উপায় নেই আর। শুধু হেলমেট দেখলে কিংবা কথা বললে বোঝা যাচ্ছে, কোন পক্ষের সৈনিক সে। ট্রেঞ্চগুলো মিশে গেছে মাটির সাথে, বুলেটের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত দেয়াল—কোথাও নিরাপদ নয়; সারাক্ষণ ওরা সরছে এক আড়াল থেকে অন্য আড়ালে, এক মৃত্যু থেকে অন্য মৃত্যুতে।

নিসর্গ আবৃত বৃষ্টিতে, কান্নায় থইথই প্রান্তর; রাত্রি অন্ধকার—অসহায় আর্তনাদে, বিস্ফোরণে, আলোর ঝলকানিতে। অসীম শূন্য আকাশ, হাহাকার করে পৃথিবী, তারারা দুঃখে মুখ লুকোয় মেঘের আড়ালে। বৃষ্টি, বৃষ্টি; প্রতিটি ফোঁটার

www.BanglaBook.org

সাথে ঝরে পড়ে বোমা, গোলা, রক্ত, মৃত্যু, নৃশংসতা।

শত্রু বিমানের তীক্ষ্ণ শব্দ কাঁপন ধরিয়ে দেয় শরীরে। সাথে সাথে জ্বলে ওঠে সার্চলাইট, আকাশকে ছিন্নভিন্ন করে দেয় শাদা সরলরেখা। অ্যান্টি এয়ারক্র্যাফট গানের গর্জনে তালা ধরে যায় কানে। মাঝে মাঝে দেখা যায় বিস্ফোরিত বিমান—জ্বলন্ত উল্কার মত ধেয়ে আসছে পৃথিবীর দিকে। আকাশে ফুল ফোটায় প্যারাস্যুট, মেশিনগানের অবিশ্রান্ত গুলি অভ্যর্থনা করে তাকে।

টানা বারোদিন ধরে যুদ্ধ চলছে। প্রথম তিনদিন মাটি কামড়ে কোনরকমে টিকে ছিল ওরা। চতুর্থ দিনে রাশিয়ান সাঁজোয়া বাহিনীর মুখে খড়কুটোর মত উড়ে গেল সমস্ত অবরোধ; অবশ্য বেশিদূর অগ্রসর হলো না রাশিয়ানরা, কয়েক কিলোমিটার ঢুকে আবার ফিরে গেল নিজেদের ঘাঁটিতে।

ভোর হলো। সামরিক শ্রমিকদের জোরজবরদস্তি করে পাঠানো হলো রাস্তা আর টেলিফোন লাইন মেরামত করতে। দু'ঘণ্টাও গেল না, অর্ধেকেরও বেশি শ্রমিক খতম হয়ে গেল। এরপর আচমকা আক্রমণে সম্পূর্ণ দিশেহারা হয়ে পড়ল ওরা। খুব নিচু দিয়ে উড়ে এল এক ঝাঁক বোমারু বিমান, ফিরে যাবার সময় পেছনে রেখে গেল বিধ্বস্ত বাঙ্কার আর অসংখ্য শত্রু-সৈন্যের মৃতদেহ।

সপ্তম দিনে প্লাবনের মত ধেয়ে এল রাশিয়ান বাহিনী। সেই সাথে শুরু হলো বৃষ্টি—যেন লক্ষ কোটি বর্শার ফলা—যেন ঈশ্বর চাইছেন, মহাপ্লাবনে ভেসে যাক সব সৃষ্টি, সব ধ্বংস, মানুষের সব কলুষতা, নীচতা, হীনতা।

অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় গ্রেবারদের। কাদার ভেতরে বুকে হেঁটে বেড়ানো সরীসৃপ ছাড়া যেন আর কিছুই নয় ওরা। কি করে যে বেঁচে আছে, নিজেরাও জানে না। সমস্ত প্রতিরোধব্যবস্থা ধ্বংস, অস্ত্র বলতে শুধু দুটো মেশিনগান আর কিছু হাতবোমা। দুটো ভাঙা বাড়িতে ক্যাম্প বানানো হয়েছে—একটাতে আছে কমাণ্ডার রায়ে, অন্যটাতে লেফটেন্যান্ট মাস।

তিনদিন কাটল আরও। সামরিক সম্ভার শেষ। রাশিয়ানরা এগিয়ে এলে এখন ব্রেফ আত্মসমর্পণ করতে হবে ওদের; কিন্তু সৌভাগ্য, আক্রমণটা এল না।

পরের দিন আকাশে দেখা দিল জার্মান বিমান, দুটো, ওদের অবস্থান বুঝে রসদ, অস্ত্রপাতি আর গোলাবারুদ নামিয়ে দিয়ে গেল; একই দিনে পৌঁছুল রাস্তা আর বাঙ্কার মেরামতের সরঞ্জাম।

শুরু হয়ে গেল কাজ, চলল সারারাত ধরে।

শেষ রাত। দিগন্তে ফিকে তরল অন্ধকার; শান্ত পরিবেশ। একমনে কাজ করছে সবাই। সহসা প্রতিরোধরেখার ওপাশে, গজ পঞ্চাশেক দূরে, প্রথমে জেগে উঠল একসার মাথা; তারপর একসার হাত শূন্যে উঠল, তার পরপরই ছুটে এল মৃত্যুবাণ।

হ্যাণ্ডগ্রেনেডের বিস্ফোরণে থরথর করে কেঁপে উঠল রাত। আলোর ঝলকানিতে চোখ প্রায় অন্ধ হয়ে গেল গ্রেবারের; তারই ভেতরে দেখল ও, হেলমেটের নিচে এক জোড়া বিস্ফারিত চোখ, রক্তশূন্য, ফ্যাকাসে, হাঁ হয়ে যাওয়া মুখ। এক ঝটকায় রংরুটটার হাত থেকে গ্রেনেড কেড়ে নিল ও, ছুঁড়ে দিল সামনে;

প্রচণ্ড শব্দে ফাটল সেটা।

'গাধা কোথাকার!' ধমকে উঠল গ্রেবার, 'ওভাবে আংটা খুলবে না কখনও। আলগা করে নিয়ে ছুঁড়ে দেয়ার আগে টান দেবে শুধু।'

চোখ তুলতেই মৃত্যুদূতকে দেখতে পেল ও—একটা হ্যাণ্ডগ্রেনেড—ধীরেসুস্থে, অলস ভঙ্গিতে বাতাসে পাক খেয়ে সরাসরি ভেসে আসছে ওর দিকে।

সম্মোহিতের মত গ্রেনেডটার দিকে তাকিয়ে রইল গ্রেবার—সম্পূর্ণ জমে গেছে ও; একেবারে শেষ মুহূর্তে বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর শরীরে, অবিশ্বাস্য দ্রুততায় পিন খুলে একটা গ্রেনেড ছুঁড়ে দিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ল কাদায়।

বিস্ফোরণের আওয়াজ আর প্রবল ঝটকায় কিছুক্ষণের জন্যে চেতনা হারাল ও, মায়ের মুখটা নিমেষের জন্যে ঝলসে উঠল ওর মনের পর্দায়।

জ্ঞান ফিরতেই ডানপাশে হাত বাড়াল গ্রেবার। 'গ্রেনেড দাও,' চিৎকার করে বলল রংরুটটাকে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ঘাড় ফেরাল। কারও চিহ্ন নেই আশপাশে।

অত্যন্ত সাবধানে গর্ত থেকে মাথা তুলল গ্রেবার; চারপাশ দেখে নিশ্চিত হয়ে নিয়ে শরীরটাকে বের করে আনল।

আকাশে হাউই উঠল একটা, সাথে সাথে কাদার ভেতরে ডুব দিল ও; তার আগে সেই রংরুটটার ছিন্নভিন্ন মৃতদেহটা চোখ এড়াল না ওর—ছেলেটার ঠিক বুকের ওপরে বিস্ফোরিত হয়েছে গ্রেনেডটা।

মেশিনগানের গুলি জাল বিছিয়ে রেখেছে যুদ্ধক্ষেত্রে। মাথা তোলার উপায় নেই, তবু, অনুভব করছে গ্রেবার, সরে যেতেই হবে এখান থেকে। যন্ত্রণায় মাথাটা যেন ছিঁড়ে পড়ছে ওর, কাদা ঢুকে জ্বালা করছে চোখ, ঝাপসা হয়ে এসেছে দৃষ্টি; তবু বুকে ভর দিয়ে ঘষটে ঘষটে এগিয়ে চলল ও—বুকের অতল গভীরে উজ্জ্বল একটি মুখের প্রতিচ্ছবি নিয়ে।

দু'দিক থেকে আক্রমণ চালিয়েছে রাশিয়ানরা। অনবরত গ্রেনেড ফাটছে, প্রত্যুত্তর দিচ্ছে জার্মান মেশিনগান। বেশ কিছুক্ষণ পরে, দূরে সরতে সরতে একেবারে থেমে গেল গ্রেনেড বিস্ফোরণের আওয়াজ। মেশিনগান তখনও কাশছে।

চলে গেছে রাশিয়ানরা, বুঝল গ্রেবার, তবে জানে, আবার ফিরে আসবে; এত সহজে হটার বান্দা নয় ওরা।

হঠাৎ বৃষ্টি নামল ঝাঁপিয়ে, প্রায় একই সাথে বন্ধ হয়ে গেল মেশিনগান। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল গ্রেবার। সহসা ভারী গোলার বিস্ফোরণে প্রচণ্ডভাবে কেঁপে উঠল ও। বুকের নিচে ভূমিকম্পের মত কাঁপছে মাটি। আকাশে ছিটকে উঠছে ইট, কাঠ, লোহা; ওর চোখের সামনে ভোজবাজির মত অদৃশ্য হয়ে গেল ওদের ভাঙা বাড়িটার একাংশ।

রক্তের নদীতে স্নান করে বিষণ্ন একটা সকাল এল।

স্যাঁতসেঁতে, পিচ্ছিল একটা ভোর উপহার দিয়ে বিদায় নিয়েছে রাত। পালিয়ে আসতে পেরেছে গ্রেবার। ফেরার পথে সাউয়ের সাথে দেখা হয়ে গেল ওর, সাথে

www.BanglaBook.org

দু'জন রংরুট। নাক দিয়ে দরদর করে রক্ত ঝরছে সাউয়ের, রংরুট একজন পড়ে আছে মাটিতে—কাতরাচ্ছে অসহ্য যন্ত্রণায়, নাড়িভুঁড়ি সব বেরিয়ে এসেছে বেচারার, বৃষ্টির ফোঁটা টুপটুপ ঝরছে তার ওপর, রক্তের সাথে মিশে গড়িয়ে নামছে নিচে। ওর জন্যে একটাই জিনিস চাইবার আছে ওদের—মৃত্যু, দ্রুত মৃত্যু। দ্বিতীয়জনের পা ভেঙেছে; ভেবেই পেল না গ্রেবার, এই কাদার ভেতরে কি করে পা ভাঙল ছোকরা।

দূরে, প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর মত বিধ্বস্ত শত্রু-ট্যাঙ্ক— দাউদাউ করে জ্বলছে, পাশে একজন সৈনিকের আগুনে পোড়া মৃতদেহ—শাদা হাড়গুলো ফুটে আছে কালো কাদার মধ্যে, বাতাসে পোড়া মাংসের উৎকট গন্ধ।

'তুমি,' মাটিতে পড়ে থাকা রংরুটকে বলল গ্রেবার, 'এখানে এভাবেই শুয়ে থাকো। আমরা স্ট্রেচারের ব্যবস্থা করছি। আর তুমি,' দ্বিতীয়জনকে বলল ও, 'আমাদের কাঁধে ভর দিয়ে সাথে চলো।'

গোলার গর্ত, খানাখন্দ এড়িয়ে সাবধানে এগোল ওরা। ওদের অনুসরণ করল মৃত্যুর প্রতীক্ষায় পড়ে থাকা নিষ্পাপ এক কিশোর রংরুটের ব্যথাদীর্ণ অসহায় দৃষ্টি।

ক্লান্ত, বিধ্বস্ত অবস্থায় ঘাঁটিতে পৌঁছুল তিনজন। ভাঙা দেয়ালের কাছে পৌঁছুতেই রংরুটটাকে ছেড়ে দিল গ্রেবার। আর্তনাদ করে বসে পড়ল ছেলেটা। ওর হেলমেটটা খুলে দেয়ালের ওপর রাখল গ্রেবার, যেন চট্ করে কারও চোখে পড়ে ওটা।

উদ্ধার করা অনেকগুলো মৃতদেহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে চারপাশে। দু'জন রাশিয়ান সৈনিকের মৃতদেহও রয়েছে লাশের মিছিলে।

সবার খোঁজখবর নিতে বেরোল গ্রেবার। কমাণ্ডার রায়ে আহত, বাঁ-হাতে বড় একটা ব্যাণ্ডেজ তার। ফিল্ড হাসপাতাল ভরা আহত সৈনিকে, বাইরে ক্যানভাসের ওপর পড়ে আছে আরও তিনজন।

ঘণ্টাখানেক পর বিমানের গর্জনে সচকিত হয়ে উঠল সবাই। আকাশে চোখ তুলল গ্রেবার, অঝোর ধারায় ঝরছে বৃষ্টি, ঠিকমত বোঝা যাচ্ছে না কিছুই, কিন্তু প্যারাস্যুটের সাথে কালো কালো পোঁটলা ঝুলতে দেখেই খুশিতে চিৎকার করে উঠল ওরা—রসদ আর ওষুধপত্র পাঠানো হচ্ছে ওদের জন্যে। খুশিটা অবশ্য ক্ষণস্থায়ী হলো, কেননা অর্ধেক জিনিসপত্র পড়ল রাশিয়ানদের নাগালে, বাকি অর্ধেক কোনরকমে উদ্ধার করল ওরা।

সাতজন আহত সৈনিক এসে পৌঁছুল স্ট্রেচারে করে। ওরা মানুষ, নাকি কবর থেকে তুলে আনা কাদামাখা লাশ, বুঝল না গ্রেবার।

লেফটেন্যান্ট মাস মারা গেছে। তার জায়গায় দায়িত্ব নিয়েছে সার্জেন্ট-মেজর রাইনেকে; কিন্তু তার পক্ষে কি যে করা সম্ভব হবে, সে ঈশ্বরই জানেন! অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে অবশিষ্ট আছে শুধু দুটো ভারী আর দুটো হালকা মেশিনগান, সেইসাথে কিছু গ্রেনেড আর ওদের মনোবল।

আহতদের অ্যাম্বুলেন্সে তুলে দিল ওরা। যন্ত্রণায় কাতরানোর শক্তিটুকুও নিঃশেষিত লোকগুলোর।

রওনা হলো অ্যাম্বুলেন্স—হেলেদুলে যাচ্ছে; শ'খানেক গজ গেছে মাত্র, সহসা বিকট আওয়াজ, চোখের পলকে দলামোচড়া ইস্পাতের স্তূপে পরিণত হলো অ্যাম্বুলেন্স—ভারী গোলা সরাসরি আঘাত হেনেছে তার ওপর।

দুপুরের দিকে থামল বৃষ্টি, মেঘ সরে গেল, হাসল নতুন দিনের সূর্য।

বিষণ্ন চোখে আকাশের দিকে তাকাল কমাণ্ডার রায়ে। বিড়বিড় করল আপনমনে, 'এবার হালকা ট্যাঙ্ক নিয়ে নামবে তাহলে ওরা। জাহান্নামে যাক সব, ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী কামানগুলো রেডি করতে হবে এখন।'

স্যাঁতসেঁতে বিবর্ণ আরেকটা বিকেল এল; আকাশে ফুটে উঠল একঝাঁক ফাইটার প্লেন, সাথে আরেকটা ক্যারিয়ার বিমান। ফাইটারগুলো একসাথে ধেয়ে গেল রাশিয়ানদের দিকে, সেই ফাঁকে ক্যারিয়ার বিমানটা রসদপত্র নামিয়ে দিল ওদের ঘাঁটিতে। গ্রেবাররা দেখল, অসংখ্য কালো কালো ডিম পাড়ল ফাইটারগুলো। তুমুল যুদ্ধ চলল বেশ কিছুক্ষণ। এক সময় বাড়িমুখো হলো বিমানগুলো, দলে তখন চারটে বিমান কম।

ভোর হলো। দুর্গন্ধে বত্রিশনাড়ি পাক দিয়ে উঠছে গ্রেবারের—পচে ফুলে উঠেছে লাশগুলো, বাতাস ঘন হয়ে উঠেছে দুর্গন্ধে। গুণে দেখল গ্রেবার, ওদের পক্ষে বেঁচে আছে বেয়াল্লিশজন, মৃত এবং আহতের সংখ্যা কমপক্ষে একশো কুড়ি।

দুপুরে খাবার পরে রাইফেলটা নিয়ে বসল গ্রেবার। কাদায় ভরা নল, গুলি করলে এখন নিজেরই আহত হবার সম্ভাবনা বেশি। যন্ত্রের মত কাজ করে গেল ও, তেল দিয়ে পরিষ্কার ঝকঝকে তকতকে করে তুলল রাইফেলটাকে, এর মাঝে কিচ্ছু ভাবল না ও—না পুরানো স্মৃতি, না ভবিষ্যৎ।

ভোর হয়নি তখনও। ঝাঁপিয়ে পড়ল রাশিয়ান ট্যাঙ্ক—একটা অর্ধবৃত্ত রচনা করেছে ওরা, সমস্ত প্রতিরোধ গুঁড়িয়ে দিয়ে, পিষে দিয়ে এগিয়ে আসছে প্লাবনের মত। অত্যন্ত দুর্বল এখন জার্মান গোলন্দাজ বাহিনী, তবুও প্রাণপণে বাধা দিয়ে যাচ্ছে। দুপুর পর্যন্ত দুটো প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিহত করেছে ওরা, কিন্তু আর বোধ হয় সম্ভব হবে না—ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে বাঙ্কার, মাটির সাথে মিশে গেছে ট্রেঞ্চ, চারপাশে ছিটকে উঠছে মাটি, যেন প্রবল ঝড় উঠেছে, তার মাঝে মোচার খোলার মত কোন আশ্রয়ে রয়েছে ওরা।

পকেট থেকে কনিয়্যাকের বোতলটা বের করল গ্রেবার, ছিপি খুলে ঢকঢক করে গলায় ঢালল কিছুটা। কাঁধের কাছটা জ্বলে যাচ্ছে ওর, রক্তে বেশ খানিকটা ভিজে উঠেছে শার্ট।

হঠাৎ থরথর করে কেঁপে উঠল বাঙ্কার, চোখের পলকে মাকড়সার জালের মত অসংখ্য চিড় দেখা দিল দেয়ালে। কলজেটা বুকের খাঁচায় বাড়ি খেলো গ্রেবারের; মনে হলো ওর, জীবনের এই শেষ, এবার অনিবার্য জীবন্তসমাধি।

চারপাশে দুলছে সবকিছু, দুলছে পৃথিবী, দুলছে স্বপ্ন-মৃত্যু-ভালবাসা; অন্য কোন স্মৃতি নয়—না মৃত্যু, না এলিজাবেথ—কিছুই নয়, গ্রেবারের চোখের সামনে শুধু শূন্যে লাফিয়ে ওঠা মাটি, পাথর, ইঁট, বৃক্ষ, গোলার টুকরো, মানুষের শরীর।

www.BanglaBook.org

মনে হয়, ও কোনদিন ছুটিতে ছিল না, কোনদিন কাউকে ভালবাসেনি, কারও ভালবাসা পায়নি; সবকিছু এখন শুধু কঠোর বাস্তবতার কাছে অসহায়ভাবে সমর্পিত।

দু'পাশে পদাতিক বাহিনী নিয়ে এগিয়ে এল হালকা ট্যাঙ্কগুলো। ট্যাঙ্কগুলোকে এগোতে দিয়ে পদাতিক বাহিনীর ওপরে মূল আক্রমণ চালাল ওরা।

চরাচর ডুবে গেছে বিস্ফোরণ আর গোলার গর্জনে, ক্রমাগত আর্তনাদ করছে মেশিনগান, তার সাথে তাল মিলিয়ে গর্জে উঠছে কামান—সংহারের তাণ্ডবে উন্মত্ত ফ্রন্ট।

রাশিয়ান ট্যাঙ্কগুলো রেঞ্জের মধ্যে আসতেই গর্জে উঠল জার্মান বাহিনীর ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী কামান। থমকে দাঁড়াল দুটো ট্যাঙ্ক, পর মুহূর্তেই বিস্ফোরিত হলো—পিরিচের মত শূন্যে উঠে গেল ঢাকনা, আগুনের লেলিহান শিখা গ্রাস করল সমস্ত অবয়ব।

গোলা ছুঁড়তে ছুঁড়তে ঝড়ের বেগে ধেয়ে এল বাকি ট্যাঙ্কগুলো, পেছনে পিঁপড়ের মত পদাতিক সৈন্যের সারি; সমস্ত বাধা অতিক্রম করে এগিয়ে এল ওরা।

থরথর করে কেঁপে উঠল গ্রেবারদের বাঙ্কার। ভয়ার্ত আর্তনাদ করে উঠল কয়েকজন, গুলিবৃষ্টি উপেক্ষা করেই ছুটল বাইরে। কতজন বেরোতে পারল, জানে না গ্রেবার, শুধু দেখল, খোলা আকাশের নিচে শুয়ে আছে ওরা; আগে যেখানে বাঙ্কার ছিল, বিরাট গর্ত সেখানে—ধূলি আর মানুষের আর্তনাদ একসাথে ভেসে যাচ্ছে বাতাসে।

'গ্রেনেডগুলো দাও শিগগির,' চিৎকার করে উঠল রাইনেকে।

কেউ একজন এগিয়ে দিল গ্রেনেডগুলো। মালার মত সেগুলো গলায় ঝোলাল রাইনেকে, হামাগুড়ি দিয়ে সামনে এগোল। অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে ওরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল শুধু তার এই অসমসাহসী কাজ।

'হেভি মেশিনগান,' চেঁচিয়ে নির্দেশ দিল কমাণ্ডার রায়ে, 'ট্যাঙ্কের ফুটোয় গুলি চালাও। সাবধান, রাইনেকে দেখে।'

হঠাৎ করে থেমে গেল একটা দানব। উল্লাসে চিৎকার করে উঠল ওরা। খুশিতে ইমেরমানের পিঠ চাপড়ে দিল রায়ে। অসম্ভব প্রায় টার্গেটে গুলি লাগিয়েছে ইমেরমান—ট্যাঙ্কের সংকীর্ণ ফুটো দিয়ে ভেতরে বসা কারও গায়ে। কিন্তু কোনদিকে খেয়াল নেই ইমেরমানের; উন্মত্ত দানব ও এখন—আত্মরক্ষায় ব্যস্ত; এরই মধ্যে দ্বিতীয় ট্যাঙ্কের দিকে মেশিনগান ঘুরিয়ে নিয়েছে সে।

বেগতিক দেখে মুখ ঘুরিয়েছে দু'নম্বর ট্যাঙ্কটা, দ্রুত সরে যাচ্ছে মেশিনগানের রেঞ্জের বাইরে।

'মোট ছ'টা ঘায়েল,' খুশিতে বাগবাগ কমাণ্ডার, 'এবার পদাতিক বাহিনীকে ধরো।'

কিন্তু এর মধ্যেই পিছু হটে গেছে তারা, গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে আরও নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরছে।

'রাইনেকে কোথায়?' অবস্থা একটু শান্ত হতেই জিজ্ঞেস করল ইমেরমান।

কেউ কোন উত্তর দিল না। ফেরেনি রাইনেকে।

তুমুল লড়াই চলছে সারা দুপুর, সারা বিকেল ধরে; যেন মহাপ্রলয়ের আগে থামবে না কেউ।

জার্মানদের অবরোধ ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে, অস্ত্রশস্ত্র নেই বললেই চলে, তবু টিকে আছে এখনও—মাটি কামড়ে মরণপণ লড়ে যাচ্ছে, গুলি ছুঁড়ছে হিসেব করে।

ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে সৈনিকরা। খাবারের মজুত খুবই কম—আধপেটা করে খাচ্ছে ওরা, গর্তে জমা বৃষ্টির পানিতে তেষ্টা মেটাচ্ছে।

হির্শলাণ্ড আহত। বুলেটে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়ে গেছে ওর বাঁ-হাত।

মাথার ওপরে রক্তে রাঙা সূর্য, প্রতিটি রশ্মির সাথে চুঁইয়ে নামছে রক্তস্রোত; আকাশ-বাতাস ভরা রক্ত আর বারুদে, আর্তনাদ আর পৈশাচিক উল্লাসে।

লাশের গন্ধমাখা বাতাস। কঠিন ইস্পাতে ঠিকরে পড়ছে শেষ বিকেলের আলো। আরও তীব্র হয়ে উঠেছে আক্রমণ। কী করে যে এখনও টিকে আছে ওরা, ভেবেই পাচ্ছে না গ্রেবার; অনেক আগেই তো স্রোতের মুখে খড়কুটোর মত ভেসে যাবার কথা ওদের।

হঠাৎ করে থেমে গেল সমস্ত আক্রমণ। অসহ্য শব্দ নিয়ে নামল নিস্তব্ধতা।

প্রতিমুহূর্তে আক্রমণের আশঙ্কা করছে ওরা। ধনুকের ছিলার মত টানটান হয়ে আছে সমস্ত স্নায়ু। এই নীরবতা অসহ্য রকমের কষ্টকর হয়ে উঠেছে ওদের কাছে; এর চেয়ে যুদ্ধের ভয়াবহ গর্জনও বোধহয় ভাল ছিল।

ক্ষুরের ধারাল ফলার ওপর দিয়ে বয়ে গেল দু'টি ঘণ্টা,—আবার শুরু হলো আক্রমণ। আর মাত্র দুটো মেশিনগান অবশিষ্ট আছে ওদের; তাই দিয়েই দাঁতে দাঁত চেপে আরও কিছুক্ষণ টিকে থাকল ওরা। কিন্তু বাঁধভাঙা বন্যার মত এগিয়ে আসছে রাশিয়ান বাহিনী। সন্ধ্যার আগে দ্বিতীয় অবরোধে পিছিয়ে এসেছিল জার্মান বাহিনী, কিন্তু রাশিয়ানদের এগিয়ে আসার ফলে সেটাকেও আর টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না ওদের পক্ষে।

হঠাৎ ছিটকে উঠল জাউয়ের, দু'পা শূন্যে উঠে গেল ওর, ধড়াস করে উল্টে পড়ল মাটিতে। মারা গেছে সে। মুখের জায়গায় রক্ত, মাংস আর মগজের স্তূপ।

পিছু হটছে ওরা। সরীসৃপের মত বুকে হেঁটে ক্রমাগত পিছিয়ে আসছে। হঠাৎ হির্শলাণ্ডের আর্তচিৎকারে বুকটা ধক্ করে উঠল গ্রেবারের, পাগলের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল ও হির্শলাণ্ডের ছটফট করা দেহের ওপর। আস্তে করে স্থির হয়ে গেল হির্শলাণ্ড, বুকের কাছটা ভিজে উঠল রক্তে।

ওকে ছেড়ে দিয়ে ধীরে ধীরে ফিরে এল গ্রেবার। বুকের মাঝখানটা কেমন যেন খালি খালি লাগছে ওর। ওদের ছেড়ে, সবকিছু ছেড়ে চিরদিনের মত চলে গেছে হির্শলাণ্ড। ভালই হলো, ভাবল গ্রেবার, স্টেইনব্রেনারের কাজে একটা লাভ অন্তত হয়েছে, হির্শলাণ্ডের মা-বাবাকে নতুন করে আর মৃত্যু-সংবাদ জানাতে হবে না। শেষ প্রতিরোধ অবস্থান থেকেও কয়েক কিলোমিটার পিছিয়ে এসেছে ওরা। আরও

www.BanglaBook.org

ছ'জন মারা গেছে ওদের, মারাত্মকভাবে আহত তিনজন। ফিল্ড হাসপাতালে পৌঁছুনোর আগেই মারা গেল একজন।

ওদের সৈন্যবাহিনীকে একত্রিত করা হয়েছে। মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে শিরশির করে ঠাণ্ডা একটা স্রোত বয়ে গেল গ্রেবারের, মাত্র তিরিশজন ওরা জীবিত।

পরদিন আরও রংরুট এল। হয়তো মশামাছির মতই মরতে। সব মিলিয়ে মোট একশো কুড়ি জন হলো ওরা।

ফ্রেজেনবুর্গ আহত। খবর পেয়েই হাসপাতালে ছুটল গ্রেবার।

বাঁ পায়ে গুলি খেয়েছে ফ্রেজেনবুর্গ। 'ওরা পা-টাকে কেটে ফেলতে চাইছে,' শুকনো মুখে জানাল সে, 'যত্তোসব হাতুড়ে ডাক্তার।' তিক্ত একটুকরো হাসি ফুটল ওর মুখে। 'আমি অবশ্য শহরের হাসপাতালে যাবার ব্যবস্থা করে ফেলেছি। কিছু করার আগে সত্যিকারের কোন ডাক্তারকে দিয়ে দেখাতে চাই পা-টা।'

জানালার পাশে শুয়ে আছে ফ্রেজেনবুর্গ, বাইরে সবুজ মাঠ, মিতালি করেছে আকাশের সাথে, ঢালু হয়ে ছুঁয়েছে তাকে দিগন্তে: লাল লাল ফুলে ভরা মাঠ, দুলছে হাওয়ায়, হাসছে; বলছে, এসো, এই তো জীবন, এখানেই তো জীবনের পূর্ণতা!

বুক খালি করা দীর্ঘশ্বাস ফেলল গ্রেবার।

'রায়ের খবর কি?' জানতে চাইল ফ্রেজেনবুর্গ।

'বাঁ হাতে গুলি খেয়েছে।'

'হাসপাতালে আছে?'

'না, সৈন্যদের সাথেই আছে।'

'খুবই স্বাভাবিক,' ম্লান মুখে হাসল ফ্রেজেনবুর্গ। 'অনেকেই ফিরে যায় না, যেতে চায় না। রায়ের মত লোকের তো প্রশ্নই ওঠে না।'

'কেন?'

'কেন ফিরবে? ফিরে যা পাবে, সে কি এই ফ্রন্টের চেয়ে ভাল কিছু?'

রক্তশূন্য, ফ্যাকাসে ফ্রেজেনবুর্গের দিকে স্থির চোখে তাকাল গ্রেবার। 'তুমি তাহলে কি করবে?'

'জানি না। প্রথমে পা-টার একটা ব্যবস্থা করব, তারপর ভাবব অন্য কথা।'

জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকল একঝলক উষ্ণ, প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা বাতাস—জীবন থেকে তপ্ত মাধুর্য নিয়ে।

'ভাবতে অবাক লাগে,' আনমনেই বলল ফ্রেজেনবুর্গ, 'দিনের পর দিন যখন তুষার জমে, জমে পাহাড় হয়, তখন কি ভাবা যায়, আবার একদিন অদৃশ্য হবে এই তুষার, আবার গ্রীষ্ম আসবে এ দেশে? তবু আসে, বারবার আসে।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কিছুক্ষণ নীরব থাকল সে। 'তোমার বাড়ির খবর কি?'

'জানি না।' গভীর হতাশাজড়ানো দীর্ঘশ্বাস বেরোল গ্রেবারের বুক চিরে। 'এখন মনে হয়, বাড়ি বলে কোনদিন কিছু ছিল না আমার। সবকিছু যেন অবাস্তব, অবিশ্বাস্য লাগে আমার কাছে।'

'ফ্রন্টে বাস্তব তো শুধু বেঁচে থাকার চেষ্টা—খাওয়া, ঘুমোনো আর অন্যকে খুন করা।'

'অথচ ছুটি থেকে ফেরার সময় প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আর মানুষ খুন করব না আমি।'

'অনেকেই তো সে কথা ভাবে,' যন্ত্রণায় কুঁচকে উঠল ফ্রেজেনবুর্গের চোখমুখ; কোনরকমে শেষ করল কথাটা, 'কিন্তু কে-ই বা পারে!'

ব্যস্ত হয়ে উঠল গ্রেবার। 'খুব কষ্ট হচ্ছে তোমার?'

'ব্যস্ত হয়ো না,' ওকে আশ্বস্ত করল ফ্রেজেনবুর্গ, 'মরফিয়া দিয়েছে। ঘুমিয়ে পড়ব কিছুক্ষণের মধ্যে; তার আগে ঠাণ্ডা মাথায় যতটুকু পারি, ভেবে নিই।'

'কবে যাচ্ছ?'

'কাল।'

'তাহলে হয়তো আর আমাদের দেখা হবে না।'

'কেন হবে না?' ম্লান হাসল ফ্রেজেনবুর্গ। 'দেখো, মেরামত করে ফের আমাকে পাঠিয়ে দেবে ফ্রন্টে।'

হাসতে পারল না গ্রেবার। দু'জনেই জানে, কথাটা সত্যি নয়।

চোখ মুদল ফ্রেজেনবুর্গ। 'আমার ভীষণ ক্লান্তি লাগছে, আর্নস্ট। আমি খোঁড়া হয়ে গেছি, এটা বোঝার আগে ভালমত ঘুমিয়ে নিতে চাই শেষবারের মত।'

'আমি যাই তাহলে।' ফ্রেজেনবুর্গের হাতে হাত রাখল গ্রেবার। 'শরীরের যত্ন নিও তুমি।'

'মনে হয়,' ঘুমের অতলে তলিয়ে যাবার আগে ফিসফিস করল ফ্রেজেনবুর্গ, 'জীবনের আদিম সময়ে ফিরে গেছি আমরা। আগে ভাবতাম অন্যকিছু, এখন বুঝি, সে ছিল আত্মপ্রবঞ্চনা। অথচ তখনই এ যুদ্ধের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারতাম, শক্তি তো ছিলই আমাদের বুকের মাঝে।'

থরথর করে কেঁপে উঠল গ্রেবার। এই প্রশ্নের উত্তরের জন্যেই যেন ও ঘুরে বেড়িয়েছে সারা জীবন, অথচ পায়নি কোথাও।

মনের কোথায় যেন আলো জ্বলে উঠল ওর, আস্তে আস্তে উজ্জ্বল হলো।

'এখনও সময় আছে, আর্নস্ট,' সুতোর গুটির মত খুলে খুলে যাচ্ছে ফ্রেজেনবুর্গের কণ্ঠস্বর, 'এখনও চেষ্টা করতে পারি আমরা, এমন যেন আর না ঘটে কোনদিন; তার জন্যে যদি দরকার হয়, যদি সুযোগ পাই, অস্ত্র তুলে নেব হাতে।' শেষের দিকে ওর কথাগুলো প্রায় শোনাই গেল না। মাথাটা বিছানায় ঢলে পড়ল। ঘুমিয়ে পড়েছে ও।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল গ্রেবার।

অলস, মন্থর পায়ে ফিরছে গ্রেবার। মাথার ওপর আদিগন্ত নীল আকাশ—স্তব্ধ, মৌন, ব্যথাতুর; পশ্চিমে হেলে পড়েছে সূর্য, রক্ত ঢেলেছে আকাশের নীলে, বাতাস কাঁপছে কামানের গুরুগর্জনে।

ক'দিন হলো আর কাঁদেনি আকাশ, যেন অশ্রু শুকিয়ে গেছে তার। শক্ত হয়ে উঠছে নরম মাটি। মাঠে, একদিকে জীবনের আশ্চর্য সমারোহ—ফুটে আছে নাম-না-জানা কত ফুল: লাল, নীল, হলুদ, কমলা—কী সুন্দর, কী রহস্যভরা! অন্যদিকে—

www.BanglaBook.org

লাশের পর লাশ।

হৃদয়ের মাঝখানে নিঃশব্দ আর্তনাদ, অশ্রুভরা হাহাকার—কান পেতে শুনল গ্রেবার। জীবনের সাথে সমস্ত যোগাযোগ, হোক না সে যতই ক্ষীণ, তবু তো ছিল, ছিন্ন হয়ে গেছে আজ; একটু আগে। কতবার ও জেগে উঠেছে মাঝরাতে, কিছুতেই মনে করতে পারেনি কোথায় রয়েছে ও, কেন রয়েছে, শুধু বুক ভরে গেছে শীতার্ত নিঃসঙ্গতায়, অন্তহীন হতাশায়; বুঝতে পারেনি তখন, কেন এই অনুভূতি। আজ, এ মুহূর্তে, অন্তর দিয়ে অনুভব করল সব। তবু প্রতিমুহূর্তে চেষ্টা করেছে ও, সান্ত্বনা দিয়েছে নিজেকেই, এই মহাবিশ্বে কোথাও না কোথাও ওর জন্যে আছে আলোর সম্ভাবনা। কিন্তু তার দেখা তো ও পায়নি এখনও।

হাওয়ায় দোলা বুনো ফুলগুলোর দিকে আরেকবার তাকাল গ্রেবার। হৃদয়ের কাছে রাখা এলিজাবেথের চিঠির উষ্ণতাটুকু আবার অনুভব করল, তারপর দৃঢ় পায়ে এগিয়ে গেল সামনে। ফ্রেজেনবুর্গের কথা দু'কান ভরে বাজছে ওর—আগে বাঁচবে ও, তারপর অস্ত্র তুলে নেবে হাতে; দেখবে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যায় কিনা।

ক্যাম্পের কাছে এসে পড়েছে গ্রেবার। চোখে পড়ল, প্রায় ধ্বংস হয়ে যাওয়া বাগান—বার্চে ঘেরা, ভেতরে ধসে পড়া শাদা একতলা বাড়ি, যুদ্ধের বিরুদ্ধে জ্বলন্ত প্রতিবাদ হয়ে দরজায় দুলছে সোনালি ফুল।

সাতাশ

'ব্যাটারা নিশ্চয়ই গেরিলা,' রাশিয়ান বন্দীদের দেখে মন্তব্য করল স্টেইনব্রেনার, পৈশাচিক উল্লাসে বাদামী চোখদুটো চকচক করছে ওর।

বন্দীদের দু'জন পুরুষ। মেয়ে দু'জনের মধ্যে অল্পবয়েসী একজন— ভরাট শরীর, গোল মুখ, মাথাভরা কোঁকড়া চুল ; ভোরের ট্রেনে ওদেরকে পাঠানো হয়েছে এখানে।

'আমার কিন্তু তা মনে হচ্ছে না,' সন্দেহ প্রকাশ করল গ্রেবার।

'কি করে বুঝলে ?'

'দেখে। সম্ভবত চাষী এরা, এবং গরীব।'

'বাহ্, বাহ্,' বিদ্রূপ করল স্টেইনব্রেনার। 'দেখেই যদি সবাইকে চেনা যেত, তাহলে পৃথিবীতে এত পুলিস গোয়েন্দা আর লাগত না।'

'তা ঠিক,' মনে মনে বলল গ্রেবার, 'তার জলজ্যান্ত প্রমাণ তুমি নিজে।'

হন্তদন্ত হয়ে কমাণ্ডার রায়ে এগিয়ে এল ওদের দিকে। 'কি ব্যাপার, এখানে কি করছ তোমরা?'

'বন্দীদেরকে কোথায় আটকে রাখা যায়, সে ব্যাপারে পরামর্শ করছি।' নির্জলা মিথ্যে কথা অবলীলায় বলল স্টেইনব্রেনার।

দাঁতে দাঁত চেপে বসল গ্রেবারের। কিছু বলার আগেই চোখে পড়ল কমাণ্ডারের বিষণ্ণ দৃষ্টি। অস্ফুট স্বরে বলল রায়ে, 'এত সমস্যা আমাদের ঘাড়ে

এখান, ঈশ্বর জানেন যে বারবার ওদেরকে পাঠায় আমাদের কাছে, বুঝি না কিছু!'

'চিন্তা করবেন না, স্যার,' খুশি খুশি গলায় জানাল স্টেইনব্রেনার, 'সামনের বাড়িটাতে দিব্যি আটকে রাখতে পারব ওদের।'

আস্তে করে মুখ ফেরাল রায়ে, স্টেইনব্রেনারের মনের কথা পড়ে নিতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হলো না তার। জানে, কি করবে পিশাচটা—বন্দীদের সুযোগ দেবে পালানোর, তারপর···

'গ্রেবার,' গমগম করে উঠল তার গলা, 'বন্দীদের দায়িত্ব তোমার ওপর থাকল। স্টেইনব্রেনার বাড়িটা দেখিয়ে দেবে তোমাকে। যেখানে বন্দীদের রাখবে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবে; পালানোর কোন উপায় যেন না থাকে।' একটু থেমে যোগ করল, 'মনে রেখো, বন্দীদের পুরো দায়িত্ব তোমার একার। দরকার মনে করলে রংরুট নিয়ে যাও দু'জন।'

এগোল ওরা। বন্দীদের একজন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। নিস্তব্ধ সবাই, আরও যেন বয়স বেড়ে গেছে বৃদ্ধা বন্দীর, চামড়া ঝুলে পড়েছে তার, ফুটে উঠেছে নীল শিরা-উপশিরা, চোখের কোলে শুকনো জলের দাগ। অন্য মেয়েটির খালি পা, মাটির দিকে তাকিয়ে হাঁটছে সে।

বেশ কিছুদূর আসার পর অল্পবয়েসী বন্দীটাকে ধাক্কা মারল স্টেইনব্রেনার। 'দৌড় দে, শালা।'

ছেলেটা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল স্টেইনব্রেনারের দিকে। হঠাৎ পিশাচকণ্ঠের হাসিতে চমকে উঠল সে; হাসিতে ফেটে পড়েছে স্টেইনব্রেনার। হাসির বেগ কমলে হাত দিয়ে ইশারা করল, 'যা ভাগ, মুক্তি দিলাম তোকে।'

বয়সী বন্দীটা কি যেন বলল, শুনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল ছেলেটা। কষে তার হাঁটুর পেছনে লাথি কষাল স্টেইনব্রেনার। হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল ছেলেটা।

'থামো,' ধমকে উঠল গ্রেবার, 'কি হচ্ছে এসব? কমাণ্ডারের নির্দেশ কানে যায়নি তোমার?'

'আরে, রাখো তোমার কমাণ্ডার,' থুঃ থুঃ করে থুথু ছিটাল স্টেইনব্রেনার, 'অমন অনেক কথাই বলে ওরা। তার চেয়ে,' গ্রেবারের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করল সে, 'ছুটতে দাও ওদের। খানিকদূর গেলেই···ঠুস···।' পৈশাচিক হাসিতে ভরে উঠল ওর মুখ। 'রাতে মেয়েটাকে নিয়ে যাব মাঠে। উম্‌ম···'

'কোন দরকার নেই ওসবের,' ঠাণ্ডা গলায় বলল গ্রেবার।

'দেখো,' বোঝাতে চেষ্টা করল স্টেইনব্রেনার, 'কেউ না কেউ তো ওদের মারবেই। তার আগে একটু মজা···,' গ্রেবারকে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়তে দেখে খেপে গেল সে। 'তা তো বলবেই, ছুটিতে গিয়ে কতজনকে নিয়ে যে মৌজ···'

'চুপ!' চিৎকার করে উঠল গ্রেবার, নিজের কণ্ঠস্বরে নিজেই অবাক হলো, 'তোমাকে বাড়িটা দেখিয়ে দিতে বলা হয়েছে শুধু, সেটাই করো, অন্য কথা একদম বলবে না।'

গুম হয়ে গেল স্টেইনব্রেনার, ভেতরে ভেতরে ফুঁসছে সে।

বাড়িটাতে এসে পৌঁছুল ওরা—পুরানো বাগানবাড়ি, সামনে গ্যারেজ, ওটাই

বন্দীশালা।

জায়গাটা ভাল করে পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হলো গ্রেবার—পাকা মেঝে, ঘরের দরজা-জানালায় মজবুত লোহার শিক।

অস্ত্রশস্ত্র আছে কিনা দেখার জন্যে সবক'জন বন্দীর দেহ তল্লাশি করল স্টেইনব্রেনার; মেয়েটার বেলায় সময় নিল সবচেয়ে বেশি।

বন্দীদের ভেতরে রেখে দরজায় তালা দিল গ্রেবার। টেনেটুনে দেখল। রংরুট দু'জনের দিকে ফিরল ও, 'তোমরা দু'জন থাকো এখানে। দেখবে, বন্দীদের যেন কোনরকম ক্ষতি না হয়। কমাণ্ডার রায়ের আদেশ এটা।'

'আচ্ছা, স্যার।'

বন্দীদের দিকে তাকাল গ্রেবার। 'তোমাদের মধ্যে কেউ জার্মান জানো?'

কোন উত্তর এল না।

দরজার শিক ধরে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে অশ্লীল ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিল স্টেইনব্রেনার। তার চোখেমুখে লালসার চিহ্ন প্রকট হয়ে উঠেছে।

'চলো, যাওয়া যাক,' ওকে ডাকল গ্রেবার। 'সময় করে ওদের জন্যে খড়ের ব্যবস্থা করতে হবে।'

'এহ্, খড়ের ব্যবস্থা!' বিদ্রূপে ঠোঁট বেঁকে গেল স্টেইনব্রেনারের, 'তার চেয়ে পালকের বিছানা পাও কিনা দেখো!'

'পারলে তা-ই দেখতাম।' দাঁতে দাঁত পিষে জবাব দিল গ্রেবার।

কমাণ্ডার রায়েকে রিপোর্ট করল গ্রেবার, 'ঘরটা সম্পূর্ণ নিরাপদ, স্যার। নিজে থেকে পালাতে পারবে না বন্দীরা।'

'ঠিক আছে। ওদের দায়িত্ব তোমার ওপরই থাকল। আমার মনে হয়,' গলা খাদে নামাল রায়ে, 'দিন দু'য়েকের মধ্যে রাশিয়ান সৈন্যরাই ওদের মুক্ত করতে পারবে।'

'জী, স্যার।' ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল গ্রেবার। কেন যেন ওর অনেক হালকা লাগছে বুকটা। বাইরে আসতেই ইমেরমানের সাথে দেখা হলো। হাসল সে। 'শেষ পর্যন্ত কারারক্ষীর পদে প্রমোশন?'

গ্রেবারও হাসল। 'রংরুটদের লেফট-রাইট শেখানোর চেয়ে ভাল অন্তত কাজটা।'

'কিন্তু,' গম্ভীর হলো ইমেরমান, চারপাশ দেখে নিয়ে চাপা স্বরে বলল, 'রংরুটদের শেখাবার সময় কোথায়? যেভাবে এগিয়ে আসছে রাশিয়ানরা, তাতে কিভাবে যে এখনও টিকে আছি, ভেবে পাই না। বাঁচতে চাইলে একেবারে পিছিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় তো দেখছি না আমি।'

'একেবারে পিছিয়ে যাওয়া, অর্থাৎ জার্মান বর্ডার পর্যন্ত?'

'ধরো, তাই।'

'তাতেই কি বাঁচতে পারবে বলে মনে করো?'

'না।' বিষণ্ণ একটুকরো হাসি ফুটে উঠল ইমেরমানের ঠোঁটে। আরও খাদে

www.BanglaBook.org

শেষে এল ওর পালা। 'আসলে আমাদের আর কোথাও যাবার জায়গা নেই: না পেছনে, না সামনে। আর আমরা না চাইলে অন্য কেউই আসবে না যুদ্ধ থামাতে।'

নিশ্চুপ থাকল গ্রেবার। এসব কথা বহুদিন থেকেই কুরে কুরে খাচ্ছে ওকে। ওর দুশ্চিন্তা এখন বন্দীদের নিয়ে: শুধু দু'জন রংরুটের ওপর ওদের দায়িত্ব দিয়ে মোটেই স্বস্তি পাচ্ছে না। গোক্ষুরের চেয়েও মারাত্মক স্টেইনব্রেনার, শেয়ালের চেয়েও ধূর্ত।

হলদে বিবর্ণ শুকনো পাতা থেকে গড়িয়ে নামছে মরা রোদ; নির্জন, থমকে দাঁড়ানো বিকেল। নিঃসঙ্গ নিস্তব্ধতাকে ভাঙতে পারেনি কামানের গর্জন।

বাগানবাড়িটার চারপাশে আনমনে একা একা ঘুরছে গ্রেবার। খড় এনে দিয়ে চলে গেছে রংরুট দু'জন।

সদর দরজার সামনে ফুলে ফুলে ছাওয়া গাছ, সরু পথ চলে গেছে বাড়ি পর্যন্ত, দু'পাশে সবুজ ঘাস ঘিরে রেখেছে তাকে— সঙ্গে আগাছা আর বুনো ফুল।

বিরাট বাগানের মাঝে মাঝে শ্বেতপাথরের মূর্তি, টালির ছাতার নিচে বসার জায়গা, ফুলের ঝাড়—সব ঘুরে ঘুরে দেখছে গ্রেবার, বুকের মাঝে বেড়ে উঠছে কষ্ট —অসুন্দরের কাছে সুন্দরের পরাজয়ে।

ঘুরতে ঘুরতে গ্যারেজের কাছে ফিরে এল ও। বৃদ্ধা ঘুমিয়ে পড়েছে, মেয়েটা গুটিসুটি মেরে বসে আছে এককোণে; অন্য দু'জন দাঁড়িয়ে আছে শিক ধরে— শূন্য দৃষ্টি স্থির। ভেতরে ছোট্ট এক টুকরো আলো— বন্দী।

গ্রেবার এগিয়ে যেতেই চমকে ফিরে তাকাল পুরুষ দু'জন; মেয়েটা ঘাড় গুঁজে বসেই রইল।

কারও দিকে তাকাল না গ্রেবার; আরেকটু এগিয়ে গিয়ে ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসল। রাইফেলটা রাখল কোলের ওপর।

গাঢ় নীল আকাশ, ম্লান হয়ে আসছে অন্ধকারে, ধূসর রঙ ধরেছে শাদা মেঘে; বার্চের শাখা দুলছে হাওয়ায়— মুখরিত পাখির গানেগানে; ফুল থেকে ফুলে উড়ছে একটা প্রজাপতি, একটু পরেই তাকে সঙ্গ দিতে এল আরেকটা। দু'জনের তুমুল ছুটোপুটি চলল কিছুক্ষণ, তারপর একসাথে উড়ে গেল দূরে। দু'চোখ ভরে সব দেখল গ্রেবার. আবেশে মুদে এল চোখ।

সন্ধ্যা হলো। সবার জন্যে খাবার নিয়ে এল একজন রংরুট— বন্দীদের জন্যে নতুন করে রান্না করার কষ্ট স্বীকার করেনি সে, দুপুরের বেঁচে যাওয়া খাবারেই পানি ঢেলে পরিমাণে বেশি করে এনেছে।

নিজের খাবার আর সিগারেটের পরিমাণ দেখে সতর্ক হয়ে উঠল গ্রেবার: স্বাভাবিকের চেয়ে বরাদ্দ বেশি আজকে: এর মানে একটাই, বিপদ আসছে সামনে।

বন্দীদের খাওয়া শেষ হলে এঁটো বাসনপত্র নিয়ে এল রংরুটটা। 'আমি কি চলে যাব, স্যার?'

'না.' উঠে দাঁড়াল গ্রেবার, 'একটু অপেক্ষা করো।' হেঁটে গ্যারেজের সামনে গেল ও। রংরুটটাকে সতর্ক থাকতে বলে গ্যারেজের তালা খুলল। বৃদ্ধ বন্দীকে বলল, 'মেয়েদের বাইরে যাবার দরকার থাকলে যেতে পারে এখন। ওদের পরে.

www.BanglaBook.org

তোমরা।'

রাশিয়ান ভাষায় বুড়ো কিছু বলল মেয়েদের। ওরা মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়াল। ঝট্ করে রাইফেল তুলল রংরুটটা, শক্ত করে চেপে ধরল বাঁট।

হেসে ফেলল গ্রেবার। 'ব্যস্ত হবার কিছু নেই।' বৃদ্ধাকে বাইরে বেরোতে ইশারা করল।

হাউমাউ করে কেঁদে উঠল বুড়ি; ধরেই নিয়েছে, গুলি করে মারা হবে ওদের।

তাড়াতাড়ি বুড়োর দিকে চোখ ফেরাল গ্রেবার, 'ওকে জানাও, ভয় নেই কোন।'

বৃদ্ধ কথাটা বুঝিয়ে বলতেই কান্না থামাল বুড়ি। রংরুটটাকে পাহারায় রেখে বুড়িকে নিয়ে বাড়ির পেছন দিকে এগোল গ্রেবার। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বুড়িকে রেখে মেয়েটাকে নিয়ে গেল। মেয়েটাকে বারবার পেছন ফিরে তাকাতে দেখে মনে মনে হাসল ও। মেয়েটার ভয় পরিষ্কার অনুভব করতে পারছে।

পুরুষদের হয়ে গেলে সবাইকে গ্যারেজে ঢুকিয়ে তালা বন্ধ করল গ্রেবার। রংরুটটাকে বিদায় দিয়ে হাত ঢোকাল পকেটে। গুণে গুণে সিগারেট বের করল পাঁচটা। একটা নিজের ঠোঁটে ঝুলিয়ে বাকি চারটে বুড়োটাকে দিল ও। দেশলাই জ্বেলে সিগারেট ধরাল। আগুনটা শিকের ফাঁক দিয়ে এগিয়ে দিল ভেতরে।

একে একে চারজনই সিগারেট ধরাল। মেয়েটার চোখের অতল অন্ধকারের দিকে চোখ পড়তেই বুকের মধ্যে খচ্ করে ছুরি বিঁধল যেন গ্রেবারের। একনিমেষে জেগে উঠল স্মৃতি, ওর সমস্ত সত্তা জুড়ে ফুটে উঠল একটি মাত্র ছবি। সে ছবি এলিজাবেথের।

ঠোঁট নড়ে উঠল বুড়োর। 'তুমি ভাল লোক।'

ম্লান হাসল গ্রেবার।

দরজার শিকগুলো চেপে ধরল বুড়ো। আরও নিচে নেমে এল তার কণ্ঠস্বর। ভাঙা ভাঙা জার্মানে কোনরকমে কতকগুলো প্রায় অসংলগ্ন বাক্য বলে চলল, 'জার্মানির পক্ষে আর যুদ্ধ করা সম্ভব নয়, তুমি ভাল লোক, তুমি আমাদের সঙ্গে এসো, লুকিয়ে রাখব তোমাকে, তোমার কোন ক্ষতি হবে না, বেঁচে থাকবে তুমি।' মেয়েটার দিকে ইশারা করল সে, 'মারুশা ভাল মেয়ে, তুমি ...'

মাথা নাড়ল গ্রেবার। অসম্ভব অস্থির লাগছে ওর; সরে আসার জন্যে পা বাড়াল।

শিকের ওপর মুখ চেপে ধরল বুড়ো। আকুল কণ্ঠে দ্রুত বলে চলল, 'বিশ্বাস করো, আমরা সাধারণ মানুষ। যুদ্ধে জিতবে না জার্মানি, তোমাকে লুকিয়ে রাখব, তোমাকে...'

দু'হাতে কান চেপে সরে এল গ্রেবার। কোমল, নরম অন্ধকারে দ্রুত উচ্চারিত শব্দে অতল জলের আহ্বান—ওর সমস্ত রোমকূপে তার শিহরণ, কষ্ট, কী অসহ্য কষ্ট যে বুকে! উদ্‌ভ্রান্তের মত ভাবছে শুধু ও, সত্যি হয়তো কিছুই জানে না লোকগুলো, দেখতেও গেরিলার মত নয়, কোন অস্ত্রশস্ত্রও পাওয়া যায়নি ওদের কাছে। যদি ছেড়ে দেয় ওদের, মরে গেলেও জেনে যাবে ও, জীবনে মহৎ কিছু,

হোক না সে অতি তুচ্ছ, করতে পেরেছে, নিরপরাধ কয়েকজন মানুষের জীবন অন্তত বাঁচাতে পেরেছে; কিন্তু, থমকে দাঁড়াল গ্রেবারের ভাবনা, তাই বলে ওদের সঙ্গে তো যেতে পারে না ও। যা থেকে ও মুক্তি চায়, তার মধ্যেই তো আবার ফিরে যেতে পারে না!

অস্থির পায়ে রাখাল বালকের মূর্তির কাছে এসে দাঁড়াল গ্রেবার। আকাশের গায়ে বার্চবীথির সারি—সৃষ্টি করেছে অরণ্যপ্রাচীর, আকাশে মিটিমিটি তারা, গ্যারেজের অন্ধকারে থেকে থেকে উজ্জ্বল হয়ে ওঠা ছোট্ট লাল আলো।

আবার বন্দীদের কাছে ফিরে এল ও। ম্যাচ আর সবগুলো সিগারেট বুড়োর হাতে দিল, 'রাতের জন্যে রেখে দাও।'

যেন অন্য কোন জগৎ থেকে ভেসে এল বৃদ্ধ বন্দীর কণ্ঠস্বর—কোমল, গভীর, অপার্থিব, বীণানন্দিত ছন্দে; সে স্বরে আরও গভীরভাবে জীবনকে ভালবাসল গ্রেবার, আরও গাঢ় হলো ওর দুঃখ, বুকের অন্ধকারে অতলান্ত হাহাকার নিয়ে সরে এল ওখান থেকে।

টহল দিচ্ছে গ্রেবার। গোলার গর্জনে কেঁপে কেঁপে উঠছে অন্ধকার, তারা, রাত। গ্রেবারের বুকে শুধু নিস্তব্ধতা। হঠাৎ নিজেকে অসম্ভব রিক্ত, অসম্ভব ক্ষুদ্র, পরিত্যক্ত মনে হলো ওর; পৃথিবীকে মনে হলো বিশাল, ওকে ভুলে গেছে সবাই—ওর কী হলো, ও যে একদিন ছিল তাদের সাথে, কিছুই মনে নেই কারও—ওকে ছাড়াই চলবে সবার। চেখের কোণে ঝর্ণাধারা গ্রেবারের।

অনেক অনেকক্ষণ পর, মনটা একটু শান্ত হলে, টালির ছাতার নিচে শুয়ে পড়ল ও। অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল বন্দীশালার লোহার ভারী দরজার দিকে!

আরও জোরাল হয়ে উঠেছে গোলার গর্জন, আরও সংহারমূর্তি ধরেছে ফ্রন্ট। মাঝে মাঝেই বিমানের তীক্ষ্ণ শব্দ উঠছে আকাশে, সাথে সাথে গর্জে উঠছে অ্যান্টি-এয়ারক্র্যাফট গান।

মাঝরাত। আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে পরিস্থিতি। হঠাৎ ঘড়ঘড় শব্দ শুনে কলজেসুদ্ধ কেঁপে উঠল গ্রেবারের—ট্যাঙ্ক, ট্যাঙ্ক নেমেছে এবার! পায়ের নিচে মাটিতে প্রলয়নৃত্যের ছন্দ, আকাশে পিশাচের হুঙ্কার, ওর চারপাশে অন্ধকারের গভীর বলয়—গভীর থেকে গভীরতর ক্রমাগত।

কেন যেন হঠাৎ মনে হলো গ্রেবারের, বন্দীদের মুক্তি দিলেই হয়তো থেমে যাবে সমস্ত উন্মত্ততা, হয়তো ওরা বন্দী না হলে এ যুদ্ধ হতই না, প্রচণ্ড হত না এই আক্রমণ, যেন ওদের মুক্তির ওপরই এখন নির্ভর করছে যুদ্ধের চূড়ান্ত ভাগ্য।

পকেটে হাত দিয়ে শীতল, ভারী চাবিটাকে অনুভব করল ও। কল্পনায় দেখল, মুক্ত বন্দীদের খুশিতে উচ্ছল, হাস্যমুখর ছবি।

ভোরের আগেই ঘুমিয়ে গেল ও।

তাকিয়েই ঝট করে চোখ বন্ধ করে ফেলল গ্রেবার। ঘুম ভেঙেছে ওর; চোখ মেলতেই সূর্যের আলো সরাসরি পড়েছে চোখে।

ধড়মড় করে উঠে বসল ও। আরও কাছে এসে গেছে কামানের গর্জন। এত

www.BanglaBook.org

কাছে যে মনে হচ্ছে, বাগানবাড়িটার পেছনেই পৌঁছে গেছে রাশিয়ানবাহিনী। চট করে গ্যারেজের দিকে চোখ ফেরাল ও। নাহ্, অক্ষতই আছে দরজাটা, ভেতরে অস্থিরভাবে পায়চারি করছে বন্দীরা।

হঠাৎ স্টেইনব্রেনারকে দেখল গ্রেবার—ছুটতে ছুটতে আসছে। উৎকণ্ঠিতভাবে এগিয়ে গেল ও। 'কি ব্যাপার, কি হয়েছে?'

'রাশিয়ানরা আমাদের ঘাঁটি দখল করে নিয়েছে,' হাঁপাতে হাঁপাতে জানাল স্টেইনব্রেনার। 'সবাইকে পিছিয়ে যাবার আদেশ দিয়েছে কমাণ্ডার। বন্দীদের এখানেই খতম করে দাও।'

বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ির ঘা পড়ল গ্রেবারের। গলাটা শুকিয়ে গেল সাথে সাথে। কোনরকমে বলল, 'লিখিত আদেশ আছে কারও?'

'লিখিত আদেশ?' পাগলের মত হেসে উঠল স্টেইনব্রেনার। 'ওদিকের অবস্থা দেখলে আর এ কথা জিজ্ঞেস করতে না। এখান থেকে টের পাওনি কিছু?'

'পেয়েছি।'

'তাহলে? লিখিত আদেশ কে দেবে এখন? লেখার সময় আছে নাকি? বন্দীদের এখন বাইরে আনারও সময় নেই, সে চিন্তা বাদ দিয়ে চলো দরজার ফাঁক দিয়েই···'

'না,' অস্বাভাবিক জোরের সাথে বলল গ্রেবার।

কিছুটা চমকে উঠল স্টেইনব্রেনার। গ্রেবার দেখল ওর টানটান হয়ে যাওয়া চিবুক, পৈশাচিক উল্লাসে ভরা ধিকিধিকি নীল চোখ, থিরথির করে কাঁপা ঠোঁট।

আস্তে করে ডান হাতটা হোলস্টারে চলে গেল স্টেইনব্রেনারের। 'কেন নয়?'

'ওদের দায়িত্ব,' আগের মতই শান্ত গ্রেবারের কণ্ঠস্বর, 'আমার ওপরে। তোমার কাছে লিখিত আদেশ না থাকলে যেতে পারো।'

হাসল স্টেইনব্রেনার। 'ঠিক আছে, দায়িত্ব যখন তোমার ওপরে, তখন তুমিই সারো কাজটা!'

'না।'

'কেন, মনে জোর পাচ্ছ না?' বিদ্রূপ করল পিশাচ, 'তাহলে আমার ওপর ছেড়ে দিচ্ছ না কেন ব্যাপারটা?'

'না,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল গ্রেবার, 'ওদের গুলি করতে পারবে না।'

'পারব না?' অস্ফুট চাপা কণ্ঠে বলল স্টেইনব্রেনার। থরথর করে কাঁপছে সে। 'তুমি জানো, কি বলছ তুমি?'

'জানি। জেনেশুনে···'

সমস্ত মনোযোগ স্থির ছিল গ্রেবারের। দেখল, ওর না বলার সাথে সাথে কীভাবে বদলে গেল স্টেইনব্রেনার—মুখ বিকৃত হলো ঘৃণায়, দাঁত চেপে বসল ঠোঁটে, হিংস্রতায় ঘোলাটে হয়ে গেল চোখ, হাতে বেরিয়ে এল রিভলভার।

কোন দ্বিধা নয়, অনায়াসে রাইফেল তুলল গ্রেবার, স্টেইনব্রেনারের বুকে গুলি করল, স্থির চোখে দেখল ছিটকে ওঠা পিশাচের লাশ—মৃত্যুযন্ত্রণার আক্ষেপ, রক্তের ফোয়ারা, হাত থেকে খসে পড়া রিভলভার। আলোড়ন নয় কোন, যেন এ-ই ছিল স্বাভাবিক, দৃঢ় পদক্ষেপে গ্যারেজের দিকে এগোল গ্রেবার। ভারী কামানের গোলা

প্রচণ্ড শব্দে ফাটল কাছেই, থরথর করে কেঁপে উঠল সবকিছু; বুঝিয়ে দিল, সময় বেশি নেই আর। গ্যারেজের তালা খুলল ও, বন্দীদের অবাক চোখে চোখ রেখে নিশ্চিত বিশ্বাসে বলল, 'পালাও।'

অবিশ্বাসে, বিস্ময়ে হাঁ করে তাকিয়ে আছে বন্দীরা। বিস্মিত চোখে ওদের বারবার রাইফেলের দিকে তাকাতে দেখে হাত থেকে অস্ত্রটা ছুঁড়ে ফেলে দিল গ্রেবার। অস্থিরভাবে ধমকে উঠল, 'দাঁড়িয়ে আছ কেন, শিগগির পালাও!'

ধীরে, সতর্ক পায়ে বাইরে বেরিয়ে এল লোকগুলো। এখনও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না, ওরা মুক্ত।

ঘুরে দাঁড়াল গ্রেবার, একবারও তাকাল না পড়ে থাকা লাশের দিকে, কিংবা ছুটে যাওয়া লোকগুলোর দিকে। সদর দরজা দিয়ে বেরিয়েই দৌড়ুতে শুরু করল ও, পিছিয়ে গিয়ে ওর বাহিনীর সাথে যোগ দিতে হবে ওকে।

সহসা, একেবারে আচমকা, অনেক উঁচু পাহাড়ের ওপর থেকে গড়িয়ে পড়া, দ্রুত বেগে অবিশ্বাস্য গতি পাওয়া পাথরের মত ধেয়ে এল ওর চিন্তাভাবনা, এক ধাক্কায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল ওকে। ওর মনে হলো, কিছু একটা, অমোঘ নিয়তির মত—নিশ্চিত এবং স্থির—ঠিক হয়ে ছিল ওর জন্যে, অথচ কিছুতেই সে সত্তার গভীরে যেতে পারল না ও। শরীরটা পালকের মত হালকা লাগছে ওর—কোন ভার নেই; এখন, এই মুহূর্তেই একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে ওকে, কিন্তু তারও আগে ঠিক করতে হবে, পালাবে না ও, আর, মনের গভীরে লুকিয়ে রাখা ছবিগুলোকে আরও স্পষ্ট করতে হবে, জীবন্ত করতে হবে, ছুঁয়ে দেখতে হবে; অসহ্য অনুভবে সমস্ত স্নায়ুতে তীব্র শিহরণ জাগল গ্রেবারের।

হঠাৎ, একেবারে কাছেই রাশিয়ান সৈন্য দেখতে পেয়ে চমকে উঠল গ্রেবার, ওদের পরিত্যক্ত ঘাঁটি দখল করতে ছুটে আসছে ওরা— একটু নিচু হয়ে, রাইফেল বাগিয়ে। সহসা একজনের চোখে পড়ে গেল ও। সাথে সাথে চিৎকার করে উঠল সৈনিকটা, ওর বুক বরাবর উঁচু করল রাইফেল, ট্রিগারে চেপে বসল আঙুল।

রাইফেলের কালো, চকচকে নলটাকে আশ্চর্যরকম পরিষ্কারভাবে দেখতে পেল গ্রেবার। সময় যেন থমকে গেল, তাকিয়ে থাকা মৃত্যুবাণের দিকে দু'হাত তুলল গ্রেবার, চিৎকার করে সরাতে বলল রাইফেল, এখনও অনেক কিছু বলার আছে ওর।

আশ্চর্য, অন্য কিছু নয়, কিচ্ছু নয়, ওর নিটোল অনুভবে ফুটে উঠল বিষণ্ন কালো আকাশ আর এক টুকরো সোনালি-লাল মেঘ; শুধু অনুভব করল ও—ফুল পড়ে গেল, কুঁড়ি ঝরে গেল, পাখি উড়ে গেল; চোখের সামনে দেখল, বিবর্ণ, পায়ে দলা ঘাস, টুপ করে গড়িয়ে নামল শিশিরবিন্দু—কাঁদল যেন। মগ্ন, তন্ময় চোখের সামনে দেখল, কাঁপছে ঘাসের শীষ, নীল ফুল; আস্তে আস্তে অরণ্যে পরিণত হলো ওরা; সহসা থেমে গেল, স্থির হলো সবুজ ঘাসের অরণ্য, সমস্ত শব্দ মিলিয়ে গেল মহাকালে।

****